২
বিজ্ঞান
অবিজ্ঞান
অপবিজ্ঞান
উৎস মানুষ সংকলন

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড

উৎস মানুষ সংকলন

সূ চী প ত্র

প্রসঙ্গক্রমে

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান—দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের তাগিদ ছিল অনেক দিনের। তাগিদটা যত না আমাদের পরিচালকমণ্ডলীর, তার চেয়ে বেশি ছিল পাঠকবন্ধুদের—যারা ভীষণভাবে চাইছিলেন উৎস মানুষ-এর পুরনো কিছু নির্বাচিত লেখা সংগ্রহে রাখতে। আর, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে চাইছিলাম 'ভালো' বই-এর সংখ্যা যদি আমরা বাড়াতে পারি আরেকটা, তাহলে আমাদের আদর্শগত উদ্দেশ্যও সাধিত হবে—উৎস মানুষ-এ প্রকাশিত কিছু রচনা যা মানুষকে ভাবাবে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে চারপাশের ঘটনাকে যাচাই-বাছাই করতে সাহায্য করবে, অযৌক্তিক রহস্যময়তা আর অলৌকিকতার স্বরূপ উন্মোচন করবে আর বিজ্ঞানের অমানবিক প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন করতে চাইবে, সে-রকম কিছু লেখাকে দুই মলাটের মাঝখানে এনে তুলে দেওয়া যাবে বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের হাতে। মূলত এই লক্ষ্য নিয়েই বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করলাম আমরা।

প্রধানত ১৯৮২ এবং ১৯৮৩ সালের উৎস মানুষ থেকে নির্বাচিত লেখা আমরা রেখেছি বর্তমান সংকলনে। তবে বিষয়গত প্রাসঙ্গিকতা রাখতে পরবর্তীকালে প্রকাশিত দু-একটি লেখাকেও সংকলিত করা হয়েছে এখানে। নির্বাচিত লেখাগুলির বিষয়বস্তু অনুযায়ী একটা সাবলীল উত্তরণের ধারা, প্রচ্ছন্নভাবে হলেও, বজায় রাখার চেষ্টা ছিল ; রচনাগুলির বিন্যাসও করা হয়েছিল সেইভাবে। যেমন, প্রাকৃতিক রহস্য থেকে শুরু করে অতীন্দ্রিয়বাদ—এরকম একটা ধারা। কিন্তু তা করতে গিয়ে বই-এর আয়তন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল বিশাল। তাই ভেঙে দিতে বাধ্য হয়েছি আমরা। বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান-এ নির্বাচিত অতীন্দ্রিয়বাদ সংক্রান্ত লেখাগুলো থাকবে তৃতীয় খণ্ডে।

প্রতিটি লেখার শেষে, লেখকের নামের নিচে ছোট হরফে উৎস মানুষ পত্রিকায় রচনার প্রথম প্রকাশকাল দেওয়া আছে।

পরিচালকমণ্ডলী

অন্যান্য উৎস মানুষ সংকলন

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (প্রথম খণ্ড)/১২·০০

বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ/১৪·০০

প্রমিথিউসের পথে/৬·০০

শেকলভাঙা সংস্কৃতি/১২·০০

প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়/১৬·০০

এটা কি ওটা কেন/১২·০০

বিবেকানন্দ অন্যচোখে/১৩·০০

সাপ নিয়ে কিংবদন্তী/১২·০০

দুগ্ধবতী বাছুর

অলৌকিক নয় বাস্তব

খবর পেলাম বারাসত ১নং ব্লকের ছোট জাগুলিয়া গ্রামে এক মাস বয়সের একটি বকনা বাছুর দুধ দিচ্ছে। একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবু খবরের সূত্রটা নির্ভরযোগ্য, তাই ছুটলাম আমরা কয়েকজন।

শিয়ালদা থেকে বারাসাত লোকাল। বারাসাত স্টেশনের কাছে বাস-স্ট্যাণ্ড থেকে ৯৫ নং বাসে বামুনগাছি। সেখান থেকে রিক্সাভ্যানে ছোট জাগুলিয়া। বি ডি ও অফিসের সামনে চায়ের দোকানে গল্পচ্ছলে প্রাথমিক খোঁজখবর করলাম। হ্যাঁ, শীতল সরদারের (বন্ধুমহলে ডাকনাম 'বাঙ্গা') বাড়ির নতুন বাছুরটা দুধ দিচ্ছিল বটে।

—আসল ব্যাপারটা কী বলুন তো?

—কত সব আজব কাণ্ড ঘটে দাদা। কি করে কী হয় জানে কে! দিন-কতক আশপাশের এলাকা ঠেঙিয়ে লোক আসছিল খুব। আপনারা দেরি করেছেন। তবু গিয়েই দেখুন না, কলকাতা থেকে এসেছেন…।
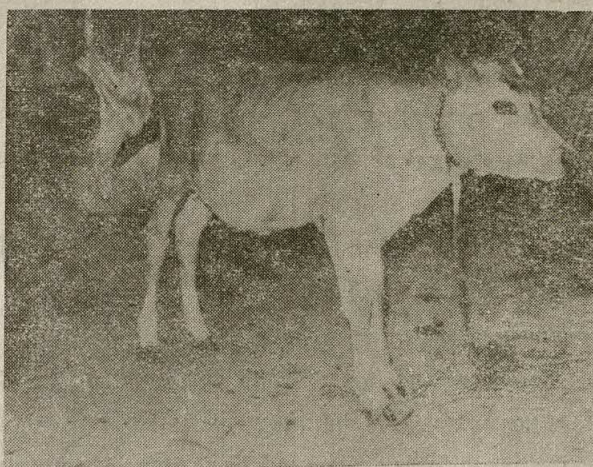
গেলাম। ব্লক অফিস থেকে শীতলবাবুর বাড়ি কয়েক মিনিটের পথ।

দু-পাশে আমগাছ, টসটসে আমে গাছ ভর্তি। এহেন লোভনীয় দৃশ্যেও আকৃষ্ট হওয়া গেল না—সামনে বড় কৌতূহল।...উঠোনে ছাড়া রয়েছে সেই বিস্ময়-বাছুর। একে নিয়েই এত হৈ-চৈ। ইঁট রঙের। গা রোগা-সোগা ক্ষুদে নায়ক নিরীহ চোখে আমাদের দেখলো। আমরাও দেখলাম—প্রথমে ওর বাঁটকে, তারপর ওকে।

চারটে বাঁটই বেশ বড়—সাধারন সদ্যোজাত বাছুরের বাঁটের মতো ক্ষুদ্রাকৃতি মোটেই নয়। অনেকটা ছাগলের পরিণত বাঁটের চেহারা। এটা লক্ষণীয়। গৃহকর্ত্রীর অনুমতি নিয়ে বাঁট ধরে অল্প টান দিতেই সাদা দুধ নামক তরল পদার্থটি বেরিয়ে এলো। দৃষ্টিবিভ্রম নয়। বারবার করে একই ফল। হ্যাঁ, বাছুরটা দুগ্ধবতীই বটে।...এর মধ্যেই বাড়ির মেয়ে-পুরুষ ও পাড়া-পড়শীরা এসে ভিড় করেছেন। ভাব হয়ে গেল সহজেই। বাছুরের ছবি তোলা হলো। বাছুরের বয়স হয়েছে দেড়মাস (আমরা গিয়েছি মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে)। জন্মের একুশ দিন থেকেই দুধ দিচ্ছে। প্রথম প্রথম দৈনিক এক কাপ দুধ পাওয়া যেত। এখন দুধ ক্রমশ কমে আসছে, পালানটাও (স্তন-এর চলতি কথা) ছোট হয়ে আসছে; এখন আর বিশেষ দোয়া হয় না, আমরা গিয়েছি তাই...।

ঘটনাটা সবার কাছেই চমকপ্রদ, বিস্ময়কর। শীতলবাবুর অশীতিপর বৃদ্ধা মা তাঁর দীর্ঘ জীবনে এমন কাণ্ড দেখেন নি। এ শিবের দান, ওপরওলার লীলা। ক-দিন আগে পর্যন্ত প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছে এই ভিটেতে। দৈব প্রভাবের কথা বলেছে কেউ, কেউ কেবল বিস্মিত হয়েছে—ব্যাখ্যা খুঁজে পায় নি। বাড়ির লোকেরা জোরের সঙ্গে বললেন—না, কোন মন্দির প্রতিষ্ঠা বা পুজোআর্চা হয় নি। 'প্রণামীর থালায় পয়সা পড়ছে এন্তার'—এরকম একটা গুজব ছড়িয়েছিল বোধহয়, কিন্তু তা একেবারেই ভিত্তিহীন। দু-চারজন বুড়ো মানুষ প্রণামী দিতে এসেছিল তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—তবে ও দুধ আমরা খাই নি। কিসের থেকে কী হয়, কোথায় দোষ লেগে যায়! সামনের শিব-মন্দিরে দিয়ে এসেছি রোজ।

—শিব-মন্দিরে কেন?

—লোকে বললে শিব ঠাকুরের কৃপায় এমন হতে পারে। দেখছেন না, বাছুরটার কপালে কেমন ফটফটে সাদা শিব-চিহ্ন! ও-ই...বিশ্বাস আর কি!

সত্যিই তাই। এতক্ষণ খেয়াল করি নি। বাছুরের গোটা খয়েরি রঙা দেহে কোন ছোপ নেই, কেবল কপালে ওই সাদা ছোপ (প্রথম ছবিতে লক্ষ্য

করুন)। ঠিক শিবের তৃতীয় নয়নটি যেন, কিংবা চন্দ্রচূড়ের চাঁদ; আদর করে বাছুরের নামও রাখা হয়েছে 'চাঁদা'। এরকম কাকতালীয় ঘটনা কত সহজে মনকে দেব-দেবীর দিকে ঠেলে দেয় ; এটা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক এক প্রকৃতি-বৈচিত্র্য সেটা বিশ্বাস করানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

দেখাশোনার পালা শেষ। আমাদের গাত্রোত্থান। ওঠার মুখে মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা নিন্দুক চরিত্রটা হঠাৎ গলা বাড়িয়ে বলতে চাইল—বাঁট থেকে যা বেরোচ্ছে তা তো দুধ নাও হতে পারে, যদি অন্য কোন রসক্ষরণ হয়—কোন রোগের জন্য ? চোখে দেখে কী বুঝবে ?…তা-ও তো বটে। একটু দুধের জন্য অনুরোধ করতে শ্রীমতী সরদার ছোট একশিশি বাছুরের দুধ আমাদের দুয়ে দিলেন। যত্ন করে প্যাকেটে মুড়ে সঙ্গে নিলাম নমুনাটা।

ফিরতি পথে ছোট জাগুলিয়া স্কুলের শিক্ষক শ্রীফজলুল হক আমাদের কিছু তথ্য দিলেন : বাছুরটা কৃত্রিম প্রজননের উৎপাদন। বামুনগাছির গো-প্রজনন কেন্দ্রের উন্নত জাতের জার্সি ষাঁড়ের শুক্ররস (২০৪ জার্সি সিমেন) ইনজেকসন দেওয়া হয় গাভীকে ২৩ জুন '৮১ তারিখে। মা গাভীটিও কৃত্রিম প্রজননেরই গরু ছিল। জার্সি গরু সাধারণত দুই/আড়াই বছরে গাভীন হওয়ার উপযোগী হয়ে ওঠে, তখনই দুধ দেওয়ার প্রশ্ন আসে। অথচ এক্ষেত্রে তিন সপ্তাহ বয়সেই, গর্ভবতী না হয়েই, গরু দুধ দিচ্ছে। আশ্চর্য কাণ্ড!

ছোট জাগুলিয়ায় বহুজনের ঘরেই গরু আছে। কেউ এমনধারা ঘটনার কথা শোনেন নি। শীতলবাবুর বৃদ্ধা মা-র কথা আগেই বলেছি। সামনে বারাসাতের ১নং ব্লক ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি। সেখানকার প্রবীণ দুই কর্মী সুবোধ বসু আর নরেশ দাস তাঁদের ২৩/২৪ বছরের কর্মজীবনে এরকম কোন 'কেস' পান নি। কলকাতায় এসে বেলগাছিয়ায় বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বললাম—তাঁদেরও অভিজ্ঞতায় এরকম বিচিত্র 'কেস' নেই। প্রাসঙ্গিক বই-পত্রেও ঠিক এরকম ঘটনার উল্লেখ দেখা গেল না। বাড়ির মা-মাসি এবং ধাত্রীবিদ চিকিৎসকেরা জানেন মানুষের ক্ষেত্রে সদ্যোজাত শিশুর বুকের দুগ্ধ-গ্রন্থি থেকে দুধ বেরোয়। এটা ঘটে, বিরল কিছু নয়। একে ইংরিজিতে বলা হয় উইচ্‌স মিল্‌ক্ (**Witch's Milk**)। এর সহজ ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। কিন্তু পশুর ক্ষেত্রে এরকমটা ঘটে না। তাছাড়া মানব-শিশুর এই দুগ্ধক্ষরণ জন্মের কয়েকদিন পরেই বন্ধ হয়ে যায়—অথচ আমাদের বিস্ময়-বাছুর অনেকদিন ধরে দুধ দিচ্ছে, বাঁটও বৃদ্ধি পেয়েছে অস্বাভাবিকভাবে, এটা কেমন করে সম্ভব ? খোঁজ নিয়ে জানলাম গর্ভাবস্থায় মা-গরুটিকে দুধ বাড়ানোর

কোন ওষুধ (যেমন পিটুউট্রিন—যা গোয়ালারা হরদম প্রয়োগ করেন বেশি দুধ পাওয়ার জন্য) দেওয়া হয় নি—সুতরাং বাছুরের ওপর কোন ওষুধের প্রভাব আসার সুযোগ নেই। তাহলে ? তবে কি সত্যিই এ কোন অলৌকিক ব্যাপার ? কেউ বললেন, প্রকৃতির খেয়াল। তারই বা অর্থ কী ? প্রকৃতি-বৈচিত্রেরও তো একটা যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকবে, না থাকলে সেই অলৌকিকতার ভূতই আবার মাথা চাড়া দেবে। কাজেই এ-অবস্থায় প্রয়োজন—সুসম্বদ্ধ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ।

ছোট বাছুরের কেমন
পুরুষ্টু দুধেল বাঁট

প্রথম সংশয়টা কাটানো দরকার শুরুতেই—বাছুরের বাঁট থেকে যা মিলেছে তা আদৌ দুধ কি না। যে নমুনাটুকু সংগ্রহ করে এনেছিলাম, সেটা পরীক্ষা করানো হলো কলকাতার সেণ্ট্রাল ফুড লেবরেটরিতে (CFL)। রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা গেল—নমুনা তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) ০·৯৩, যা সাধারণ গরুর দুধের ক্ষেত্রে হয় ০·৯৫ ; তরলের pH মান ৬·৫, গরুর দুধের ক্ষেত্রে হয় ৬·৭ ; তরলে অ্যাশ (ash) উপাদান রয়েছে ১·০১%—গরুর দুধে থাকে ০·২৫%। এছাড়া নমুনা তরলে পাওয়া গেছে কেজিন (বা প্রোটিন), ল্যাকটোজ এবং ফ্যাট। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে বলা যাচ্ছে বাছুরের বাঁট থেকে আমরা যা সংগ্রহ

করেছিলাম তা দুধ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

কিন্তু কিভাবে এই দুধ আসছে? এর উত্তর পেতে গেলে একটু পেছন থেকে এগোতে হবে, জানতে হবে বাঁটে দুধ কেন হয়—কোন্ প্রক্রিয়ায় এটা ঘটে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্তন বা বাঁট হলো এক ধরনের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine gland) যা সন্তানের প্রাণরস সিঞ্চন করে প্রাকৃতিক নিয়মে। প্রাণীদেহের দু-টি যৌন উত্তেজক রস বা হরমোন (Hormone)—ইস্ট্রোজেন (Oestrogen) ও প্রোজেস্টেরন (Progesteron)—শরীরের ভেতর সক্রিয় থেকে স্তন-গ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটায়; আর স্তন বা বাঁট থেকে দুধ বের করার কাজটা করে প্রোল্যাকটিন বা ল্যাকটোজেনিক হরমোন (PLH)। এই ল্যাকটোজেনিক হরমোনের উৎস হলো শরীরের ভেতরকার (মাথার) পিটুইটারি গ্রন্থির সামনের অংশ (Anterior Pituitary gland)। দুধ দোয়ানোর সময় বা বাচ্চা দুধ খাওয়ার সময় বাঁটে চাপ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংকেত চলে যায় মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশে। সেখান থেকে কয়েকটা ধাপে পিটুইটারির সামনের অংশে উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়, আর ল্যাকটোজেনিক হরমোন PLH (সেই সঙ্গে অল্পমাত্রায় STH, ACTH প্রভৃতি হরমোনও বেরোয়) বেরিয়ে এসে বাঁটের দুগ্ধকোষগুলো থেকে দুধ বের করে দেয়।

তবে এই দুগ্ধক্ষরণের ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে পরিণত বয়সের গাভীর বাঁট ও যৌন অংশগুলির পূর্ণ বিকাশের আগে ঘটবার কথা নয়। এর স্পষ্ট কারণও রয়েছে। যে ইস্ট্রোজেন (এবং প্রোজেস্টেরন) হরমোন গাভীর যৌন পরিণতি ও বাঁটের পূর্ণতা আনবার জন্য সক্রিয় তারা কিন্তু আবার পিটুইটারির ল্যাকটোজেনিক হরমোন নিঃসরণকে বাধা দেয়, আটকে রাখে। স্তনগ্রন্থির পূর্ণবৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত ইস্ট্রোজেন হরমোন দুগ্ধক্ষরা PLH হরমোন রসকে সক্রিয় হতে দেয় না—বিশ্বস্ত প্রহরীর মতো কাজ করে। ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোনের সবচেয়ে বড় উৎস হল গর্ভফুল (Placenta)। বাছুর জন্মাবার আগে পর্যন্ত গর্ভফুল থেকে প্রচুর পরিমাণে ইস্ট্রোজেন হরমোন বেরিয়ে গাভীর রক্তে মিশে বাঁট থেকে দুধ বেরনো আটকে রাখে। কিন্তু সন্তান জন্মের সময় নাড়ি ছিন্ন হয়ে গর্ভফুল দেহ থেকে বেরিয়ে এলে পর এ-হরমোনের দারোয়ানী আর থাকে না—ফলে পিটুইটারি গ্রন্থি সক্রিয় হয় এবং দুধ নিঃসরণের ব্যবস্থা চালু হয়। এই ঘটনাটা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গেও মিলিয়ে নিতে পারি। শিশুর জন্মের পরই মায়ের স্তনে দুধ আসে। কিংবা দেখবেন, দুগ্ধবতী গরু গর্ভাবস্থায় দুধ দিলে তার দুধ

ক্রমশ কমতে থাকে কিন্তু বাছুর জন্মানোর পরই দুধের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যায়।

হরমোনের এইসব ক্রিয়াকলাপের আবার একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেটাই আমাদের আলোচ্য বিচিত্র ঘটনাটি প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানী নেলসন ও ফলি-র গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভবতী মা বা গাভীর রক্তে ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা বেশি থাকলে পিটুইটারির উদ্দীপনা ও দুগ্ধ-ক্ষরণ আটকে থাকে বটে কিন্তু উল্টো ব্যাপার হয় রক্তে ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমাণ কম থাকলে—তখন স্বল্পমাত্রার ইস্ট্রোজেন আবার পিটুইটারি থেকে ল্যাকটোজেনিক হরমোন নিঃসরণ ঘটায় এবং বাঁটে দুধ আসে। গর্ভাবস্থায় মায়ের রক্তের ই. ও প্রো. হরমোন যদি নাড়ি ও গর্ভফুলের মধ্যে দিয়ে ভ্রূণের (গর্ভস্থ শিশু) দেহে কিছু পরিমাণে চলে এসে থাকে ব্যতিক্রমের নিয়মেই, তাহলে সদ্যোজাত বাছুরের স্তনগ্রন্থির পূর্ণতা দেখা যাবে এবং সেই সঙ্গে তার স্তন বা বাঁটে দুধও পাওয়া যাবে। আর যেহেতু বাছুর মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাই তার শরীরে এই হরমোনের ক্রিয়া ক্রমশ কমতে থাকবে—ফলে দুধও ক্রমে কমে আসবে।

এবার চলুন ফিরে যাই ছোট জাগুলিয়ার ক্ষুদে নায়কের কাছে। তার বাঁটের বৃদ্ধি আমরা দেখেছি (দ্বিতীয় ফটোটা আরেকবার দেখুন)—সুতরাং ঘটনাচক্রে মা-গাভীর রক্ত থেকে ভ্রূণ-বাছুরের দেহে যে ই. হরমোন প্রবেশ করেছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ মিলছে ; এ অবস্থায় ঐ বাছুরের বাঁটে দুধ হওয়াটাই স্বাভাবিক —অলৌকিক নয়। আরো প্রমাণ হলো—বর্তমানে বাছুরের দুধ ক্রমশ কমে আসছে (প্রতিবেদনের শুরুতেই বলা হয়েছে), এরকমটাই হওয়ার কথা।

কিন্তু কেন এই ব্যতিক্রম হলো ? সেটা নিশ্চিতভাবে জানার জন্য বাছুরটির শরীরের ভেতরকার প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিগুলির প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দরকার, সে-সুযোগ আপাতত নেই।

এরকম একটা বিচিত্র, বিরল প্রাকৃতিক ঘটনা যা মানুষের অভিজ্ঞতায় নেই, স্মৃতি-শ্রুতিতে নেই, বই-পত্রে নেই—তা নিয়ে ফুল-মালা, মন্ত্র-মানত, পূজা-প্রসাদ-প্রণামী এসব নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড হতে পারতো (এ দেশে তো আকচারই ঘটছে এমন)। কিন্তু তা হয় নি। আঞ্চলিক মানুষ অবাক হয়েছে, ধাঁধা লেগেছে, কৌতূহলের কণ্ঠরোধ করেছে বাধ্য হয়ে কিন্তু বিভ্রান্তিকে মূলধন করে ব্যবসা চালু করে নি। বাংলার এক নিপাট সাধারণ গ্রাম এই ছোট জাগুলিয়ার অধিকাংশ মানুষের সুস্থ ধর্মান্ধতামুক্ত সচেতন মন আমাদের শ্রদ্ধা বাড়িয়েছে

আর বাড়িয়েছে প্রত্যাশা···ব্যাপক মানুষের চেতনাবিকাশের স্বার্থে বিজ্ঞান আন্দোলনের উর্বর জমির প্রত্যাশা।

সহায়ক গ্রন্থ : *The Physiological Basis of Medical Practice*, 7th Ed, Best & Taylor ; pp 1096-97

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : পি. কে. বোস (CFL Cal), ডাঃ প্রদীপ দত্ত, সুব্রত চৌধুরী, উজ্জ্বল সান্যাল

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জুন ১৯৮২

দুগ্ধবতী পুরুষ ছাগল

অ লৌ কি ক ন য় বা স্ত ব
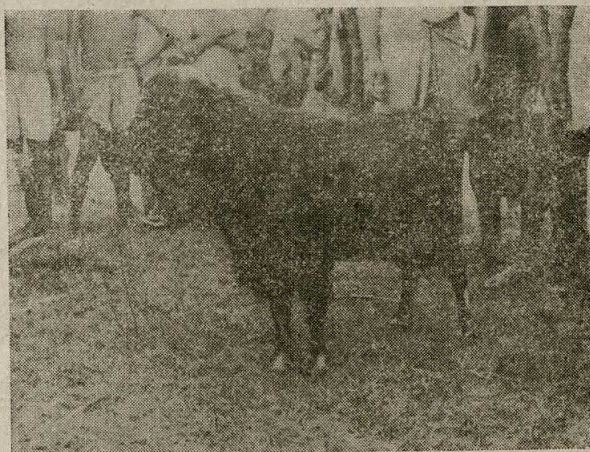
চলতি কথায় আমরা যাকে বলি 'পাঁঠা', সেই এক পাঁঠাই নাকি দুধ দিচ্ছে, হুগলী জেলার হরিপালে। বিশ্বাস হয়? হবার কথা নয়। বরং মজাদার গল্প বলেই

নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সংবাদদাতার নিজের এলাকার ঘটনা, তিনি নিজে হাতে পাঁঠার দুধ দুয়েছেন ; ঘটনাচক্রে 'উৎস মানুষ'-এর জুন '৮২ সংখ্যায় দুগ্ধবতী বাছুরের ঘটনা এবং তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি পড়েছেন—তাই অলৌকিক-দৈবিকের খপ্পরে না পড়ে আমাদের খবর দিয়েছেন।

হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনে হরিপাল। স্টেশন থেকে নেমে, এলাম গোপীনগর গ্রামে। উন্নত গ্রাম। সেখানে বন্ধুর বাড়ি দু-দণ্ড বিশ্রাম। অঞ্চলের প্রায় সবাই শুনেছে দুগ্ধবতী পুরুষ জীবটির কথা। মাস খানেক ধরেই নাকি দেখা যাচ্ছে হরিপাল ব্লকে (আমরা গিয়েছিলাম '৮২-র জুলাই মাসের শেষে)। কারুর ঘরে বাঁধা নেই, এমনি বাঁধন-ছাড়া হয়ে চরে বেড়াচ্ছে। কোথা থেকে এসেছে, কে এর মালিক—কেউ জানে না। শোনা গেল, পাঁঠাটি ভালোই দুধ দেয়, দেড়-দু-পোয়া রোজ। কেউ কেউ ধরেছে, দুধ দুয়েছে, আবার ছেড়ে দিয়েছে। কেমন খট্‌কা লাগে। নধরকান্তি এক পাঁঠা, দাবিদার নেই, সুস্বাদু মাংসের লোভ লোকে এড়াচ্ছে কী করে? তায় আবার দুধেল জীব। অনায়াসে, শরিকি বিরোধ ছাড়াই, ঘরে বেঁধে রেখে দু-বেলা ভাল দুধ মেলে—তবু কেন কেউ ধরছে না? এমন বিচিত্র বৈরাগ্য লোকের কেন? খট্‌কা পরিষ্কার করলেন গ্রামের লোকেরাই। সাদামাটা ধারণা হলো—ও পাঁঠা মানসিকের পাঁঠা, ভগবানের নামে ছেড়ে দেওয়া, সাধারণ জীব নয়। না হলে কথা নেই বার্তা নেই দুম্ করে হরিপালে উদয় হবে কেন? পাশের নালিকুল, লালপুর, বন্দীপুর গ্রামেরও কেউ এর হদিশ জানে না। এরকম আশ্চর্য জীব—অলৌকিক কিছু তো হবেই—তাকে ধরলে, দুধ নিলে, বিপদ হতে পারে, ভয় লাগে। কেউ বললে—দেবতার কাছে উৎসর্গ ছিল, বলি দিতে গিয়েও পারে নি, ঘাড়ে কোপের দাগ আছে (এই দাগটা সম্পর্কে আমাদের তখনই কৌতূহল বেড়ে গেল)—একে ঘরে রাখলে, দুধ খেলে পাপ লাগবেই !...এরকম নানাবিধ ধারণা আর অন্ধবিশ্বাসের নায়ক (বা নায়িকা!) হয়ে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই ছাগল। কোন হিল্লে-হদিশ নেই। বুঝলাম, তেনার দর্শন পেতে গেলে আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজের, মনে হলো, খুব কিছু বিচলন নেই। ঘটনাটা শুনেছেন অনেকেই, বিস্ময় লেগেছে কমবেশি, ব্যস্। আগ্রহ নেই, যাচাই করার মানসিকতাই যেন নেই। এই মানসিক আলস্য, বিচারবুদ্ধির স্তব্ধতা, চারপাশের বাস্তব দুনিয়া সম্পর্কে নির্লিপ্ততা—বড় হতাশব্যঞ্জক। বিপজ্জনকও বটে। শিক্ষিত সচেতন শ্রেণীর মানুষের জীবনে বিজ্ঞানমনস্কতার অভাবই শেষমেশ সামাজিক অবক্ষয় আনে। সত্যি বলতে কি, ব্যাপকস্তরে এই অ-বৈজ্ঞানিক মানসিকতার

চেহারাটাই বর্তমান প্রতিবেদন লেখার পেছনে অন্যতম তাগিদ ছিল—এক বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার প্রয়োজনে।

এবার অনুসন্ধান শুরু। নাম-ধাম কিছু নেই, 'গরু খোঁজা'র মতোই ছাগল খোঁজা। জনে জনে জিজ্ঞেস করি। গত সপ্তাহে অমুক গ্রামে ছিল, দু-দিন আগে অমুকের বাড়ি, গতকাল মদন মোহন সাধুখাঁ'র ঘরে। মদনবাবু বললেন, 'আজই দেখা গেছে পাশের গাঁয়ে।' ক্ষেত-খামার খানা-খন্দ পেরিয়ে অবশেষে দেখা মিললো, গ্রামের ছেলে-ছোকরাদেরই চেষ্টায়, একটা খোলা মাঠে। অনেক গরু-ভেড়া-ছাগলের দলে মিশে চরছে আমাদের এই পাঁঠা-ছাগল। আমরা যখন আল ছেড়ে মাঠে নামি তখন সে এক ছাগীর সঙ্গে প্রেম বিনিময় করছিল। রস-ভঙ্গ ঘটালো গাঁয়ের লোকজন, হৈ হৈ করে গিয়ে পাকড়াও করলো তাকে। এতক্ষণ খেয়াল করি নি—পিল পিল করে লোক জড়ো হচ্ছে আমাদের চারপাশে; কলকাতা থেকে আসা 'বাবু'দের কাণ্ড দেখতে ভিড় আর কি!

পুরুষ ছাগলের দুটো পুরুষ্টু বাঁট

প্রমাণ সাইজের পাঁঠা। মিশ-কালো। লোমশ শক্ত-পোক্ত গড়ন। বয়স আন্দাজ দু-আড়াই বছর হবে। তর সইছিল না আমাদের। সত্যিই দুগ্ধবতী কি-না জানা গেল এইবার। দিব্যি দুটো বাঁট—অণ্ডকোষের সামনেই। পুরুষ-লিঙ্গ স্ত্রী-লিঙ্গের বিচিত্র সহাবস্থান। রীতিমতো বিস্ময়কর! বুঝলাম, সাধারণ মানুষ এরকম অভিজ্ঞতা থেকে আজব গল্প ছড়ালে সত্যিই দোষ দেওয়া যায় না। পালান ছোট, কিন্তু বাঁট দু-টি বেশ বড়, পরিণত ছাগীর যেমন হয়। তখনই বাঁট

টিপে কিছুটা দুধ সংগ্রহ করা হলো নমুনা হিসেবে—স্বাভাবিক সাদা দুধ (পরে কলকাতায় এনে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করিয়েছি আমরা। হ্যা দুধই সেটা, অন্য কোন রসক্ষরণ নয়)।

এরপরই মনে এলো ঘাড়ে কোপের দাগের কথা। ঘাড়ে একটা আবছা সাদা দাগ আছে বটে ঘন লোমের নিচে। কিন্তু সেটা দড়ির দাগ বলেই মনে হলো আমাদের ; এই মনে-হওয়াকে সমর্থন করলেন পাশে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ চাষী। বললেন 'তাই বটে। ছোট বয়সে বাঁধা দড়ি পরে এঁটে বসে অমন দাগ হয়।' আর এখন প্রচারিত রহস্যের মান রাখতে বলির কোপের গল্পের সাথে মেলানো হয়েছে।

এবার আসা যাক এ-রহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দিকটায়। জীবদেহের যৌন অঙ্গ বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্য কিছু হরমোন রস সক্রিয় থাকে আমরা জানি। শরীরের ভিতরকার বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে বেরোনো হরমোন—ইস্ট্রোজেন (Oestrogen), প্রোজেস্টেরন (Progesteron), টেস্টোস্টেরন (Testosteron), অ্যাণ্ড্রোজেন (Androgen) ইত্যাদির ক্রিয়ায় পুরুষ এবং স্ত্রী-দেহের যৌনাঙ্গগুলি বেড়ে ওঠে। এ-প্রসঙ্গে কিছু বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এই বই-এর 'দুগ্ধবতী বাছুর'-এর লেখায় (পৃ. ৯)।

প্রকৃতির যাবতীয় নিয়মবদ্ধ কাণ্ড-কারখানার স্রোতে মাঝে মধ্যে কিছু বিচ্যুতি বা fluctuation আসতে পারে (তাও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবশ্যই)—সেটাই ব্যতিক্রম হয়ে দেখা দেয় আমাদের অভিজ্ঞতায়। হরমোন নিঃসরণের সামান্য হেরফেরে পুরুষ জীবের মধ্যে স্ত্রী-লক্ষণ কিংবা স্ত্রী-র মধ্যে পুং-লক্ষণ দেখ যেতে পারে। অর্থাৎ সে-ক্ষেত্রে সেই জীবটির দেহে উভলিঙ্গের বৈশিষ্ট্য এসে যায় —একাধারে পুরুষ এবং স্ত্রী।…কিন্তু এ-জানাতেও মন ভরে না। কিভাবে, কোন্ ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম ঘটে, প্রকৃতি বৈচিত্রের সেই মৌল রহস্য জানা দরকার। এরজন্য আমাদের যেতে হবে জীবদেহযন্ত্রের অন্তরতম প্রদেশে—জিনতত্ত্বের দুনিয়ায়।

মোটামুটিভাবেই আমরা অনেকেই 'জিন' (Gene) শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। আমাদের শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভর করে এই জিন বা বংশাণুর ওপর। এরই জন্য মানুষের বাচ্চা মানুষ কিংবা কুকুরের ছানা কুকুর হয়। শুধু তাই নয়, আমরা যে মা-বাবার বৈশিষ্ট্যগুলি (আকৃতি, প্রকৃতি, রঙ ইত্যাদি) উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করি, তাও নির্ভর করে জিন-এর ওপর। প্রতিটি দেহকোষের কেন্দ্রে থাকে ক্রোমোজোম (Cromosome), জিনগুলি সাজানো থাকে ক্রোমোজোমের

ভেতর। এক একটি ক্রোমোজোমে অসংখ্য জিন রয়েছে। এই ক্রোমোজোমের সংখ্যা আবার বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, এক ধরনের প্রজাপতির ক্ষেত্রে ৮, মানুষের ক্ষেত্রে ৪৬ বা ২৩ জোড়া। এই ২৩ জোড়ার এক জোড়া হলো সেক্স (Sex) ক্রোমোজোম, এর ওপরই জীবের লিঙ্গ বা sex নির্ভর করে। জোড়ার একটির নাম X, অন্যটি Y। যখন দুটো ক্রোমোজোমই X হয় তখন নবজাতক হয় স্ত্রী ; আর যখন জোড়ার একটি X অপরটি Y হয়, তখন সৃষ্টি হয় পুরুষ সন্তান। এ হলো সাধারণ নিয়ম। কিন্তু নানাবিধ কারণে অ-স্বাভাবিক ব্যাপারও ঘটতে পারে। যেমন, সেক্স ক্রোমোজোমের সংখ্যা এক জোড়া না হয়ে এক বা দু-য়ের বেশি হতে পারে। উদাহরণ হলো—XO (O মানে নেই) বা XXY বা XXXY বা XYY ইত্যাদি। এরকম ক্ষেত্রে লিঙ্গ (sex) আর সুনির্দিষ্ট থাকছে না, গোলমাল হচ্ছে। এ-জাতীয় লিঙ্গ গোলমালের সংখ্যা নেহাত কমও নয়—মানুষের ক্ষেত্রে তো হাজারে ২ থেকে ৪ পর্যন্ত হতে দেখা যায়। তাছাড়া অন্যভাবে ক্রোমোজোমের পরিবর্তনেও নবজাতকের লিঙ্গ-বিভ্রাট ঘটতে পারে।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় প্রথম ৫/৬ সপ্তাহে লিঙ্গের কোন তফাৎ থাকে না। এরপর দেড় মাসের পর থেকে ধীরে ধীরে লিঙ্গ বিভাজন শুরু হয়। তখন ভ্রূণ-এর মূল জননতন্ত্র থেকে (Primitive Gonad) ছেলের ক্ষেত্রে অণ্ডকোষ ইত্যাদি এবং মেয়ের ক্ষেত্রে যোনি, গর্ভাশয় ইত্যাদি প্রত্যঙ্গগুলো তৈরি হতে থাকে। এই গঠনের কাজে বিভিন্ন হরমোনের ভূমিকা রয়েছে, যা পুরুষের ক্ষেত্রে মূলত ভ্রূণের অণ্ডকোষ (Testis) নিয়ন্ত্রণ করে। জীবসৃষ্টির এই পর্যায়টাতে বিভিন্ন কারণে বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে (কারণগুলো যেমন—ক্রোমোজোম সংক্রান্ত ব্যাপার রয়েছে, তাছাড়া নানা রাসায়নিক, বিকিরণ, জীবাণু ইত্যাদি ভ্রূণে প্রবেশ করার কারণেও হতে পারে)। হয়তো প্রয়োজনীয় হরমোনের নিঃসরণ ঘটল না কিংবা নিঃসরণের কার্যকারিতা ঠিক ঠিক হলো না—ফলে ছেলে হয়েও মেয়ের বৈশিষ্ট্য এলো (অথবা মেয়ে হয়েও ছেলের গুণাগুণ)।

এছাড়া অন্য একটি ব্যাপারও ঘটতে পারে। গর্ভস্থ ভ্রূণের তৃতীয় থেকে পঞ্চম মাসে এড্রিনাল (Adrenal) গ্রন্থি থেকে কোন কারণে অতিরিক্ত পুরুষ-হরমোন নিঃসরণের ফলে মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি পুরুষ জননতন্ত্র ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য তার দেহে ফুটে উঠতে পারে। আমাদের আলোচ্য ছাগলটির ক্ষেত্রে এটি হওয়া অসম্ভব নয়। মজার ব্যাপার হলো, বিভিন্ন কারণগুলোর জন্য যে দ্বৈতজনন-তন্ত্রের (inter-sex) সৃষ্টি হয়, তা সাধারণত জন্মের সময় প্রকাশ পায় না। স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃত পার্থক্যটা ধরা পড়ে বয়ঃসন্ধিকালে যখন বহিরঙ্গের লিঙ্গ চরিত্রগুলো

পূর্ণতা পেতে শুরু করে। মানুষের ক্ষেত্রে তো আমরা মাঝেমধ্যেই খবর শুনি—অপারেশন করে 'ছেলে'কে মেয়ে করা হয়েছে কিংবা 'মেয়ে' থেকে ছেলে। আসলে এটা ওই উভলিঙ্গ বা inter-sex-এর ব্যাপার। হরিপালের পাঁঠা-ছাগলটিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে জানা দরকার, তার দেহকোষে ক্রোমোজোমের সঠিক হিসেব কত আর রক্তস্রোতে প্রবাহিত হরমোনের সঠিক পরিমাপ কত। আরও জানা দরকার, ছাগলটির অণ্ডথলিতে ঠিক ঠিক অণ্ডকোষ বা শুক্রাশয়ই রয়েছে কিনা; এর শরীরে হয়তো গর্ভাশয়ও আছে—পরীক্ষা করা দরকার। আর স্তনগ্রন্থি বা বাঁটের পূর্ণতা এলে তখন সেখানে দুধও আসতে পারে গর্ভাধান ছাড়াও। আমরা জেনেছি মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থির উদ্দীপনায় প্রোল্যাকটিন হরমোন বা PLE সক্রিয় হয়ে বাঁটে দুধ এনে দেয়। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে, গর্ভাধান না হলে বা সন্তানধারণ না করলে দুধ হয় না; কিন্তু ব্যতিক্রম হিসেবে কোন স্ত্রী-দেহে অত্যধিক প্রোল্যাকটিন হরমোন নিঃসরণ হলে স্তনগ্রন্থিতে দুধ আসতেই পারে। গ্যালাকটোরিয়া বলে হরমোনের একরকম রোগ আছে, তাতে কুমারী মেয়ের বুকে দুধ এসে যায় ওই প্রোল্যাকটিন হরমোনের বাড়াবাড়ির জন্য। আমাদের ছাগলটির ক্ষেত্রেও এ-ব্যাখ্যা খাটতে পারে—যা প্রমাণিত হবে, তার রক্তে হরমোনের মাত্রা সঠিকভাবে মাপতে পারলে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন হরমোন রসের ধর্ম বা ক্রিয়াকলাপের সাথে সঙ্গতি রেখেই 'আপাতভাবে পুরুষ অথচ স্ত্রী' জীবটির যৌনাঙ্গগুলি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উভলিঙ্গ ছাগলটির দুধ দেওয়া তাই ব্যাখ্যার-অতীত অলৌকিক কিছু নয়—বিজ্ঞানসম্মত একটি অ-স্বাভাবিক ঘটনামাত্র।

হরিপালের পাঁঠাটি সম্পর্কে কত না বিচিত্র কাহিনী লোকের মুখে মুখে ছড়িয়েছে। রহস্যপ্রিয় মানুষ অভ্যাসবশে আপন বুদ্ধিকে কত অর্বাচীন বিভ্রান্তির মধ্যে এনে ফেলে দেয় তার একটা নিদর্শন হলো হরিপালের ওই ঘটনা। অবশ্য দ্বন্দ্বও রয়েছে। বস্তুবাদী আবহাওয়ায় বেঁচে থাকা শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে অনেকেরই চিন্তায় প্রতিক্রিয়া আসছে। যেমন, মাঠে যখন আমরা তথ্য জোগাড় করছি, তখন এক বৃদ্ধা আর এক যুবক চাষী বেশ উজ্জ্বল মুখ করে বলছিলেন—এ হলো ঠাকুরের পশুরূপ, বুঝলেন! এর দুধ যে খাবে সে মরবে। এই তো, পাশের সাঁকরা গাঁয়ের এক ঘরে এই পাঁঠার দুধ দুয়ে রেখেছিলো, রাতে মনসার বাহন এসে দুধ খেয়ে গেছে। ভাবুন···তক্ষুণি পাশ থেকে হরিপাল বাজারের মাছ বিক্রেতা বসুমালিক বললেন—রাখুন তো যত গপ্প! আসলে দুধটা বাড়ির লোক মেরে দিয়েছে। এখন বদনাম হবে—লোকে বলবে মানসিকের পাঁঠার দুধ

খেলে কেন ? পাপ লাগারও ভয় আছে, তাই কৌশলে মা মনসার গল্প রটাচ্ছে।

এই মানসিক দ্বন্দ্বে আমরা উত্তরণের সূত্র খুঁজে পাই।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো: চিত্ত সামন্ত

কৃতজ্ঞতাস্বীকার: স্বরজিৎ জানা; *Science Today* মে, ১৯৭২

সেপ্টেম্বর ১৯৮২

আলিপুরে পুলিশ ভূত

কলকাতার 'সর্বাধিক প্রচারিত এক প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে' প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রসঙ্গে উৎস মানুষ-এর প্রতিবেদন

মা বলতেন, বুঝলি আত্মা বলে কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে। আত্মা শান্তি না পেলে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তবে অত ভয়ের কিছু নেই। মনে সাহস রাখলে আর রাম নাম মুখে আনলে ভূত কোন ক্ষতি করতে পারে না।

পাড়ার এক মাসীমা আমায় ভীষণ ভালোবাসতেন। দুপুরবেলা একা একা তার বাড়ি যেতাম। শুয়ে শুয়ে তিনি গল্প শোনাতেন—ভূতের।...তারপর বুঝলি তো, যেই না ভদ্রলোক খেতে বসেছে, ভূতটা নাকিস্বরে জিজ্ঞেস করল, আঁপনি লেঁবু খাঁবেন ? বলতে না বলতেই জানলা দিয়ে বাঁশের মতো ইয়া লম্বা হাত বার করে ঘরে বসেই লেবু পেড়ে আনল।

গলার স্বরকে এমন খেলিয়ে খেলিয়ে গল্প বলতেন মাসীমা, মনে হতো সত্যি একটা বিরাট লম্বা হাত যেন আমায় ধরতে আসছে। ফিরে ফিরে জানলার দিকে তাকাতাম আর মাসীমার গা ঘেঁষে শুতাম। কিভাবে বাড়ির সবাই কলেরায় মারা গিয়ে ভূত হয়েছিল, কিভাবে এক মহিলা ভূত উনুনের মধ্যে পা ঢুকিয়ে পা দিয়ে উনানে হাওয়া করত, কিভাবে খাঁ-খাঁ করা ফাঁকা বাড়িতে হঠাৎ হঠাৎ 'হরিবোল হরিবোল' আওয়াজ উঠত—এইসব আরো নানান গল্প। বলতে বলতে মাসীমা যখন ঘুমিয়ে পড়তেন, আমি পালিয়ে আসতাম বাড়িতে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতাম বাড়ির দিকে। আসবার পথে ছিল একটা তালগাছ। সেটাকেই ছিল

সবচেয়ে বেশি ভয়। বাতাসে তালগাছের পাতাগুলো যখন সরসর করে নড়তো মনে হতো ভূতেরা বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়ছে। চারপাশ দিয়ে লম্বা লম্বা হাতগুলো যেন আমার দিকে ধেয়ে আসছে।

চারপাশের পরিবেশটা ছিল এমনই, সবাই এমন ভূতের গল্প বলতো, ভূতকে ভয় পেত, ভূতে বিশ্বাস করতো—ভূত যে না-ও থাকতে পারে এভাবে কখনও ভাবতেই পারতাম না। কোনদিন ভূত দেখি নি অথচ ভূতের আতঙ্কে বড় হয়েছি। আমি একা নই। আমার মতো আরো অনেকে, অধিকাংশই, বিশেষ করে অবৈজ্ঞানিক শিক্ষার পরিবেশে বড় হয়েছে যারা। এই আতঙ্ক যে কতটা মজ্জাগত, ছেলেবেলার সেই মামুলী গল্পগুলোর যে বড়বেলায় অব্দি কি ব্যাপক প্রভাব তা টের পেলাম একটি ঘটনায়।

গত ২১শে এপ্রিল '৮২ 'সর্বাধিক প্রচারিত' সেই পত্রিকায় ভূতের খবরটা বেরনোমাত্র আমাদের মাথায় আইডিয়া খেলে গেল—ভূতকে দেখবো, তার ছবি তুলবো, সম্ভব হলে পাকড়াও করব। রাত জেগে বসে থাকবো আলিপুরে। কিন্তু তার আগে তো আরো কিছু খবর জানবার আছে। সেই পুলিশ ভূতের হালচাল, কোথায় কখন আসে, কে বা কারা দেখেছে ইত্যাদি তথ্য জানা দরকার। একাধিক চিঠি লেখা হলো ওই দৈনিক পত্রিকায়, উত্তর আসে না। [উত্তর আজও মেলে নি] কিন্তু উত্তরের অপেক্ষায় বসে থাকলে তো আর চলবে না, তাই গেলাম সেই সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিকের অফিসে। আলাদা আলাদা ভাবে। দফায় দফায়। সংবাদের সূত্র বার করবার আশায়। প্রত্যেকেই প্রতিটি-বারই নিরাশ হলাম। বহুকষ্টে অনেক ছলচাতুরী করে ভেতরে ঢুকলেও আসল লোকটির সাথে—যিনি রিপোর্টিং করেছেন—দেখা করা যায় নি। পেয়েছি দায়িত্বশীল সাংবাদিকদের কাছ থেকে হতাশব্যঞ্জক উত্তর।

—আপনারা বলেছেন ট্যাক্সি ড্রাইভাররা পুলিশে অভিযোগ করেছে। কোন্ থানায় অভিযোগ করেছে?

—বলা যাবে না। অনেকেই খোঁজখবর করছে। আপনি নিজে খোঁজ নিন, জানতে পারবেন।

—দেখুন, আপনাদের দৈনিকের একটা সুনাম আছে। লোকে ভরসা রাখে। ভূতের খবর প্রচারের সাথে সাথে তা ব্যাপক মানুষের মধ্যে আলোড়ন তুলেছে। আপনাদের কি নৈতিক কর্তব্য নয় এ-নিয়ে সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসার নিরসন করা?

—লোকের তো করবার মতো আরো কাজ আছে। এসব গল্প পেলেই

তাদের যত লাফালাফি ? কোথায় কে কি বলল তাই নিয়ে এত হৈ চৈ কিসের ? কেউ যদি ভূত দেখে থাকে তাতে তো কারো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হলো না !···

তারপর পকেট থেকে সিগারেট বার করে, আগুন জেলে, স্বর পাল্টে চেয়ারটা কাছে টেনে নিয়ে খাটো গলায় বললেন, আসল কথা কি জানেন মশাই, মানুষ মাঝে মাঝে এরকম খোস গল্প চায়। মজা পায়। আমরাও তাই ছাপাই।

আমরা মুগ্ধ হলাম।

এলাম আলিপুর, স্পেশাল জেলের গায়ে লাগানো চিড়িয়াখানার উল্টো-দিকের পেট্রোল পাম্পে।

—খবরের কাগজে তো দেখেছেন আপনাদের সামনের এই রাস্তায় গভীর রাতে 'পুলিশ অফিসার ভূত' আসে। আপনারা আগে থেকে কিছু জানতেন না ?

—না, কোনদিনও কিছু শুনি নি।

—রাতে কতক্ষণ খোলা থাকে এই পাম্প ?

—সাড়ে-ছ-টা সাতটা। তারপর তিন-চারজন পাহারায় থাকে সারারাত। নিধির, বলরাম, ঘনশ্যাম, শনিচর। এরা কেউ কোনদিন কিছু দেখে নি, শোনে নি। কাগজে এসব বেরনোর পর দিন কয়েক আগে মাঝরাতে বাইকে চড়ে দু-জন ভদ্রলোক এসেছিলেন। ঘণ্টা-দুয়েক অপেক্ষা করলেন, আমাদের সাথে গল্প করলেন, ভূতের দেখা না পেয়ে বাড়ি চলে গেলেন। কি ঝামেলা বুঝুন তো ! কাগজে এসব নিয়ে হইচই হবার পর থেকে সন্ধ্যার পর এখানে ট্যাক্সি থামতেই চায় না। এমনিতেই জায়গাটায় লোক কম, তার ওপর এসব খবর ছাপা হলে শত দরকারেও আর গাড়িঘোড়া মিলবে ?

চিড়িয়াখানার গা ঘেঁষে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু ট্যাক্সি। পরপর দু-দিন গিয়ে আমরা তাদের সাথে কথা বললাম। উত্তর একটাই—জানি না, কিছু শুনি নি। ব্যতিক্রম শুধু রামসুভগ সিং, **WBT 1628**-এর চালক আর **WBT 6569**-এর চালক লক্ষ্মণলাল মণ্ডল। এরা আগে থেকে ব্যাপারটা শুনে-ছিল। ব্যাস, ঐ শোনা কথাই। কি করলে কোথায় গেলে যে আরো বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে, যাদের গাড়িতে ভূত উঠেছিল দেখা পাওয়া যাবে, সে-ব্যাপারে কিছুই জানে না কেউ।

রামসুভগ আর লক্ষ্মণলাল—দু-জনেরই বয়েস তিরিশের নিচে, অথচ কি দারুণ ভূতের ভয়। অনেকক্ষণ ধরে হাত-পা নাচিয়ে মহা উৎসাহে দেশ গাঁয়ের ভূতের খবর বলল।

আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। যাদের ট্যাক্সিতে ভূত উঠেছে তাদের সাক্ষাৎ

তাহলে পাওয়া যাবে কি করে ?

গেলাম বেঙ্গল ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনে। না, কোন খবর নেই মশাই। কোন ট্যাক্সি-মালিক কোনদিন কিছু রিপোর্ট করে নি। গেলাম ট্যাক্সি ড্রাই-ভারস্ ইউনিয়নে।—শুনুন, অন্তত আশিভাগ ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে আমাদের দোস্তি। কোন কিছু ঘটলে পুলিশকে বলবার আগে তারা আমাদের বলবে। অথচ কেউ কিছু বলে নি আমাদের,—বললেন ওদের সেক্রেটারি।

এমনভাবে চারদিক থেকে নিরাশ হয়েও ভাবলাম একটা কিছু অদ্ভুত কাণ্ড নিশ্চয়ই ঘটেছিল যেটা ভূতের কাণ্ড বলে প্রচার পেয়েছে। ভিত্তিহীন শোনা-গল্প খবর বলে প্রথম পৃষ্ঠাতে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হবে সর্বাধিক প্রচারিত প্রখ্যাত বাংলা দৈনিকে—এ যেন বিশ্বাস হতে চাইছিল না।

আলিপুর থানার ও. সি. তারক গাঙ্গুলী। মোম লাগানো ছুঁচলো গোঁফ। চেহারায় নেহাতই গোবেচারা ভালোমানুষ। তাই গোঁফ জোড়া দিয়ে যেন ইঙ্গিত করাতে চান—আমি লোকটি অতি ভয়ঙ্কর। আমরা সেই 'ভয়ঙ্কর' লোকটির ঘরে ঢুকলাম। কথা শুনে হো হো করে হাসলেন তিনি।—কোথায় ভূত মশাই ? কাগজে যে জায়গাটার কথা বলেছে সারারাত আমার দু-জন পুলিশ কনস্টেবল ডিউটিতে থাকে সেখানে। কেউ তো কিছু রিপোর্ট করে নি কোন-দিন। কোন ট্যাক্সি ড্রাইভারও কিছু জানায় নি এসে। কোন ডায়েরির প্রশ্নই আসে না।

ওয়াটগঞ্জ থানা। না, কোন খবর নেই। কোন ডায়েরি হয় নি। হেষ্টিংস থানা। কোন খবর নেই।

সঙ্গীকে বললাম, এবার কি করবে ? এখনো কি বলা যাবে না সমস্ত ব্যাপারটাই সাংবাদিকটির উর্বর মস্তিষ্কের উৎপাদন কিংবা কারো মুখে শোনা কথাকে খবর বলে চালান ?

সঙ্গী বলল, আরেকটু বাকি আছে।

আমরা লালবাজারের লাল বাড়িটাতে ঢুকলাম। একের পর এক এ-ঘর সে-ঘর করলাম। ডি. সি. ট্রাফিক, পি. আর. ও., পি. আর. বি., ডি. সি. ডি. ডি.। সব জায়গায় একই কথা—খবর পড়ে আমরাও তো মশাই তাজ্জব বনে গেছি। না, কোন ইনফরমেশন নেই। কোন ট্যাক্সি ড্রাইভার কিস্‌সু রিপোর্ট করে নি। আমরা সংশ্লিষ্ট থানায় খোঁজ নিয়েছি। সব বাজে। এক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বললেন—দেখুন মশাই, আমার বাড়ি ঐ আলিপুর অঞ্চলেই, রাত-বিরেতে চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে, রেসকোর্সের পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া

স্টাফ রিপোর্টার : এক পুলিশ অফিসারকে নিয়ে পুলিশমহল তোলপাড়। হাজার মাথা ঘামিয়েও তার রহস্যের কিনারা করতে পারছে না গোয়েন্দারা। সম্প্রতি কয়েকজন ট্যাক্সিচালক পুলিশকে জানিয়েছেন আলিপুর চিড়িয়াখানার কাছে পেট্রোল-পাম্পের সামনে থেকে রাত একটা থেকে দুটোর মধ্যে খাকি পোষাকের এক পুলিশ অফিসার হাত দেখিয়ে ট্যাক্সি থামাচ্ছেন। গাড়ির পিছনের সিটে বসেই তিনি ফিসফিসিয়ে ড্রাইভারকে বলছেন : "কোই ডর নেহি।" তারপর কিছু দূরে রেসকোরসের কাছে বাঁক নেবার জন্য গতি সামান্য কমাতেই খুট করে শোনা যাচ্ছে দরজা খোলার শব্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে ড্রাইভার দেখছেন কেউ নেই। ওই "অফিসার" মিলিয়ে যাচ্ছেন অন্ধকারে। প্রথমে এ ধরনের অভিযোগে তেমন আমল না দিলেও সংশিলষ্ট থানায় পরপর দুতিনজন ট্যাক্সিচালক এসে একই কথা বলায় পুলিশ খোঁজখবর নিতে শুরু করে। নানা-ভাবে নানা দিক থেকে চেষ্টা শুরু হয় এ রহস্যের জট খোলার। সন্তোষজনক কোনও সিদ্ধান্তে তাঁরা পেঁছিতে পারেন নি এখনও। যেসব অভিযোগ থানায় এসেছে তা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই "পুলিশ অফিসারটি" নেই। চেহারার যা বর্ণনা মিলছে তাতে দেখা যাচ্ছে লম্বা-চওড়া, সুপুরুষ। অতঃপর মাটির পৃথিবী ছেড়ে তাঁদের তদন্ত এগিয়েছে অন্য জগতে। পুরানো অফিসারদের একজন নথি ঘেঁটে বের করেছেন : চুয়াত্তর সালে ঠিক ওইখানেই এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন সশস্ত্র পুলিশের এক ইনস-পেকটর। বর্ণনার সংগে তাঁর চেহারার অবিকল মিল। গভীর রাতে লাইটপোসটের সংগে মুখোমুখি ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ওই ইনসপেকটর মারা যান। তিনি থাকতেন বডি গারড্স লাইনে। পরতেন খাকি পোশাক। নিঃসন্তান ওই ইনসপেকটরের স্ত্রীও ছিলেন এক সাব-ইনসপেকট্রেস। তাঁর মৃত্যুর বছর খানেক পরে তাঁর স্ত্রীও মারা যান। গোয়েন্দা অফিসাররা এখন শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কথা ভাবছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ এপ্রিল ১৯৮২

করতে হয় হরদম। কই কখনো তো কিছু দেখি নি ? শুনিও নি।

শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কথা তুলতেই হেসে উঠলেন জাঁদরেল গোয়েন্দা অফিসাররা—আপনারা বরং ঐ দৈনিক পত্রিকাটির শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করুন।

আমরা বাইরে এলাম। চায়ের দোকানে বসে কিছু সাংবাদিকের নিষ্ঠা-হীনতা, দুর্বলতা, অসততা নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম। ট্যাক্সি চালকেরা কোন্ থানায় রিপোর্ট করেছে ? ট্যাক্সি নম্বর কত ? খবরে কোন কিছুরই উল্লেখ ছিল না। ফলে কেউ যদি খোঁজ খবর করতে চায় তো ঘটনাটা যে পুরোপুরি অসত্য তা প্রমাণ করতে তার বিপুল সময় ও শক্তি ব্যয় করতে হবে। এই কি প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিকতা ? সাংবাদিক—যাদের সংবাদ পরি-বেশনের ওপর বহু মানুষের মতামত গড়ে ওঠা অনেকাংশেই নির্ভর করে, তারা যদি সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য ভিত্তিহীন খবর অক্লেশে ছেপে দেয়, তবে মানুষের মধ্যে তার প্রভাবটা কত ভয়ঙ্কর হতে পারে একটু ভাবলেই বোঝা যায়। আমাদের চা ফুরাল, কথা ফুরাল্ না।

এ-জাতের মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের উদ্দেশ্য কী হতে পারে ? মানুষ মাঝে মধ্যে এ-ধরনের 'চাটনি' খবর চায়, মজা পায়। তাই এ-জাতের খবর বেরোলে পত্রিকার বিক্রি বাড়ে, জনপ্রিয়তা বাড়ে—হয়তো।

আচ্ছা, এই সংবাদের আর একটা বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা ভাবছি না কেন ? আলিপুর-চিড়িয়ানা-রেসকোর্স অঞ্চলের মোটেই সুনাম নেই, চুরি-ছিনতাই-রাহাজানির ভয় এরকম এলাকায় থাকতেই পারে। প্রকাশিত ওই খবরে বিশ্বাস করলে জায়গাটা আরো নির্জন, গাড়িঘোড়াবিহীন হয়ে যাবে "অফিসার ভূতে"র ভয়ে, আর তখনই তো গুণ্ডা, বদমাশ, স্মাগলার, জুয়াচোর, লম্পটদের পোয়াবারো—অপরাধের রাম-রাজত্ব চালানোর কেমন সুযোগ। পত্রিকাটি সচেতনভাবে এই কাজটি করেছে তা বলছি না, বলার মতো তথ্য-প্রমাণ নেই, কিন্তু অজান্তেই তারা এরকম বিপজ্জনক এক সম্ভাবনার জন্য দায়ী হয়ে যাচ্ছেন বললে কি খুব ভুল বলা হবে ?

তবু এটাও আমাদের প্রধান দুশ্চিন্তা বা মানসিক বিচলনের কারণ হয় নি। চিহ্নিত হচ্ছি আমরা আরো গভীরতর ছায়াপাতকে অনুসরণ করে—যা আমাদের টেনে নিয়ে যায় সমাজ-জীবনের অন্তস্তলে। আজ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সঙ্কট আর বিভ্রান্তি কাঁটার মতো বেঁধে। অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অসন্তোষ আর নিরাপত্তাহীনতা সাধারণ জনজীবনকে বারবার পর্যুদস্ত করতে চায়—প্রতিনিয়ত চলে লড়াই, সুস্থ দেহে-মনে বেঁচে থাকার লড়াই। এরকম এক

TAXI DRIVERS' UNION, CALCUTTA
249D, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12
Registered No. 7926
(under the Trade Union Act of 1926)

Ref............ Date : The 6th May 1982

উৎস মানুষ
বিডি ৪৯৪, সেকটর-১
সল্টলেক, কলিকাতা ৭০০ ০৬৪

প্রিয় মহাশয়,

গত ৩.৫.৮২ তারিখে লিখিত আপনার পত্রের উত্তরে জানাইতেছি যে আনন্দবাজার পত্রিকায় ২১.৪.৮২ তারিখে প্রকাশিত "গভীররাতে ট্যাক্সির এক নিরুপদ্রব সওয়ার" সংবাদের সমর্থনে অদ্যাবধি কোন ট্যাক্সিচালক মালিক বা অন্য কোন সূত্র হইতে কেউ কোন সংবাদ আমাদের কাছে পেশ বা লিপিবদ্ধ করে নাই। এমনকি, ট্যাক্সি মালিকদের অপর সংগঠন Bengal Taxi Association নামক সংগঠনেও এ পর্যন্ত উক্ত সংবাদের সমর্থনে বা সত্যতা সম্পর্কে কোন 'রিপোর্ট' নাই।

সুতরাং মন্তব্য করা যায় যে, প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত, উদ্ভট ও নিছক অবাস্তব কাহিনী প্রচারের প্রচেষ্টা মাত্র। দুঃখের বিষয়, আনন্দবাজার পত্রিকার ন্যায় একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকে এই ধরনের সংবাদ কেমনভাবে সমাদরের সহিত গৃহীত হয় তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

ধন্যবাদান্তে—

ইতি

স্বাঃ শ্রীশিশির রায়

সাধারণ সম্পাদক

টলমলে বাস্তব জীবনে ভৌতিক বা অলৌকিক চিন্তা, অবাস্তব অযৌক্তিক ভিত্তি-হীন চিন্তা, আমাদের আরো গভীর বিভ্রান্তির মধ্যে টেনে নিয়ে যায় না কি? আমাদের আত্মবিশ্বাস ও যুক্তিশীলতাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় না কি?…এই পরিণতিটাই ভয়ঙ্কর, ভূতের ভয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

অনেকক্ষণ ধরে ছেলেবেলার ভূতের গল্পের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করলাম। আজ যেখানেই শিক্ষার আলো গিয়ে পড়ছে সেখান থেকেই ভূতেরা হঠে হঠে যাচ্ছে। তাই আজ আর শহরে ভূতের কথা বড় একটা শোনা যায় না। শহরবাসী ভূতের গল্প বললেও—মজা করে বলে, গভীর বিশ্বাসে নয়। খুব সুলক্ষণ এটা। আজ শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে দিকে দিকে। সবাই কিন্তু তা চায় না। অনেকেই চায় মানুষ অন্ধকারে বসে থাকুক। বিভ্রান্ত থাকুক। তাতে তাদের অনেক স্বার্থ সিদ্ধ হয় —ব্যবসার সুবিধা হয়। কর্তৃত্ব বা দাপট বজায় রাখা যায়, দরকারমতো সোজা-সরল মানুষকে ভৌতিক-অলৌকিকের জুজু দেখিয়ে প্রকৃত সামাজিক সত্যকে লুকিয়ে রাখা যায়। এই স্বার্থান্বেষী সমাজ-শত্রুদের হাত ততো শক্ত হয় যত ভৌতিক বোধ মানুষের চিন্তার ভিতকে দুর্বল করে রাখে।

তাই বর্তমান যুগেও ভূতের গল্পের প্রচার—তাচ্ছিল্য করার মতো নয়—মানুষের সচেতনতা প্রসারের পথে এগুলি অতি কুৎসিত আগাছা।

সঞ্জয় পণ্ডিত

মে ১৯৮২

কভুর ভূত সংবাদ

সিংহলের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও মনস্তত্ত্ববিদ আব্রাহাম থোম্মা কভুর ভূতের শত্রু। কোথাও কোন ভৌতিক ঘটনা ঘটলেই তার রহস্য উদ্ঘাটনে বেরিয়ে পড়তেন তিনি।

১৯৬১ সালের জুলাই মাসে সিংহলের অটোমোবাইল অ্যাসো-সিয়েশনের নিজস্ব মুখপত্র 'দ্য রেকর্ড'-এ তিনটে ভৌতিক কাণ্ড-

কারখানার গল্প বেরিয়েছিল যার একটির সাথে আমাদের এই আলোচ্য প্রসঙ্গের ভীষণ মিল। এক বিদেশী মহিলা ট্যাক্সিতে চড়ে শ্রীলঙ্কার রোসমিড প্লেস দিয়ে যাবার সময় দুর্ঘটনায় মারা যান। সেই থেকে সন্ধ্যার পর কোন ট্যাক্সিওয়ালা কানাট্টে কবরখানার লিচ গেটের সামনে দিয়ে গেলেই এক সাদা চামড়ার মহিলা ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে ওঠেন। রোসমিড প্লেসের একটা ঠিকানা দিয়ে ড্রাইভারকে সেখানে নিয়ে যেতে বলেন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ট্যাক্সি ড্রাইভার পিছন ফিরে দেখেন যাত্রী নেই। তাই ভয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারেরা কানাট্টে কবরখানার লিচ গেট থেকে আর যাত্রী তোলে না।

ডঃ কভুর ভাবলেন, মহিলা ভূতটি যদি কথা বলতে পারে তবে বুঝতে হবে মরে যাবার পর কানাট্টেতে কবর দেওয়ার ফলে যদিও তার ফুসফুস, মুখ, জিভ, স্বরনালি, মগজের অংশবিশেষ পচে-গলে মাটির সাথে মিশে গেছে তবু ওগুলো এখনো সক্রিয়, না হলে কথা বেরোচ্ছে কিভাবে ? কিন্তু তাই কি কখনও সম্ভব ? কল্পনাতেও আসতে পারে।

বহু চেষ্টা করেও কভুর এমন একজন ট্যাক্সিচালকেরও দেখা পেলেন না যে নিজে ওই মহিলা ভূতকে রোসমিড প্লেসে নিয়ে গেছে। দুই দিন রাত আড়াইটা অব্দি সেই লিচ গেটের সামনে আরেকজন সঙ্গীকে নিয়ে গাড়িতে বসে কাটালেন কভুর। গুনে গুনে একুশটা ট্যাক্সিকে আপ-ডাউন করতে দেখলেন। কিন্তু কোন ট্যাক্সিকেই কেউ থামাল না। প্রচারটা যে নিছক গুজব—এরকম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন কভুর।

সূত্র : বিগন গডমেন : ডঃ আব্রাহাম টি কভুর ; জয়কো প্রেস, পৃ. ১৮৪

কলিযুগের চমক

কলিযুগে আবার চমক! মা দুর্গার বিসর্জন হলো, কিন্তু খানিক পরে প্রতিমা একেবারে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লো জলের ওপর! ডুবতে চাইছে না মা দুর্গা!! এই তাজ্জব ঘটনাটা ঘটেছে গত '৮২ সালে, জবলপুরে, নর্মদা নদীর বুকে।

পঞ্চবটী (ভেড়াঘাট) জবলপুরের একটি 'ট্যুরিস্ট স্পট'। ভেড়াঘাটে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখা যাবে বাঁ-দিকে জগৎবিখ্যাত সেই 'মার্বেল রক'—খাড়া সাদা মার্বেল পাথরের পাহাড় দু-পাশে, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নর্মদা। বোটে করে শ্বেত পাথরের পাহাড় দেখতে পর্যটকেরা এখানেই ভিড় করেন সম্বৎসর। এখানে প্রাকৃতিক গঠন-বৈশিষ্ট্যের ফলেই বাঁ-দিকে নদী বেশ গভীর, কোথাও কোথাও প্রায় তিন-চার'শ ফুট জলও থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাঁ-দিকে নর্মদা অপেক্ষাকৃত শান্ত ও মন্দ-স্রোতা। ডানদিকে নদীর গভীরতা বেশ কম। এত কম যে তলাকার পাথর বেশ উঁচু হয়ে একটা বাঁধের মতো হয়েছে। কোথাও কোথাও পাথর জলের উপরেও চোখে পড়বে। সুতরাং এই জায়গায় নদীর বেগ বেশি—রীতিমতো খরস্রোতা। জনশ্রুতি আছে এখানে স্রোতের টানে হাতিও দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

এই ভেড়াঘাটে ২৯ অক্টোবর বিকেলে শ্রীভবানী মণ্ডল দুর্গোৎসব কমিটির প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। বাঁ-দিকে জল বেশি তাই প্রতিমা প্রথমে ডুবেও গেছিল। কিন্তু স্রোতের টানে প্রতিমা ধীরে ধীরে আরও ডান দিকে চলে আসে। এক সময় প্রতিমার পাটাতন আটকে যায় পাথরের খাঁজে আর জলের জোরালো ধাক্কায় সোজা দাঁড়িয়ে যায় পুরো প্রতিমা। বাস্তবিক অ-সাধারণ অথবা অভিনব হলেও এটাকে স্বাভাবিক এক ঘটনাই বলতে হয়। কিন্তু এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে যে ধর্মীয় উন্মাদনা কয়েকদিন ধরে চলেছিল জবলপুরে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান প্রতিবেদনের তাৎপর্য কেন্দ্রীভূত রয়েছে সেখানটাতেই।

দুর্গার বিসর্জন-বর্জনের খবরটা মুখে মুখে দ্রুত ছড়িয়ে গিয়েছিল শহরে। লোকের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। আরম্ভ হলো জল্পনা-কল্পনা-ব্যাখ্যা

আর পুজো দেবার পালা। কেউ বললেন, 'দেবীর মহিমা'; কেউবা বললেন, 'পুজোতে গাফিলতি'। কেউ আবার 'নেশা করে বিসর্জন দেওয়া উচিত হয় নি' বলেও মন্তব্য করলেন। অনেকে আবার ব্যাপারটাকে তেমন আমলও দিলেন না। কিন্তু একটা কিছু ঘটেছে তো! এদিকে পূর্ণিমার আলোয় সেই বিরল ঘটনাটি দেখাও তো লোভনীয় ব্যাপার। রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হবে এই আশায় আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে হাজির হতে লাগলো সবাই ভেড়াঘাটে। পরের দিন ৩০ অক্টোবর ভিড় আরো বাড়লো। অন্য রুট থেকে বাস সরিয়ে শুধু ভেড়াঘাট পর্যন্ত চলতে থাকলো সাট্‌ল সার্ভিস। নিত্য যাত্রীদের দুর্ভোগের একশেষ! রাতারাতি গজিয়ে উঠলো কত দোকানপাট। হঠাৎ বিনা নোটিশে বিরাট মেলা যেন—সারারাত ধরে চলতে থাকলো। পরের দিন স্থানীয় খবরের কাগজে বেরোলো দুর্গারহস্যের সচিত্র বিবরণ। ব্যাস, আর যায় কোথায়! লক্ষ লক্ষ লোক এসে পাগলের মতো ভিড় করতে লাগলো। পুলিশ ভিড় সামলাতে হিমসিম খেয়ে যায়। স্থানীয় বিখ্যাত মেলাতেও এত ভিড় হয় না—জানালেন বেওহারবাগের বাসিন্দা তেওয়ারীজী। মওকা বুঝে অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের মুনাফা লুটে চলল অবাধে। এক স্টুডিও, শুনলাম, এই ক-দিনে প্রায় ৪/৫ লক্ষ টাকার ছবি বিক্রি করেছে। একটা ছবি ৫/১০ টাকা করে। সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে এই ছবি—এমনকি ডিমের দোকানেও।

মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটলো অচিরেই। অতি উৎসাহে গাঞ্জীপুরার অজয় বর্মন ও রামকিষাণ সাহু সাঁতরে প্রতিমার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে তীব্র স্রোতে হারিয়ে গেল চিরতরে। দু-টি তরতাজা যুবক মারা যাওয়ায় এবার আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে চিন্তিত হয়ে পড়লো পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে, কিছুটা দেরিতে হলেও, তারা সুস্থ এবং যুক্তিসঙ্গত চেতনার পরিচয় দিলেন। দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিমাকে ডুবিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

২ নভেম্বর বিকেল থেকে প্রচুর পুলিশ সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিল। উটকো দোকানপাট এবং নৌকাবিহার—সব বন্ধ হলো। সাংঘাতিক ভিড়। উৎকণ্ঠিত জনতা ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। নিরুপায় হয়ে লাঠি চার্জ করে লোক সরানো হলো। এরপর পুলিশ পাহারায় ডুবুরী নামলো জলে। প্রতিমার বেদী বা পাটতনটা কিভাবে এবড়ো খেবড়ো পাথরের ফাঁকে আটকে আছে সেটা দেখা হলো খুঁটিয়ে। প্রথমে দড়ি বেঁধে টানাটানি চলল, শাবল দিয়ে চাড় দিয়েও চেষ্টা চালানো হলো। এইভাবে একদিকে মা-কে ধরাশায়ী (জলাশায়ী) করার

চেষ্টা যখন চলছে তখন পেছন দিকে পাহাড়ের ফাঁকে থেকে জনতা পাথর ছুঁড়ছে। আর সাথে সাথে শ্লোগান হচ্ছে "ধর্মকি জয় হো, অধর্মকা নাশ হো", "জয় দুর্গে, জয় নর্মদে" ইত্যাদি। দারুণ টেনশান। রীতিমতো ধর্ম বনাম 'অধর্মে'র লড়াই যেন। শেষ পর্যন্ত রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় (প্রায় ৮৭ ঘণ্টা ধ্বস্তাধস্তির পর) প্রতিমার পুনর্বিসর্জন হলো—ধর্মীয় গোঁড়ামীকে উপেক্ষা করেই।

পুলিশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বটে কিন্তু কিছু লোক তখনও ক্ষান্ত হলো না। ক্ষোভ ঠাণ্ডা হতে সময় লাগে অনেক। এ ঘটনার পরে নদীর ঐ জায়গায় বেশ ক-দিন নারকেল ইত্যাদি ছুঁড়ে পুজো দেওয়া হয়। এক সময় এও রটে যায় যে, প্রতিমা আবার ভেড়াঘাট থেকে বেশ কিছু দূরে শাহ ডোল-এ ভেসে উঠেছে। ধর্মভীরু রহস্যপ্রিয় মানুষ আবার ছুটলো দেখতে সেই শাহডোল-এ। অবশ্য তাদের অর্থ ও পরিশ্রম বেকার হয়েছে—কোনো প্রতিমা তারা দেখতে পায় নি সেখানে—নর্মদার জল নির্বিবাদে বয়ে চলেছে আপন খেয়ালে।

জবলপুরের মতো শিল্পোন্নত শহরে, যেখানে তথাকথিত শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যথেষ্ট, এই ধরনের গণ-উন্মাদনা সত্যিই অবাক করে—কষ্ট দেয়। প্রকৃত অর্থে শিক্ষার অভাব ও ঘটনা বিশ্লেষণে বিমুখতার ফলে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় উন্মাদনা এমন বিকট স্তরে পৌঁছলো যে, দুটো প্রাণবন্ত যুবকের জীবন শেষ হয়ে গেল। এই অবস্থা ভারতবর্ষের আজ সর্বত্র; তাই অন্য যে কোনো শহরে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে অবাক হবার কিছুই থাকে না।

সহায়ক দলিল: জবলপুরে দৈনিক হিন্দী পত্রিকা 'নবভারত' (৩১.১০.৮২/২.১১.৮২/৩ ১১.৮২)

চিত্ত সামন্ত

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

টপকেশ্বর মহাদেবের গুহায়

গত মাসে দেরাদুন গেছিলাম—বেড়াতে। হোটেলে ম্যানেজারের সাথে আলাপ করতে করতে জানতে চাইলাম ওখানে দেখার কি কি আছে। যথারীতি আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন উত্তরপ্রদেশ পর্যটন বিভাগের একটি ফোল্ডার, যাতে দ্রষ্টব্য স্থানের একটা লিস্টও রয়েছে। একটা কথা ভেবে বেশ হাসি পেল আমার। সাধারণভাবে পর্যটকরা যা করেন, তা হলো যে-কোন জায়গায় গিয়ে একটা লিস্ট জোগাড় করেন এবং কয়েকঘণ্টা অথবা কয়েকদিনের মধ্যে সেটা শেষ করে তৃপ্ত হন—সিলেবাস শেষ করতেই হবে এমনই যেন ভাবখানা। যাই হোক, লিস্টে চোখ বোলাতে গিয়ে একটা নাম বেশ মনে ধরে—টপকেশ্বর মহাদেব। একটু কৌতূহলী হয়ে আরও একটু খোঁজ খবর নিলাম। তাতেই জানতে পারলাম যে, এটা পাহাড়ী গুহার ভেতরে মহাদেবের একটা মন্দির। সবাই দর্শন করতে যায়। এখানে কোন এক সময়ে পাহাড় থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে ফোঁটা ফোঁটা দুধ পড়ত মহাদেবের মাথায়। ব্যাপারটা অদ্ভুত শোনালেও বেশ মজাই পেলাম। দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না।

দেরাদুন থেকে ৬/৭ কিলোমিটার পথ। মোটামুটি পাহাড়ী গুহায় মন্দির যে রকম হয় সেই রকমই চেহারা। মন্দিরের পাশ দিয়ে একটা পাহাড়ী নদী-পথ, এখন একেবারে খটখটে। মন্দিরের মধ্যে একটা শিবলিঙ্গ বসানো। দুধ তো পড়ছেই না, এমন কি জলও না। তাহলে? গুজব শুনলাম না কি? ঐ মন্দিরেই থাকেন এক সাধু। আগেই শুনেছিলাম উনি বাঙালী। গিয়ে দেখি বেশ কষ্ট করেই সকলের সাথে শুধু হিন্দীতেই কথা বলার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আলাপ করলাম। নাম বিশুদ্ধানন্দ গিরি। ঐ মন্দিরেই আছেন ১৯৩০ সাল থেকে। কয়েকজন শিষ্য নিয়ে কথা বলছিলেন। স্বামীজী নিজেই পরিচয় করালেন—বসে থাকা শিষ্যদের মধ্যে একজন কলকাতার কোন এক কলেজের অধ্যাপক, আর একজন ঐ অঞ্চলের বড় ঠিকাদার ইত্যাদি।

ঐ মন্দিরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চাইলাম। উনি গড়গড় করে বলে চললেন—এবার বাংলায়। এককালে ঐ মন্দিরের শিবের মাথায় ফোঁটা ফোঁটা

দুধ পড়ত। সেটা বন্ধ হয়ে গেছে ১৯১৪ সালে ; কেন বন্ধ হলো ?—পুজোর অনিয়মের জন্য। তারপর থেকে দুধের বদলে জলই পড়ে। মাঝে মাঝে যখন জল বন্ধ হয়ে যায়, তখন পৃথিবীতে ঘটে অমঙ্গল, বহু লোক মারা যায়। বিশ্বযুদ্ধের আগে, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত বিরোধের আগেও এরকম জল বন্ধ হয়েছিল। এ-বছর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জল বন্ধ হয়েছে। যথেষ্ট উদ্বেগের স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম যে—তাহলে এবছরও কোন বিপদ আসবে নাকি ? উনি বললেন—'এখনই বলা যাবে না। যদি অগাস্ট মাস পর্যন্তও বাবার মাথায় জল না পড়ে তখন হিসেব করে দেখতে হবে কী ধরনের বিপর্যয় হতে পারে।' হিসেবটা উনি কিভাবে করবেন জানতে চাই নি তবে, মনে মনে কিছু ব্যাখ্যা সাজিয়ে নিলাম এইভাবে—অগাস্ট মাস তো বর্ষাকাল, তখনও যদি জল না পড়ে তার মানে তো প্রবল খরা সুতরাং ক্ষয়ক্ষতি হওয়াই তো স্বাভাবিক। আসলে বোঝা গেল যে, গরমকালে জল-টল কিছুই পড়ে না, চারপাশ শুকনো খটখটে থাকে বলেই। বর্ষা-কালে পাহাড় চুঁইয়ে গুহার ভিতরে জল পড়তেই পারে।…যাই হোক, মনের কথা প্রকাশ না করে, সরাসরি দুধ প্রসঙ্গে জানতে চাইলাম—'আচ্ছা পাহাড় থেকে দুধ পড়ত বললেন এটা কী করে সম্ভব ?' আমাদের অবাক করে দিয়ে সাধুবাবা বলে উঠলেন, 'আরে বাবা ও সব বাজে কথা। আমার ব্যক্তিগত ধারণা ওটা স্রেফ লাইম ওয়াটার (চুন জল), সেটাকেই লোকে দুধ বলে। আকন্দ গাছের দুধ হয় না ? এটাও তেমনি দুধ।' আমার অবশ্য এমনই একটা অনুমান ছিল। আসলে দেরাদুন অঞ্চলের পাহাড়গুলো অনেকটাই চুনা পাথরের। ঐ পাথরের ফাঁক দিয়ে জল চুঁয়ে আসলে কলিচুন আংশিক জলে গুলে ঘোলা চুনজল আসতেই পারে, যা দুধের মতোই দেখতে হবে। বেশ কিছুদিন এইভাবে দুধ পড়ার পর কলিচুনের স্তর শেষ হয়ে চুনাপাথরের স্তর বেরিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। তাই এখন দুধ বন্ধ, শুধু জল পড়ে। অনিয়মের কৈফিয়ৎটা ধর্মান্ধ মানুষের সহজ ব্যাখ্যা। এরকম গুহা আশেপাশে আরও থাকতে পারে যেখানে হয়ত এখনও দুধ পড়ে—শুধু আবিষ্কারের অপেক্ষা।

মনে একটু সাহস পেয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা দাদু, আপনি সকলের কাছে দুধের এই ব্যাপারটা এইভাবে প্রচার করেন না কেন ? এখানে সকলেই তো একটা ভুল ধারণা নিয়েই রয়েছে। এটা তো কাটানো দরকার !' সাধুবাবা হঠাৎ একটু গম্ভীর হলেন। আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়েই বললেন—'আমার শিষ্যরা বসে আছে, আমি যাই।' এই বলেই তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে এলাম মন্দিরের বাইরে। সাধুবাবা স্থানীয় লোকদের কাছে দেবতুল্য ; এই গুহা, শিবলিঙ্গ আর দুধ মাহাত্ম্য তার জীবন জীবিকার সবটাই প্রায় জুড়ে রয়েছে, তবু তিনি দুধপড়ার বাস্তব কারণের কথাটা আমায় বললেন। সাধুবাবা-গোছের লোকেদের কাছে এরকম আশাই করা যায় না। সততায় মুগ্ধ হতেই হয়। এই সাধুবাবা ১৯৩০ সাল থেকে হয়ত আরও অনেকের কাছেই এই সত্যি কথাটা বলেছেন (আমাকেই প্রথম বললেন এমন ভাবার কোন কারণ নেই) তা সত্ত্বেও দলে দলে মানুষ এসেছে ; দুধ-মাহাত্ম্যের কথায় মন আচ্ছন্ন করেছে, নিজের যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার ক্ষমতাকে ধর্ম-চিন্তায় ঢেকে রেখেছে স্বেচ্ছায়।

এই হলাম আমরা—ব্যাপক সাধারণ মানুষ। এই অনড়-অচল-অনাবাদী মানবজমিনে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের কাজটা কত দুরূহ, কত ব্যাপক এবং কত জরুরী সেটাই ঘুরে ফিরে মনে আসছিল।

চিত্ত সামন্ত

জুলাই ১৯৮৩

হনুমানজী, মাকড়শা ও ধর্মান্ধ মানুষ

বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে ভাবতে হয় তবু ছবিটা ভাসে চোখের সামনে—যেন আজকেরই ঘটনা—এমনই গভীরভাবে দাগ কেটেছিলো মনে। বছর পাঁচেক আগেকার কথা বলছি।

মধ্য-কলকাতার মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের ওপর যে বিশাল রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ি রয়েছে, সংগ্রহশালা হয়েছে এখন—অনেকেই দেখতে যান, তারই পাশের একটি ছোট্ট জায়গা আমাদের অকুস্থল। এলাকাটা ভয়ানক ঘিঞ্জি। সরু সরু অপরিচ্ছন্ন গলি গোলকধাঁধার মতো ছড়ানো-ছিটানো। প্রধানত মাড়োয়ারি আর সিন্ধি মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী এবং কিছু চাকুরিজীবী পুরনো বাঙালী বাসিন্দার ঘনবসতি। একেবারে মামুলি বর্ণগন্ধহীন এলাকা বলা যায়। যেখানে প্রাত্যহিক খুচরো ঝঞ্ঝাট ছাড়া কোন কিছুই প্রায় ঘটে না, সেখানেই হঠাৎ এক উজ্জ্বল সকালে

একটি অতি-সরু গলির মধ্যে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে গেল। পিল পিল করে লোক দৌড়চ্ছে গলিটার ভেতর, বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে।

গলির মুখে উঁকি দিয়ে দেখি এক সাংঘাতিক ব্যাপার। ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি, চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করা ভিড়। তিন মানুষ যায় না এমন শীর্ণ গলিটার জীর্ণ দেওয়ালের এক জায়গায় আঁতিপাতি করে কী যেন দেখছে সবাই, দারুণ উত্তেজনা হৈ-হল্লা। ধাক্কার চোটে ছিটকে যায় একজন, ঝাঁপিয়ে আসে পাশের জন—আরেক দর্শনার্থীর আকুল চেষ্টা।

কিন্তু কী দেখছে সব? কী রয়েছে দেয়ালে?—ভগবান এসেছেন, ভগবান। স্বয়ং হনুমানজী !! এই পাঁক-পঙ্কিল সংসারে তিনি এসেছেন পাপিষ্ঠদের পুণ্যদান করতে।...

তা না হয় হলো। কিন্তু কোথায় হনুমানজী? চেহারাটা তো দেখতে পাবো। সেই বীরপুঙ্গব পবননন্দকে তো অনেকরূপেই আমরা চিনি—গদাহস্তে রুদ্ররূপ, করজোড়ে গদগদ, বগলে ধৃত সূর্যপিণ্ড, হাতের চেটোতে গন্ধমাদন, এরকম বিস্তর ছবি দেখেছি। এখানে কোথাও তো সেরকম কিছু দেখছি না?—দেখবেন কী করে। তাঁর দর্শন পাওয়া কী অতই সহজ? হনুমানজী এবার সম্পূর্ণ এক নতুন রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। এসেছেন ছোট্ট এক মাকড়সার চেহারায়। এসে সমাধিস্থ হয়ে বসেছেন ওই দেয়ালের ওপর। ভক্তদের ফাঁকি দিয়েই ছিলেন এতকাল। পাড়ার বজরঙ্গবলী মন্দিরের পুরোহিত নাকি স্বপ্নাদেশে ভোর রাত্রে এখানে এসে তাঁর দর্শন পেয়েছেন। তারপর থেকেই পুণ্যার্থী দর্শকের ভিড়।...

ব্যাপার তাহলে এই! গলির মধ্যে গুঁতোগুতি করে কায়দা-কৌশলে কাছে গিয়ে দেখলাম সেই বিস্ময়কর দৃশ্যটা। ধূপ-ধুনো-সেন্ট-আতর-কাঁসর-বাদ্য-জগঝম্পে শ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। দেয়ালের নিচে ফুল-মালার স্তূপ। সেই ফুলপাহাড়ের ঠিক ওপরে ছোট্ট একটা মাকড়সা নিথর হয়ে আটকে আছে দেয়ালের গায়ে। দেহটা লম্বায় আধ ইঞ্চির মতো হবে। আট পা-ওয়ালা এই পরিচিত পোকাটির চেহারার বৈশিষ্ট্য (বা দেহরূপ) সহজেই চোখে পড়ে। শরীর জুড়ে ছোট ছোট লোম রয়েছে, আর সেই লোমশ দেহের ওপর-খণ্ডে, অর্থাৎ তার পিঠে, তিনটে কালো ফুটকি আর দাগ অবিকল চোখমুখের আদল এনে দিয়েছে। মন যদি এককথায় বিশ্বাস করবার জন্য মুখিয়ে বসে থাকে, তাহলে ওই ক্ষুদে লোমশ মাকড়শাকে 'অবতার হনুমান' বলে চালাতে বিন্দুমাত্র বেগ পাওয়ার কথা নয়।

ধুরন্ধর উদ্যোক্তাগণ পূর্ণ সফল। মুহুর্মুহু 'হনুমানজী কি জয়' ধ্বনি উঠছে আর থোকা থোকা টাকা-পয়সা পড়ছে এক মস্ত কাঠের থালায়। আমার সামনেই এক থালা ভর্তি হয়ে আরেকটা এলো।

ধীরে ধীরে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছিলাম। কেমন অসহায় বোধ হচ্ছিল। কিছুই বলতে পারি নি। আপন বিশ্বাসে অন্ধ উন্মত্ত মানুষদের বলা যায় নি যে, এর মধ্যে অদ্ভুত অলৌকিক রহস্যময় কিছু নেই; প্রকৃতির রাজ্যে যে অজস্র কীট-পতঙ্গ ঘুরে বেড়ায়, ওই মাকড়সা তাদেরই একটি। রূপ-বৈশিষ্ট্যে বিরল, এই যা। প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণে আমাদের অধিকাংশেরই অভ্যেস নেই তাই চারপাশের প্রাণীজগৎ, প্রকৃতির বিপুল বৈচিত্রের জগৎ আমাদের কাছে অপরিচয়ের ব্যাপকতা নিয়েই বিরাজ করে—ফলে অবাক হওয়া, বিস্মিত হওয়ার মতো ঘটনা যখন-তখনই ঘটে যেতে পারে।

মাকড়সার বহু প্রজাতি ও উপ-প্রজাতি রয়েছে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটা ঘটনা যে, পৃথিবীর বুকে প্রায় ২৫ হাজার রকমের মাকড়সা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিস্ময়ে ভরা প্রকৃতির মতোই বিচিত্র এদের রঙ-রূপ-দেহগঠন; এদের অধিকাংশই লোকালয়ের বাইরে বাস করে। আমাদের ঘরদোর ভাঁড়ার বাথরুম আস্তা-কুঁড়ে সাদামাটা চেহারার মাকড়সাদের দেখেই আমাদের চোখ অভ্যস্ত। ঝোপ-ঝাড় বন-বাদাড়ের মাকড়সা দেখে চমক লাগতেই পারে, কেননা এদের চেহারা ঘরোয়া মাকড়সাদের থেকে প্রায়শই আলাদা হয়। মধ্য-কলকাতার মল্লিকবাড়ির উদ্যানের উল্টোদিকের সেই গলির মধ্যে যে মাকড়সাটি ঘটনাচক্রে 'হনুমানজী' হয়ে গেছিল তার মতো চোখ-মুখের দাগওয়ালা লোমশ মাকড়সার হদিশ পতঙ্গ বিজ্ঞানীরা বিস্তর পেয়েছেন—এখানে গোটাকয়েক উপ-প্রজাতির উল্লেখ করছি যাদের এই ভারতেই দেখা মিলবে :

১. বৈজ্ঞানিক নাম : উরোক্টিয়া ইন্ডিকা (Uroctia Indica)। লোমশ শরীর, কালচে রঙ, লম্বায় আধ ইঞ্চি। দেহের ওপর-খণ্ডে (carapace) অবিকল মানুষের মুখ আঁকা আর নিচের-খণ্ডে (abdomen) গোটা সাতেক ফুটকি। রুক্ষ জমিতে, পাথরের ফাঁকে থাকা পছন্দ করে। পশ্চিম ভারতে, বিশেষত পুনায় বেশি দেখা যায়। অন্যত্রও চোখে পড়ে।

২. স্টেগোডাইপ্লাস সারাসিনোরাম (Stegodyplus Sarasinorum)। লোমশ দেহে অনেক আঁকিবুঁকি রয়েছে। ০·৪ ইঞ্চি লম্বা। ঝোপেঝাড়ে থাকে। মূল আবাসস্থল—বিলাসপুর, ত্রিবাঙ্কুর, বাঙ্গালোর, গুজরাট।

৩. সেসন সিনক্টিপেস (Sason Cinctipes) : লোমশ শরীর লম্বায় ০·৬

এই গল্পটা আমার মনে গভীর রেখাপাত করে নি—কারণ ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে বলে ভেবেছি।

এর ভেতরে মূল ঘটনা তিনটি—অনেক দূর থেকে পাখির উড়ে আসা, বিশেষ সময়ে আসা এবং শুধু বিশেষ দু-টি পাখির আসা—কোনটাই রহস্যজনক নয়।

সকলেই জানেন, এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে যাযাবর পাখিরা উড়ে যায়। বহু পশুপাখি বিশেষ ঋতুতে এবং দিনের কোন বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট কিছু জৈবিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। অন্ধকার গুহা বা কোটর থেকে কোন কোন পাখি, যেমন—পেঁচা বা কোন কোন ধরনের বাদুড়, চামচিকা অতি সুনির্দিষ্ট সময়ে বের হয়ে আসে, প্রায় যেন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে। নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্যসংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ স্থানে চলে আসতে পারে অনেক প্রাণী। রোজ সকালে রুটির টুকরো নেওয়ার জন্য উঠোনে কাক আসে নিখুঁত শৃঙ্খলায় —এই 'কাকতীর্থ' তো অনেকের বাড়িতেই রয়েছে! একটা 'নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান' অনেক প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে। এ-বিষয়ে জৈব ঘড়ি বা Biological clock নামে বিজ্ঞানের একটি শাখার সৃষ্টি হয়েছে।
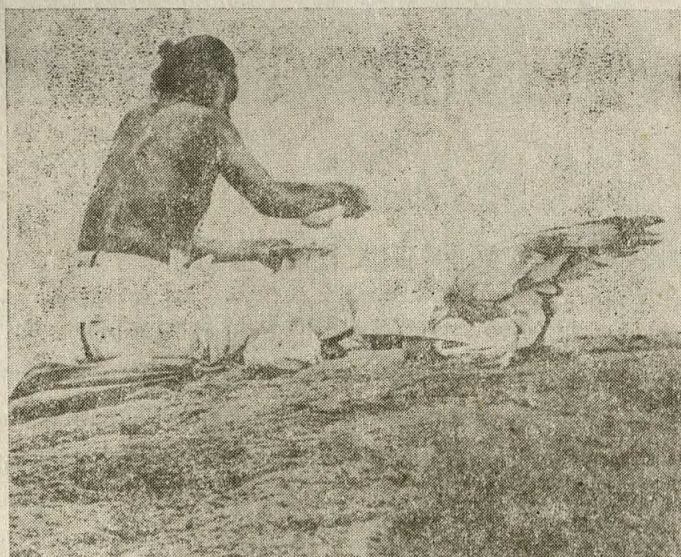
পক্ষীতীর্থমের ব্যাপারটা প্রথমবার শোনার বেশ কিছুদিন পরে, একজন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের কাহিনী পড়লাম। সেই সাহিত্যিকের

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ছিল। তিনি বন্ধুদের এবং আরও লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আরও ঐ ধরনের পাখি আশেপাশে দেখা যায় কি-না। অর্থাৎ পাখি দুটো যে বেনারস থেকেই (বা বহুদূর থেকে) আসছে এবং দু-টি মাত্রই পাখি আসে—তার কোন প্রমাণ আছে কি-না। এই সাহিত্যিক ভদ্রলোক পক্ষীতত্ত্ববিদ ছিলেন না, কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু থাকায় ট্রেনে ফেরবার সময় আরও ঐ ধরনের পাখি দেখতে পেয়েছিলেন।

এর পরের প্রশ্নটা হলো, ওই তথাকথিত 'দৈব-বৈশিষ্ট্যে'র পাখিদুটো প্রকৃতপক্ষে কোন্ জাতের পাখি? সেটা কি কেউ জানতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত?

আরও কয়েকবছর বাদে তামিলনাড়ু গভর্নমেণ্টের একটি রঙীন লিফলেট-এ (প্রচার-পত্র) এই পাখিটির ফটো দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম এই হচ্ছে **Neophron Vulture** (শ্বেত-শকুন বলা যায়)।

এটি আদৌ কোন বিরল পক্ষী নয়। আফ্রিকা এবং ভারতের অনেক অঞ্চলে এই ধরনের শ্বেত-শকুন দেখতে পাওয়া যায়। এদেশের লোক সাধারণত প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে ও প্রকৃতির ইতিহাসে আগ্রহী নয় এবং গুরুত্ব দিয়ে পক্ষী-পর্যবেক্ষণ (**bird watching**) করে না বলেই পাখিটির জাত নির্ণয় করতে পারেন নি, অনেকেই শুধুমাত্র 'বিশেষ পাখি' বলে ছেড়ে দেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পাখি দুটো বেনারস থেকেই আসছে না অন্য কোন সুদূর অঞ্চল থেকে—এর কিন্তু কোন প্রমাণ নেই। (যদি ওসব জায়গা থেকে আসত, তবে সেটাকেও অবশ্য অলৌকিক কিছু মনে করতাম না।)

এর পরে একজন ভারতীয় পক্ষী পর্যবেক্ষক-এর লেখা পড়লাম। তিনি পক্ষীতীর্থমে গিয়ে ঐ পাখিদুটোকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—পক্ষীতীর্থম মন্দিরের প্রসাদ খাবার পর পাখিদুটো একটু দূরে ছোট পাহাড়ে তাদের বাসায় চলে যায়। আবার সেখান থেকে পরের দিন চলে আসে।

তবে পক্ষীতীর্থমে কেন সাধারণত এক জোড়ার বেশি পাখি দেখা যায় না? এর কারণও তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন এবং আমার কাছেও তার দেওয়া ব্যাখ্যাটা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। ঐ একজোড়া পাখি তাদের নিজস্ব এলাকা (**territory**) তৈরি করে নিয়েছে। আবার অন্য এলাকাগুলো অধিকার করেছে অন্য পাখিরা। প্রকৃতির বুকে বহু পশুপাখি তাদের নিজের এলাকা বা **territory** ঠিক করে নেয়। সাধারণত একে অপরের এলাকায় প্রবেশ করে না। করলেও সঙ্গোপনে করে এবং প্রকৃত দখলদারের সাড়া পেলেই চট্ করে নিজের এলাকায়

চলে যায়। পাড়ায় কুকুরদের এই এলাকাভিত্তিক দখলদারি এবং মারামারি তো আমরা সকলেই দেখে থাকি।

অগণিত ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের যদি প্রকৃতিবিজ্ঞানে পড়াশুনা বা পর্যবেক্ষণের অভ্যেস থাকত তাহলে পক্ষীতীর্থমের এই ঘটনা এত গুরুত্ব পেত না। লক্ষ্য করুন, দর্শনার্থীদের প্রায় সকলেই বলেছেন—বিশেষ দু-টি পাখি; যেহেতু কাক, চিল, চড়ুই ছাড়া অন্য কোন পাখি তারা বড় একটা মন দিয়ে দেখেন নি বা দেখার সুযোগ হয়-নি, তাই তারা প্রায় কেউ-ই ওই পাখি দুটোকে ঠিক ঠিক চিনতে পারেন নি। প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপকে চিনতে না পারার অক্ষমতাই এক্ষেত্রে ধর্মীয় রহস্যের জন্ম দিতে সাহায্য করেছে।

বেনারস থেকে দক্ষিণ ভারতের ওই পক্ষীতীর্থমে পাখি উড়ে আসলেও সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাই হতো না। পক্ষী-গবেষকরা সন্ধান করেন কোন্ শক্তির সাহায্যে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে পাখিরা নির্ভুলভাবে পথ চিনে আসে। এর কিছু উত্তর এর মধ্যেই পাওয়া গেছে। যেমন—সূর্য দেখে, রাতে নক্ষত্র-মণ্ডলীর অবস্থান দেখে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র নিরূপণ করে ইত্যাদি। যত বেশি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা বাড়বে ততো আমরা সঠিক উত্তরের কাছাকাছি যাবো। আমরা ভুলেই যাই যে, বিজ্ঞান যে রহস্যলোকের সন্ধান করে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে সেটা প্রায়শই ধর্মীয় সংস্কারের উপর গড়ে ওঠা রহস্য-জগতের থেকে অনেক বড়।

পক্ষীতীর্থের ছবি: বিমলেন্দু সান্যাল-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত

রতনলাল ব্রহ্মচারী

জানুয়ারি ১৯৮৩

স ং যো জ ন

১৯৬৫ সালে একবার পণ্ডিচেরি গিয়েছিলাম কয়েকজনের সঙ্গে। পথে মাদ্রাজে নেমে প্রায় ৫৫ কি মি দূরে গিয়েছিলাম থিরুকালিকণ্ডুম বলে একটা জায়গায় পাহাড়ের উপরে মন্দিরে। একেই পক্ষিতীর্থ বলে। প্রতিদিন নাকি বেলা এগারটা থেকে

বারটার মধ্যে দুটি পাখি কাশী থেকে প্রসাদ খেতে আসে এবং খেয়ে ফিরে চলে যায় সেই কাশীতে।

দেখলাম পাহাড়ের উপর এক নির্দিষ্ট স্থানে মন্দিরের কোন পুরোহিত থালায় করে এনেছেন কয়েকটা সাদা গোল ডেলা। অনেক কাকুতি-মিনতির পর একটা হাতে নিয়ে দেখলাম ভাত, ময়দা, ঘি আর চিনি দিয়ে তৈরি প্রতিটি ছোট ডেলা। শুনলাম, যে-পাখি দুটি আসবে তারা নাকি অমর। বহু যুগ ধরেই এরা আসছে। নানা কিংবদন্তি আর গল্পগাথা শুনছি আর ভাবছি, অমরত্ব লাভ করা কোন জাতের পাখি যে, এই অদ্ভুত ভোজ্যবস্তু খেতে আসবে! বেলা সওয়া এগারটার সময় দেখা গেল উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে ঈগলের চেয়ে ছোট প্রায় চিলের মতোই দুটি পাখি উড়ে আসছে। হু হু করে এসে তারা নামল থালা থেকে হাত পাঁচেক দূরে। ও হরি! এ যে আমার অত্যন্ত চেনা পাখি। গিরিডিতে হাটের পাশে ডাঁইকরা জঞ্জালের উপরে, পাশে কত দেখেছি। এ ত গিন্নি শকুন, গৃধিনী শ্বেত-শকুন (নিওফ্রন পেবক্নোপটেরাস), ইংরেজিতে স্ক্যাভেঞ্জার ভালচার।

আশ্চর্য হলাম ঐ অদ্ভুত খাদ্য তাদের বেমালুম খেতে দেখে। ওটা ওদের খাদ্যই নয়। মূলত ওদের খাদ্য পচাগলা মাংস, নাড়ি-ভুঁড়ি, আবর্জনা, অত্যধিক পরিমাণে মল, মাঝে মাঝে ঘেসোজমির ঝিঁ ঝিঁ পোকা ও উড়ন্ত পিঁপড়ে। সত্যিই কি এরা প্রতিদিন কাশী থেকে উড়ে আসে? প্রায় ১৩০০ কি মি পথ যে? আবার ফিরেও যায় অতদূর! অথচ মাদ্রাজের অতি সাধারণ পাখি। কিন্তু কেন শুধু দুটি পাখিই রোজ আসে? খাদ্যান্বেষণে আরও তো সংখ্যায় আসতে পারত। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। এই উৎসর্গীকৃত ভোগ খেতে নিদেনপক্ষে তিনটিও তো আসতে পারত। গিন্নি-শকুনরা তো অমর নয়। তবে কি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এদের বদল করা হচ্ছে এবং সেটা কোন্ উপায়ে? খাদ্যে কি আফিম মেশানো থাকে? ওদের দেখে এইসবই মনে হয়েছিল। আজও কোন বৈজ্ঞানিক

ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নি। পরে জেনেছিলাম, বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতরা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরা করতে দেন নি।...

অজয় হোম

আজকাল, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮২

বিষ্ণুমূর্তির ভাসান রহস্য

মূর্তিটা বুঢ়ানীলকণ্ঠের (Budanilkantha)। নীলকণ্ঠ নামে আমরা শিব বা মহাদেবকে চিনি, কিন্তু এ হলো বিষ্ণুবিগ্রহ। ভগবান বিষ্ণু পরম প্রশান্তিতে নিদ্রিত—সর্পশয্যায়। এই দেবমূর্তির অধিষ্ঠান নেপালে, কলকাতা থেকে প্রায় ১২০০ কিলোমিটার দূরে কাঠমাণ্ডুতে—এভারেস্টের মতো অভ্রভেদী তুষারশুভ্র পাহাড়ে ঘেরা মালভূমি কাঠমাণ্ডু; বৌদ্ধ মন্দির আর হিন্দু দেবালয়ের সুষম সমন্বয়ের দেশ নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু; কিরান্তী ঠাকুরী মল্ল রানা আর
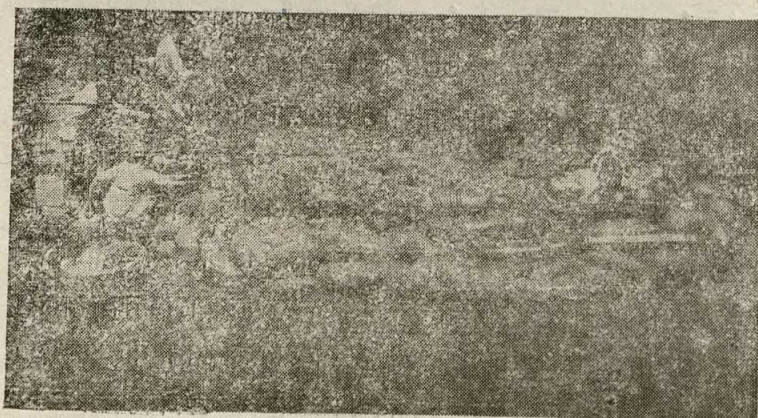
শা রাজত্বের ঐতিহ্যবাহী শহর কাঠমাণ্ডু; বিদেশী ট্যুরিস্ট, টয়োটা আর ক্যাসিনোর শহর কাঠমাণ্ডু। শহর-কেন্দ্র থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তরে বুঢ়ানীলকণ্ঠের মন্দির—সর্পশয়ানে নিদ্রিত বিষ্ণুর চমৎকার মূর্তিটি সেখানে নিত্য পূজা পাচ্ছে দূর-দূরান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীদের কাছে।

এই বিগ্রহের চমৎকারিত্ব কেবল তার প্রস্তর-ভাস্কর্যের নৈপুণ্যের মধ্যেই নিহিত নেই [১১শ শতাব্দীর শিল্পকলার অনবদ্য নিদর্শন এটি—যখন নেপালে আর্য ঠাকুরী রাজত্ব ছিল। অনুমান, সারা বিশ্বে এত বৃহৎ শায়িত বিষ্ণুমূর্তি আর নেই], রয়েছে বহুল প্রচারিত কিংবদন্তী, বিচিত্র বিশ্বাস। বলা হয়, বুঢ়ানীলকণ্ঠের এই মূর্তিটি চির-ভাসমান—নিদ্রিত বিষ্ণুদেব সর্বক্ষণ জলের ওপরেই ভেসে থাকেন, কখনো ডুবে যান না, ঝড়-তুফান-বন্যাতেও নয়।

তাজ্জব ব্যাপার! পাথরের এক বড়সড় মূর্তি কখনো জলে ডুববে না তা কি হয়? দেবতার মাহাত্ম্য অশেষ, সেখানে কী হয় আর কী হয় না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না অধিকাংশ মানুষ। তাই কলকাতাতে বসেও সুদূর কাঠমাণ্ডুর ভাসমান বিষ্ণুর কাহিনী শুনেছি আমরা। সে লোকবিশ্বাসের কথা লেখা আছে ট্যুরিস্ট বিভাগের গাইড বইতেও।

এ সব দেখেশুনে মনে হয় বিষ্ণুমূর্তির জলে না-ডোবার কাহিনী যদি সত্যিই হয় তাহলে নিশ্চয়ই কিছু একটা গূঢ় ব্যাপার আছে। কিন্তু কী সেটা? সেই 'কিছু'র সন্ধানে ছোটবার সুযোগ এলো '৮১-র নভেম্বরে—হাজির হলাম আমরা বুঢ়ানীলকণ্ঠের মন্দিরে।

উঁচু একটা জায়গায় মন্দির। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার মুখে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা নোটিশ বোর্ড চোখে পড়ে—'কেবলমাত্র হিন্দুদের প্রবেশাধিকার রয়েছে'। (হিন্দী আর ইংরাজীতে লেখা। এরকম ধর্মীয় ফরমান কাঠমাণ্ডুর আরো সব হিন্দু মন্দিরেও দেখেছি।) আমাদের প্রবেশের অধিকার নিয়ে কেউ আপত্তি করল না।

বুক সমান উঁচু পাঁচিল ঘেরা বড়সড় একটা চৌবাচ্চা, প্রায় ৫০ ফুট × ৪০ ফুট মাপের হবে। ভাঙাচোরা, প্রাচীন, অপরিচ্ছন্ন জলাশয়টির মাঝখানে বুঢ়ানীল-কণ্ঠের ভারী সুন্দর ঘুমন্ত মূর্তি—তেল-সিঁদুর-ফুল-পাতায় বিচিত্র রঙিন বর্ণ ধারণ করেছে; ১৫/২০ ফুট লম্বা রীতিমতো বৃহৎ সে-পাথুরে মূর্তি পূব-পশ্চিমে শোয়ানো। ক্রমাগত জমা হওয়া পূজা-উপচারে চৌবাচ্চার জল নোংরা হয়েছে, তবু তলদেশ দেখা যায়। মোটেই গভীর নয়, হাত দুয়েক হবে মনে হলো, তলা থেকে গাঁথা পাথরের বেদীর ওপরেই বিষ্ণুমূর্তি দিব্যি শুয়ে আছে। এরকম একটা

পাথরের পাকাপোক্ত বস্তু কখনোই জলের নিচে ডুববে না, বন্যা-বাদলেও নয়, তা কি হয়? আমাদের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো, অনুসন্ধানী মনকে যতটা সম্ভব তৎপর করা হলো, আর ক্যামেরায় চোখ রাখা হলো সুযোগের অপেক্ষায় (বলা দরকার, জলাশয়ের ভেতরে নেমে বিগ্রহের কাছাকাছি গিয়ে ছবি তুলতে বারবার বাধা পাচ্ছিলাম আমরা)।

মন্দির চত্বরের এধার-ওধার ঘুরতে ঘুরতে জানা যাচ্ছিল অনেক কিছু। বহু প্রাচীন এই চোখ জুড়ানো মূর্তিটি ঠিক কবে কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছিল তা নির্ভুলভাবে জানা নেই, কে এর নির্মাতা বা ভাস্কর তা-ও জানা নেই—এত কিছু অজ্ঞতার সুযোগেই বোধহয় জন্ম নিয়েছে বিচিত্র গালগল্প আর কিংবদন্তী। প্রচার আছে—ছ-সাতশ-বছর আগে শিবাপুরি পর্বতমালার নিচের এক গ্রামে ক্ষেতের কাজ করছিল এক কৃষক; হঠাৎ কোদালের ঘায়ে মাটি থেকে বেরোতে লাগলো রক্ত, গলগল করে। বিস্মিত বিহ্বল সেই কৃষক ছোটাছুটি করে খবর দিল গ্রামের দশজনকে, উদ্ধার করা হলো শায়িত বিষ্ণুকে। সেই কোদালের ঘা-এর দাগ নাকি এখনো রয়েছে মূর্তির গায়ে (আমরা অবশ্য দেখি নি)।…আরো আছে। নেপালের কোন রাজা এই বুঢ়ানীলকণ্ঠ দেবদর্শনে আসতে পারেন না, এলেই সর্পদংশনে তার মৃত্যু অনিবার্য। কেন এমন-হবে? ব্যাখ্যা হলো—দেবাদিদেব বিষ্ণু হলেন তাবৎ বিশ্বের মানবকুলের নিয়ন্ত্রক হর্তাকর্তা। তারই প্রতিভূ কিংবা ইহ-রূপ হলেন রাজা—পুরোহিততন্ত্র এভাবেই দেশের মানুষের মনোজগতে রাজার প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সেই রাজা যদি নিজেই নিজের চিরশয়ান নিদ্রিত মূর্তি দর্শন করেন, তবে তার চেয়ে অভিশপ্ত ঘটনা আর কী হতে পারে? তাই দেবতা নিজেই সক্রিয় হয়ে সর্পরূপে রাজার আগমন নিবৃত্ত করে চলেছেন। কার্যত আধুনিক নেপাল সরকার বুঢ়ানীলকণ্ঠের অবিকল এক নকল মূর্তি স্থাপন করেছে কাঠমাণ্ডু থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে বালাজুতে। নেপালের কোন রাজা দেবদর্শন করতে চাইলে ওই বালাজুতে গিয়ে পুজো দেন (নকল দেবতাতে বিপদের ভয় নেই বলে)।

যাই হোক, মূল মন্দির চত্বরে এইসব গল্প শুনছিলাম আর একইসঙ্গে কৌতূহলের মিটার বেড়ে চলছিল চড়চড় করে। মূর্তি না-ডোববার আসল রহস্যটা কোথায়? অগণিত মানুষ সম্বৎসর বিষ্ণুকে জলের ওপরেই দেখছে আর পরিতৃপ্ত মুগ্ধ মনে ভাসন্ত দেবতার মহিমা প্রচার করে চলেছে। ধর্মবিশ্বাসে অন্ধ না হলে সাধারণ বুদ্ধিতে (common sense) বোঝা-ই যায় যে, শায়িত মূর্তিকে চির-ভাসমান দেখার অর্থ ওখানে জল বেড়ে কখনো মূর্তিকে ডুবিয়ে দেয় না। তাহলে নিশ্চয়ই

চৌবাচ্চাতে জল এসে জমলে সে জল বেরিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকবে! কিন্তু কোথাও তো কিছু নেই। উঁচু প্রাচীর ঘেরা বদ্ধ জলাশয় অচঞ্চল মৌনতায় স্তব্ধ হয়ে আছে। তাহলে? শেষ অবধি কি বৈজ্ঞানিক যুক্তিকেই হার মানতে হবে?

এরকম দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় হঠাৎ-ই 'মুশকিল-আসান' হয়ে এলো মন্দিরেরই এক বৃদ্ধ নেপালী—পূজারীদের একজন বলা চলে তাকে। হাতে একটা ফুল-চন্দনের থালা নিয়ে সকলের কপালে শিবলিঙ্গের গৈরিক সিঁদুর চিহ্ন এঁকে দিয়ে যাচ্ছে দু-চার পয়সা দক্ষিণার প্রত্যাশায়। ভগ্ন, ক্লিষ্ট, নিরন্ন চেহারা। চোখ ঘোলাটে। কাছে আসতেই টের পেলাম বেশ কড়া মদের গন্ধ বেরোচ্ছে তার মুখ দিয়ে। অপার মহিমাময় বুঢ়ানীলকণ্ঠদেব অন্তত এই বৃদ্ধকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে পারেন নি। এবং ধর্মস্থানে এই 'অ-স্বাভাবিক' লোকটিই আমাদের সত্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করল।

গোল-চিহ্নিত জায়গায় রয়েছে গর্তটি। ইনসেটে বড় করে দেখানো হয়েছে।
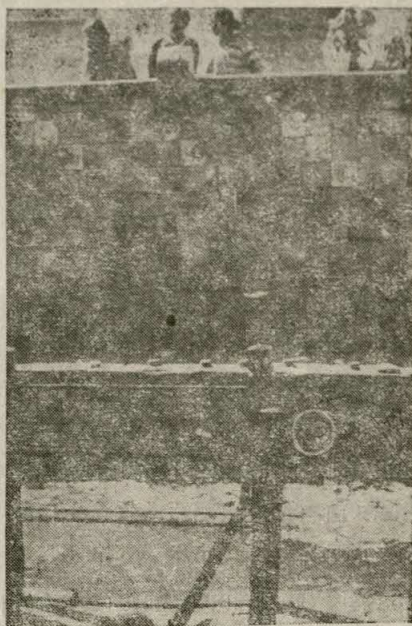
অল্পসল্প আলাপে বোধহয় মনে ধরেছিল আমাদের। নির্দ্বিধায়, কোন-রকম সঙ্কোচের বালাই না রেখে সে আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বিষ্ণুরূপী ভগবানের ভেসে থাকার রহস্য। দক্ষিণ দেয়ালের নিচে, কোণার দিকে,

জলের তলের ফুটখানেক ওপরে একটা চৌকো গর্ত ; (৪৭ পাতার ছবি) নেহাৎ-ই মামুলি, চট করে চোখে পড়ে না। অনেক কৌশলে অনেক আছিলায় গর্তটির ফটো নেওয়া গেল। দেখলাম গর্তের লেভেলটা রয়েছে একেবারে বিষ্ণুমূর্তির শয্যা বরাবর।

সহজেই অনুমান করা যায় যে, মূর্তির চারপাশে দেওয়াল তুলে চৌবাচ্চা তৈরি করবার সময় হয়তো ভেবেচিন্তেই দেওয়ালের নিচে ওই একটি গর্ত বা জল নির্গমন নালিপথ (outlet) রাখা হয়েছিল, যাতে বর্ষা-বাদলায় চৌবাচ্চায় জল বেশি জমে গিয়ে বিষ্ণুবিগ্রহকে ডুবিয়ে দিতে না পারে, তাতে সুন্দর মূর্তিটি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। মূর্তি রক্ষার এই সরল পূর্ত ব্যবস্থাটাই বোধহয় পাকেচক্রে দেবতার মাহাত্ম্য বলে প্রকাশ পেয়ে এসেছে ; লোকে অন্ধ-বিশ্বাসেই তা গ্রহণ করেছে। তাই আজ বুঢ়ানীলকণ্ঠ বিনা জ্বালাতনে জলের উপর ভেসে থাকে—বেঁচে থাকে তার মেকি মহিমা।

ফটো : চিত্ত সামন্ত

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিসেম্বর ১৯৮৩

বিষ্ণুমূর্তির আরশিতে সমাজ-মূর্তি

কাগজে কাগজে জোর খবর—মঙ্গলবার (২ নভেম্বর '৮২) সোনারপুরে মাটির তলা থেকে এক বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে উকিলা গ্রামে মূর্তিটা পাওয়া যায়। আপাতত সেটা সোনারপুর থানার হেফাজতে। থানার ও সি অমরনাথ ওঝা তাকে ফুলমালা দিয়ে পূজা করেন। সেই পবিত্রমূর্তি দেখতে সেখানে হাজার জনতার ভিড়।

বিষ্ণুমূর্তি দেখতে শনিবার সকালে ট্রেনে চেপে আমরা যখন সোনারপুর যাচ্ছি দেখি একপাশে টুনুদা।

টুনুদা কে ? তখন ছিল পূর্ণিমা। রাতে বাড়ি ফেরার পথে দেখি, খালের ধারে টুনুদা ঢোলা হাফপ্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপন মনে কথা বলছে।

—বাপ্পুরে? বেশ মজা, একেতো প্যাটে ভাত নাই, তায় আবার আজ পূন্নিমা। দ্যাশে খাইদ্য নাই—হাহাকার—আকাশে চাঁদ উঠেছেন!

তারপর হাততালি দিয়ে, হাত নেড়ে, খালপাড় ফাটিয়ে চীৎকার করে বলল, —চাঁদবাবু, ধন্যবাদ আপনেরে, অনেকদিন মনে থাকবে আপনের কথা!

টুনুদার কাজ নেই।

বসে বসে আরো কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে জোর আলোচনায় মেতেছে। —কষ্টিক পাথরের গো! যে-পাথরে সোনা ঘষে! সবচেয়ে দামি পাথর। ঠাকুরের চূড়ো, ঘটি—সব কষ্টিক পাথরের। বলি এত লোক আছে, কেউ পাচ্ছে না তো মেয়েটাই বা পেলে ক্যানে বলো? নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যাপার আছে। হুঁ বাবা, যে ঘরেই ও ঠাকুর নে যাও না ক্যানে, সে ঘরই সোনায় ভরে যাবে।

আমি টোকা মেরে জিজ্ঞেস করলাম—কি ব্যাপার গো টুনুদা?

আরে কাণ্ড দেখ, আপনি যে! কোথায় চল্লেন? সে এক বড় ব্যাপার ঘটে গেছে বুঝলেন। সোনারপুরে এক মুচুলমানের মেয়ে মাটির তলা থেকে মায়ের মূর্তি পেইছে। সে নিয়ে হিন্দু-মুচুলমানের রাইট লেগে যাচ্ছিল। মুচুলমানেরা বলছে—এ-ঠাকুর আমাদের, আমরা পেইছি। আমরা মন্দির বানাচ্ছি, তোমরা পুজো-আচ্চা কর। হিন্দুরা তা শোনবে কেন? তারা বলে, এ-ঠাকুর আমাদের। তারপর এ কথা সে কথা, তো সে অনেক কথা।

জানলার ধারে নাক ঝেড়ে ট্রেনের দেওয়ালে হাত মুছে আবার বলল, খেজুর গাছের গোড়া থেকে ছুটো সাপও বেইরোল। আবার গত্তে ঢুকে গেল তো সেই মেয়ে গত্তে উঁকি দে দেখে মায়ের মূত্তি জ্বলজ্বল করে। তখন লোক ডাক। শাবল দে খুঁড়ে বার কর। সে অনেক হাঙ্গাম। দশজনে মিলে যা পারে না—সেই মেয়ে একাই অত ভারি মায়ের মূত্তি কোলে করে নিলে! লোকের কথা, রাতে নাকি মেয়েডারে কে খাওয়াইয়া যায়! নাওয়াইয়াও যায়। মেয়ের এখন খুব জ্বর। মূত্তিডারে থানায় এনে রেখিছে। তাইত সব দর্শনে যাচ্ছি। অমন জাগ্রত দেবতা তেনার দয়ায় কি না হয়? আমাদের মনোবাঞ্ছা কি আর পূরণ না করে থাকবে বাবু?

সোনারপুর স্টেশনে নেমে টিকিট কাউন্টারের সামনে দিয়ে এগিয়ে রাস্তায় নামলে সামনেই নাক বরাবর পড়বে থানা। আর রাস্তা ধরে ডানদিকে ছু-পা হেঁটে গেলে ডানহাতে পাবেন 'শিল্পকুটির'—ফটো, ছবি, কার্পেট ও বইবাঁধাই কেন্দ্র। ছোট্ট দোকান। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল বিষ্ণুমূর্তির ছবি বিক্রি করে এদের কপাল ফিরেছে। চল্লিশ পয়সার ছবি বিক্রী হচ্ছে

হু-টাকা—তিন টাকা—পাঁচ টাকায়। তাও শেষ। তাতেও যে কি ভিড়! দোকানের সামনের দিকে ডাইনে-বাঁয়ে-মাথার দু-পাশে দুটো বিষ্ণুমূর্তির ছবি নিয়ে মাঝে অমিতাভ বচ্চন—একই সাথে বড় করে বাঁধান। কি ব্যবসায়িক বুদ্ধি!

থানায় বড় বাবুর ঘরে রাখা আছে বিষ্ণুমূর্তি। সকাল নটা সাড়ে-নটার সময় তাকে বার করে আনা হবে থানা সংলগ্ন মাঠে। সেখানে ছোট্ট একটা প্যাণ্ডেলে রাখা হবে মূর্তিকে—রাত এগারটা অবধি। তারপর আবার থানায় বন্দী।

ও সি অমরনাথ ওঝা বিহারের মানুষ। বিহারের মাটির শুষ্কতা, রুক্ষতার ছিটেফোঁটার ছাপও বড়বাবুর চরিত্রে পড়ে নি। একটি মানপত্রে তাই লেখা আছে। দেয়ালে সেটি টাঙানও আছে।

ঘোর আস্তিক। থানায় এসে ঢুকে প্রথম মিনিট পাঁচেক কেটে যাবে তার পুজো করতে। ধূপ জ্বালিয়ে, ঘি ছিটিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে, জোরে জোরে মন্ত্র পড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুজো সেরে চেয়ারে বসেন তিনি। বড়বাবুর বাঁদিকে পিছনে দেওয়ালের গায়ে লাগান রয়েছে ছোট্ট ছোট্ট বাঁধান দুটো ছবি—তার একটি মহাবীর আর অন্যটি কালী। তারই পুজো। পুজো শেষে চেয়ারে বসবেন বড়বাবু, পেছনে আলমারির ওপর থাকবে ঘণ্টা, ঘিয়ের শিশি, ধূপ আর ছোট্ট সন্দেশের বাক্স। বললেন, দেখুন, এখনো অব্দি যা খবর তাতে বলা যায় ওটা চোরাই মাল নয়। মাটির দুই-তিন ফুট নিচে ছিল। অমরেন্দ্র লাহিড়ী বলছেন, ওটা সেন যুগের। আবার এন সি ঘোষের মতে ওটা পাল যুগের।

থানায় ঐ বিষ্ণুপুজো নিয়ে প্রশ্ন করতেই বললেন,—আসলে কি জানেন, আনন্দবাজার পত্রিকার লোকেরা গাড়ি করে ফিরছিল বারুইপুর থেকে। খবর শুনে সোজা থানায় চলে আসে। তখন সন্ধ্যে। ওরা বিষ্ণুমূর্তির ছবি তুলতে চাইলেন। কাজেই মালখানা থেকে ঠাকুরকে বার করতেই হলো। ভাবলাম বারই যখন করলাম তো পুজোই করে দি। পুজো করলাম নিজেই। ওরা প্রসাদ-টোসাদ খেলেন, ফিরে গেলেন। সেই থেকে রোজ সকালে আমি নিজেই থানায় ঠাকুরকে পুজো করে তবে বাইরে বার করি জনসাধারণের দর্শনের জন্য। আজ-কাল আর পেরে উঠছি না। ঠাকুরমশাই এসেই পুজো করে যান।

—মূর্তিটাকে নিয়ে এখন কি করবেন ভাবছেন?

আমি কি আর করার মালিক? সরকার যা বলবে তাই করতে হবে। তবে কিনা জনসাধারণ চাইছে এখানেই মন্দির হোক। দু-হাজার লোক মাস-পিটিশন

করেছে মূর্তি না নিয়ে যাবার জন্য। এখানকার পাঁচু গোপাল নস্কর (পাঁচু-গোপালবাবুর প্রচুর জমিজমা আছে, রাস্তার ওপরের জমিগুলো ভেস্টেড্ হয়ে যাচ্ছে) একবিঘা জমি আর একলাখ টাকা লিখে দিয়েছেন, লাগলে আরো দেবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত বলছে, এখানে মন্দিরই হোক। ভিড় কেমন হচ্ছে দেখছেন না। বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাসন্তী থেকে লোক আসছে রাত বারোটা অবধি। এখন আর কি দেখছেন, সন্ধ্যাবেলায় দেখবেন। মন্দির না বানালে 'ল অ্যাণ্ড অর্ডারে'র প্রব্লেম হবে।

খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম বড়বাবুর মন্দির বানানোর অভ্যেস আছে। আগে অন্যত্র নানান অজুহাতে মন্দির বানিয়েছেন।

—আচ্ছা এ রকম কি কোন ঘটনা আপনার জানা আছে যে, ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবান প্রাচীন কোন মূর্তি সরকারের জিম্মায় না দিয়ে সেটাকে নিয়ে মন্দির বানানো হয়েছে ?

—কেন কাঁচড়াপাড়ার ওদিকে বীজপুরে ? সাত-আট বছর আগে তো ঠিক এরকমই ঘটেছিল। পরে মন্দির হয়েছে।

বেশ কথা, প্রাচীন মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক মূর্তি নিয়ে আপনারা যা খুশি তাই করুন। মন্দির বানান, পুজো করুন, ব্যবসা করুন—আমরা দেখেও দেখব না, বুঝেও বুঝব না—কেন না আমার এই দেশ, আমাদের জন্মভূমিতে যা খুশি তাই হয়। তবু প্রশ্ন করলাম,—আচ্ছা এই যে প্রণামী, দক্ষিণাদি সেগুলোর কি খবর, কি করবেন ভাবছেন ?

—কেন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেব, আর মন্দির হলে তো সেখানেই লেগে যাবে।

—ওগুলোর কোন হিসেব-পত্তর থাকছে ?

—না হিসেব করি নি, তবে এই ধরুন পাঁচ-ছ-শো টাকা করে পড়ছে আজকাল।

—আর অন্যসব ? কলা-শসা ওগুলো ?

—সে-সব কিছু দিচ্ছে না।

বুঝলাম প্রচীন মূর্তিকে মিউজিয়ামে না দিয়ে মন্দির বানালে পূণ্য হয়। নাম যশ হয়, মহান হওয়া যায়। দু-পয়সা আয় হয়—দক্ষিণা-টক্ষিণাদি থেকে। আর লোকের দেওয়া কলাটা, শসাটা, মূলোটা খেয়ে স্বাস্থ্য ভাল হয়।

থানার বাইরে অসংখ্য মানুষের অকথ্য ভিড়। ভিড়ে যুবক আছে, যুবতী আছে। বুড়ো আছে, বুড়ি আছে। পণ্ডিত-মূর্খ, সাধু-ভণ্ড সবাই

আছে। তবে বেশিটাই টুনুদার মতো লোক। এই ভিড় দু-দিন আগে থানার পাঁচিল ভেঙেছে—কই সেই জাগ্রত দেবতা, যাকে থানার বড়বাবুও পুজো করেন ?—এই কৌতূহলে।

গড়িয়া থেকে নরেন্দ্রপুর যেতে রামকৃষ্ণ মিশনের পাঁচিল শেষ হওয়ার পর বাঁ-হাত বরাবর পাঁচিলের গা ঘেঁষে সোজা হেঁটে যান। পাঁচ-সাত মিনিট। দেখবেন, পৌঁছে গেছেন উকিলা গ্রামের নবাব আলি মোল্লার ঘরে। ঘরের সামনেই পুকুর। পুকুরের একধারে, ঘাটের সামনে, একটা গর্ত। বুঝবেন, এই সেই গর্ত যেখানে গত মঙ্গলবার অব্দি বিষ্ণু ছিলেন, এখন যিনি থানায় সন্দেশ খাচ্ছেন। 'এখানকার মাটি অতি পবিত্র। গত মঙ্গলবার এইখানে স্বয়ং নারায়ণ পাথরের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।' খবর্দার মাটি নেবেন না। এ-মাটি সে-মাটি নয়। মাটি জাল হচ্ছে। পবিত্র মাটি নিয়ে নিয়ে প্রতিদিন এতবড় গর্ত হয়ে যাচ্ছে যে নবাব আলি মোল্লা রাতে অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে ফেলে রাখছে ওখানে, কাজেই গর্তের ওপরের মাটি পবিত্র নয়। ঠাকুরের ছোঁওয়া নেই তাতে।

চলে অসুন সোনারপুর জে এল আর ও অফিসের তহশীলদার নবাব আলী মোল্লার ঘরে। দেখবেন ছয় মেয়ে, তিন ছেলের বাবা নবাব আলী মোল্লা এখনও যুবক। বললেন, যা সব ঘটছিল বুঝলেন, কি আর বলি! মূর্তিটাকে কেন্দ্র করে একটা কমিউনাল রায়ট লেগে যেত, কি বলব।

একটু দম নিয়ে বললেন, দেখুন, আজ অব্দি কাউকে ঠকাই নি। ভালো ব্যবহার করি। এ সব কি গালাগাল দিলে শালা-বাঞ্চত বললে মনে লাগে। পুলিশ না এলে আমি তো মার্ডারই হয়ে যেতাম। মূর্তিও থাকত না! ছিনতাই হয়ে যেত।

এগিয়ে গিয়ে মুখ থেকে পানের ছিবড়ে ফেলে বললেন—জিনিসটার দাম কত উঠেছিল শুনবেন ?—পঁচিশ হাজার টাকা। কিন্তু মূর্তিতে তো আমাদের বিশ্বাস নেই বাপু। বলে দিলাম, মূর্তি বিক্রি করে পয়সা নিতে পারব না, তাহলে আমাদের ধর্মে আমি কাফের হয়ে যাব। এক শ্রেণীর লোক চাইছিল জিনিসটা লুটপাট করতে। শেষে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল আমার ওপর। বলে, শালা তুই পুলিশে খবর দিলি কেন? তোকে মারব। তারপরে তো সে কত গুজব! হুজুগে বাঙ্গালীতো! আমার মেয়ে নাকি অন্ধ হয়ে গেছে। আমার বাড়িতে সাপ কিলবিল করছে। মেয়ের বাবা-মা শয্যাশায়ী বোবা হয়ে গেছে, সে কত কথা!

সুর পাল্টে বললেন,—আমার শরীর কাঁপছে। আমার নিরাপত্তার অভাব,

প্রাণনাশের আশঙ্কাও বোধ করছি। বলে কি-না বোম মেরে উড়িয়ে দেব। একমাত্র আমার ব্রেন ঠিক বলে, নইলে পশ্চিমবাংলায় একটা দাঙ্গা হয়ে যেত।

একটু থেমে বললেন, ওহ সে যে কি পাগলামো, আর কি কাণ্ড সে আর কি বলব! বুড়ো মানুষ বলে কিনা আজ থেকে আপনি আমার ঠাকুর! পায়ের ধুলো নিয়ে খাচ্ছে। পায়ের ধুলো যে কত নিয়েছে! আমি বলি, অমন করবেন না, অসুখ করবে যে! কে কার শোনে কথা! নমস্কার করছে, সটান শুয়ে পড়ছে। চুমো খাচ্ছে। কি না করছে! সবই করছে। যত বলি আমি পাপী মানুষ, আর আমায় পাপের ভাগী করবেন না। আমায় কেন প্রণাম করা? তা কে আর শোনে কথা!

মূর্তিটা আবিষ্কার করেছে এরই ছোট মেয়ে নাজিমা খাতুন। ডাক নাম সোনামনি।

ফেরবার পথে নূর আলী মোল্লা আপনাকে ধরবে। বলবে—ও দাদা, এত কথা শুনলেন, এত ছবি তুললেন, আসল লোকইতো বাদ পড়ে গেল! মূর্তিতো পেয়েছে আমার বড় ভাইপো ইদ্রিস আলী মোল্লা? ওর সাথে কথা বলবেন না? ছবি তুলবেন না?

অনেক কথা বলবে। বলবে—ও নামী লোক মানী লোক, সবাই তাই ওর কথাই শুনছে, ওর কথা বলছে, ওর ছবি তুলছে। পার্টি করেতো, তাই জোর বেশি ওর। নাম হচ্ছে ওর। ও আমার নিজের দাদা—কিন্তু একটা জোচ্চোর, ঠগ।

যেতে যেতে যদি দুপুর আড়াইটেও বাজে তখনও দেখবেন চিন্তামণি কর স্টুডিওতে মূর্তি গড়ছেন। নরেন্দ্রপুরেই বাড়ি। ভদ্রলোক একসময়ে গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, আরো অনেক কিছু ছিলেন। ইনি বিষ্ণুমূর্তিটা দেখেছেন প্রথমদিনই।

—মূর্তিটা ইউনিক। ইউনিক এই অর্থে যে, কোথাও একটা আঁচড় অব্দি পড়ে নি। এমন মূর্তি সত্যিই দুর্লভ। ওয়ার্কম্যানশিপও খুবই ভালো। প্রায় তিন-সাড়ে তিন ফুট লম্বা। বিষ্ণুর দুই দিকে লক্ষ্মী, সরস্বতী। বিষ্ণুর চারটি হাত। তিন হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা। অন্য হাত শূন্য। বেসাল্ট পাথরে গড়া। রাতে টর্চ আর হ্যারিকেনের আলোয় দেখেছি তাই কিছু ভুল হতে পারে। তবে মোটামুটি-ভাবে ওটা পাল-বংশের শেষভাগের কিম্বা সেন-বংশের প্রথম দিকের মূর্তি। ১২০০-১২৫০ বছরের এদিকে নয়।

বললেন, আমার কিন্তু দুটো বড় প্রশ্ন আছে। প্রথমত, মূর্তি যদি অনেকদিন ধরে বাংলাদেশের মাটির নিচে থাকে, তো তাতে পটাশ সোরা এসবের একটা

কোটিং পড়ে। সেই কোটিং কিন্তু ছিল না মূর্তির গায়ে। এটা কিন্তু বেশ রহস্যময়। দ্বিতীয়ত, মূর্তিটা লম্বায় যদি তিনফুটও হয় তাহলেও ঐ তিন কিউবিক ফুট মূর্তির ওজন হবে ১২০ থেকে ১৫০ কেজি। আপনারা দেখেছেন মূর্তিটা পাওয়া গেছে মাটি থেকে এক দেড় ফুট নিচে। পুকুরপাড়ের উর্বর নরমমাটি। তো সে খাড়াভাবেই থাক আর চিৎ করেই রাখা থাক, অত ভারী একটা মূর্তি মাটির সারফেসের অত কাছাকাছি থাকতেই পারে না। বহুদিন ধরে থাকলে খুব কম করে হলেও চার-পাঁচ ফুট নিচে যাবেই যাবে। পুকুর-টুকুর খুঁড়লে এমন মূর্তি পায়—বুঝুন কত নিচে!

আমার গভীর সন্দেহ, ওটা নিশ্চয়ই বহুদিন ধরে ওখানে রাখা ছিল না। কেউ এনে লুকিয়ে রেখেছে।

—লুকিয়েই যদি রাখবে তাহলে অত সহজে হৈ-চৈ করে এটা বার করলই বা কেন?

—এ ধরুন এখানে যদি সত্যিই অন্য কোন জায়গা থেকে চুরি করে মূর্তিটা এনে লুকিয়ে রাখে কেউ, তাহলে নিশ্চয়ই লোকাল গুণ্ডাদেরও অজানা থাকবে না। এখন, তারা হয়তো দেখলো এইরকম প্যাসিভ রোলে থাকলে তারা মুনাফার মাত্র অল্প একটু ভাগ পাবে। এরপর ধরুন, তারা ব্যাপারটা ওপেন করে দিল। ভাবলো এরপর চ্যাঁচামেচি হাঙ্গামা করে এখানেই মন্দির বানিয়ে মূর্তিটা রাখবে। (মনে রাখবেন, মূর্তিটা নিয়ে যেতে পুলিশকে অনেক বেগে পেতে হয়েছে। বোমা পড়েছে। পুলিশের জিপ আটকে দিতে রাস্তায় গর্ত খোঁড়া হয়েছে।) তারপর সেখান থেকে মূর্তি লোপাট করলে লাভের পুরোটাই পাবে তারা। দাম তো কম হবে না!

—কত হবে?

—এ-তো বাজারের পণ্য নয়! দেখুন এভাবে ওসব মূর্তির দাম বলা যায় না। যে কিনছে তার কত টাকা আছে আর কতটা শিল্প-প্রেমিক তার উপর নির্ভর করে। তবে ভারতীয় বাজারে ৫/৭ লাখ টাকা দাম ওঠাও বিচিত্র নয়। আর আমেরিকায় বিক্রি করলে কম হলেও ২৫ লাখ পাবেন।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের গেটের বাইরে মহম্মদ-দার চায়ের দোকান। এখানে আপনি আলুর দম পাবেন, ঘুগনি পাবেন। আর পাবেন দিলখোলা মানুষ মহম্মদদাকে। ফেরবার পথে একবার ওখান হয়ে যাবেন। নইলে শেষ কথাটা শোনা হবে না।

দাদার মতো ভারি চেহারা নিয়ে মহম্মদদা, একাই সকাল থেকে রাত্রি অবধি দু-হাতে দোকান চালান। এককাপ চা নিয়ে জিজ্ঞেস করুন, কি ব্যাপার মহম্মদদা,

এ খানে হৈ-চৈ কিসের ?

—আরে দাদা যত সব বোকা-ছাগল, আধ-পাগলের কাণ্ড। আরে বাবা মাটি খুঁড়ে মূর্তি পেয়েছিস ভাল কথা। তা নিয়ে এত হুজ্জুতি কিসের! মিউজিয়ামে দিয়ে দে! এসব পুরনোকালের জিনিসপত্র নিয়ে তো আর ছেলেখেলা চলে না। শুনেছি এসব থেকে নাকি অনেক আগেকার দিনের লোকজনদের খবরও পাওয়া যায়। মিউজিয়ামে দিলে কিছু টাকাও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ওখানে থাকলে হাজারটা লোক দেখবে। ঠিকভাবে থাকবে। সেকেলে সভ্যতার কথাও জানা যাবে। তা না করে এত মা-মা বাবা-বাবা করে নাচানাচি করার আছেটা কি ?

তারপর হয়তো উনানটা একটু খুঁচিয়ে দিয়ে শান্তস্বরে মজা করে বলবে, কাণ্ড কি হয়েছিল শুনবেন ? সেদিন এক ঢোঁড়া সাপ খুব করে ব্যাঙ খেয়েছে। খেয়েদেয়ে পেট মোটা করে পড়বি তো পড় এক গর্তের মধ্যেই পড়লো। আর যাবে কোথায় সাথে সাথে সমস্ত ক্ষেপা-পাগল, ভেড়া-ছাগলগুলোর মা-মা চীৎকার।

এরপর নাটকীয়ভাবে বলবে—মা-মাগো, তোমার মনে এই ছিল মা! যত্ত সব। মাঝে মাঝে আমি ভাবি, বুঝলেন দাদা, মানুষ এমন গরু হয়ে যায় কি করে ?

বললাম, তারও উত্তর আছে!

* * *

খবরে প্রকাশ, বিষ্ণুমূর্তি এখন সরকারি জিম্মায়, মিউজিয়ামে।

সঞ্জয় পণ্ডিত

ডিসেম্বর ১৯৮২

দেবীর পদচিহ্নের খোঁজে

মাসীমা বললেন, "এসো বাবা, তোমায় মায়ের পায়ের ছাপ দেখাই।"

মন্দিরের বারান্দা থেকে নেমে সামনেই নাটমন্দির। মেঝেয় সবুজ রঙের মোজাইক। তার ওপর কয়েকটা পায়ের ছাপ। একটু অস্পষ্ট। সবুজ মেঝের ওপর জল পায়ে হাঁটলে যেমন ছাপ পড়ে সেই রকম। মাসীমাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ছাপটা কি প্রথম থেকেই ছিল ?" "না বাবা, এই তো গত পুজোর কয়েকদিন পরের কথা। একজন লরি ড্রাইভার মন্দিরের পাশের টিউকল থেকে জল খাচ্ছে। রাত তখন দেড়টা-দুটো। হঠাৎ সে দেখে কি—একটা মেয়ে সামনের পুকুর থেকে উঠে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। এত রাতে একলা মেয়ে ? ভেতরে উঁকি মারতেই দেখে মেয়েটা নাটমন্দিরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দু-এক বার ডেকে সাড়া না পেয়ে কাছের মিষ্টির দোকান থেকে একজনকে ডেকে নিয়ে এল। এসে দেখে মেয়েটি আর নেই। তারপর থেকেই মেঝের ওপর এই পায়ের ছাপ।" মাসীমা কপালে হাত ঠেকালেন।

আমি বললাম, "কি করে জানলেন, এটা মায়ের পায়ের দাগ ? অন্য কারোরও তো হতে পারে ?" "ও পায়ের দাগ যে কিছুতেই তোলা যায় না বাবা। অবিশ্বাসীরা তো মুছে ঘষে তোলার চেষ্টা করেছে অনেক।" বুঝলাম, পায়ের ছাপের স্থায়িত্বই মাসীমার কাছে দেবীর অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

দাঁড়িয়ে আছি রাজবল্লভী দেবীর মন্দির চত্বরে। স্থান—হুগলীর রাজবলহাট। তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। হাওড়া থেকে তারকেশ্বর লোকালে হরিপাল স্টেশন। হরিপাল থেকে দশ নম্বর বাসে চেপে রাজবলহাট 'মায়ের মন্দির'। অন্য রুটও আছে।

রাজবল্লভী দেবীর মন্দির অনেক পুরোনো। কয়েকশো বছরের। রাজা সদানন্দ রায় নাকি এই মন্দির এবং গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। কবি কৃত্তিবাসের বংশধর ছিলেন এই সদানন্দ। গ্রামের স্বাহ (সাহাচৌধুরী), পালধি এবং বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি-, ধারী তিন ব্রাহ্মণ বংশকে তিনি দেবীর পৌরোহিত্যের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়া, পুজোর সহযোগিতার জন্য ডোম, কাঠুরিয়া, মালাকার, কুম্ভকার, গোয়ালা

কর্মকার, ঘড়িয়াল (ঘণ্টাবাদক), বাদ্যকর—এরাও একই সময়ে মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হন। এরা প্রত্যেকেই সদানন্দর কাছ থেকে ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন। দান হিসেবে। বংশ-পরম্পরা এখনও পর্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। সদানন্দ রায়ই নাকি এখানে তাঁত শিল্পের সূচনা করেন। দেবীর বর্তমান সম্পত্তি দেখাশোনার ভার শ্রীরামপুরের তুলসী গোস্বামীর মেয়ে অসীমা গোস্বামীর ওপর। তিনি আবার গ্রামের সনাতন ভড়ের (তাল মিছরির ব্যবসায়ী দুলাল চন্দ্র ভড়ের আপন ভাই) ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন।

সকালে বিকেলে সন্ধ্যায় দেবীর ভোগের ব্যবস্থা হয়। সবজি, চাল এবং মাছ প্রতিদিন স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করেন মন্দিরের কর্মীরা। প্রণামী পড়ে প্রচুর (পায়ের ছাপের ঘটনার পরবর্তী মাস দুয়েক প্রনামীর পরিমাণ কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল)। তাঁতের কাপড় থেকে টাকা পয়সা। টাকাপয়সা সেবাইতদের মধ্যেই ভাগ বাঁটোয়ারা হয়। যার যেদিন পালা পড়ে—এই হিসাবে। আমি যে মাসীমার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি একজন সেবাইতের স্ত্রী। পদবী—ব্যানার্জী।

এইসব তথ্য পরে জেনেছি। রাজবলহাট যাওয়ার আগে পায়ের ছাপের কথা শুনেছিলাম। শুনেছিলাম, উনিশশো তিরাশির পুজোর সময়কার এই ঘটনা। এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে প্রতিদিন শত শত মানুষের সমাগম হয়েছিলএই রাজবলহাট 'মায়ের মন্দিরে'। শুধু আশ-পাশের গাঁয়ের মানুষ নয়, শুধু হুগলীর নয়, অন্য জেলারও। সেই সময় মন্দিরে আসার জন্য স্পেশাল বাসেরও বন্দোবস্ত হয়েছিল। পরে নাকি প্রকাশ হয়ে পড়ে, এটা সেবাইতদেরই কারসাজি। প্রণামীর পরিমাণ বাড়ানোর একটা প্রচেষ্টা। টাকাপয়সার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গণ্ড-গোলের ফলে সেবাইতদেরই একজন সত্য ঘটনা প্রকাশ করে দেয়।

পায়ের ছাপের ঘটনা কি সত্যি? এর পেছনে সত্যিই কি রয়েছে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ? নাকি লোক ঠকানোর স্বার্থান্বেষী মন? এই সব প্রশ্ন তখন ভাবিয়ে তুলেছিল।

যাই হোক, মাসীমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঢুকে পড়লাম স্থানীয় লাইব্রেরীতে। লাইব্রেরী-কাম-মিউজিয়াম। অমূল্য প্রত্নতত্ত্বশালা। আলাপ হলো পরিচালক কৃষ্ণপদ ব্যানার্জীর সাথে। পায়ের ছাপ সম্পর্কে তার মত জানতে চাইলাম। সরাসরি জবাব এড়িয়ে গেলেন কৃষ্ণপদবাবু। বললেন, "এ ঘটনা বিশ্বাসীরা একভাবে নেবেন, অবিশ্বাসীরা অন্যভাবে। কেউ কেউ বলেন, ওটা প্রণামী বাড়াবার জন্য সেবাইত গোষ্ঠীরই কাজ। কেউ আবার বলেন, 'শুধু নাটমন্দিরে পায়ের ছাপ কেন? মন্দিরে ঢোকার দরজা দিয়ে নাটমন্দির যেতে হলে সিমেণ্ট

বাঁধানো মেঝের ওপর দিয়ে খানিকটা হাঁটতে হয়। এই সিমেন্টের ওপর ছাপ পড়ে নি কেন? মা তবে কি লাফ মেরে দরজা থেকে নাটমন্দিরে গিয়ে পড়েছিলেন?'" লাফ মারার দৃশ্য ভদ্রলোক অভিনয় করে দেখালেন। "এ ঘটনার পর স্থানীয় এবং বাইরের কিছু মানুষ ঘষে, জল বা বিভিন্ন কেমিক্যাল ব্যবহার করে ছাপটা তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেন নি!" কৃষ্ণপদবাবুর কথাবার্তা শুনে বুঝলাম পায়ের ছাপ অলৌকিক উপায়ে হয়েছে, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু স্পষ্টভাবে আমাকে না বলার পেছনে কোন কারণ আছে। আমি অপরিচিত বলে? সুতরাং অন্যদিকে চেষ্টা করলাম, "যেসব স্থানীয় লোক ছাপ তোলার চেষ্টা করেছেন, তাদের কারোর সাথে আলাপ করা যেতে পারে?" ভদ্রলোক বললেন, "দেখুন, এই দুপুরবেলা তারা অফিস, স্কুল-কলেজে রয়েছে! কাউকে পাবেন কিনা সন্দেহ। তাছাড়া সেদিন অনেক লোকের ভিড়ে যারা ছাপ তোলার চেষ্টা করেছিলেন, তাদের আলাদা করা মুশকিল।" বুঝলাম, কৃষ্ণপদবাবু হয়ত তাদের চেনেন কিন্তু পরিচয় করাবার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চান না। এরপর একথা সেকথার পর লাইব্রেরী থেকে বিদায় নিলাম।

সব মিলিয়ে রাজবলহাট গিয়েছি বার তিনেক। আলাপ হয়েছে জনা বিশেক স্থানীয় মানুষের সাথে। এদের মধ্যে চারজন ছাড়া প্রত্যেকের মধ্যেই অবিশ্বাসের ভাব লক্ষ্য করেছি। কেউ স্পষ্টভাবে নিজের মত বলেছেন। কেউ বা কৃষ্ণপদবাবুর মতো ঘুরিয়ে। আর বাকি চারজনের মধ্যে তিনজনই সেবাইত গোষ্ঠীর ব্যানার্জী বংশের লোক এবং চতুর্থজন একটি ৫/৬ বছরের ছেলে। সে বলেছিল, ছাপটা যত মোছা যায় তত জ্বল জ্বল করে ওঠে। মন্দির প্রাঙ্গণে দেখেছি অন্তত শ'খানেক লোক। দুপুরে দেবীর অন্নভোগের প্রসাদ পাবার জন্য আসা। তিনদিনে একটি মেয়েকেই কেবল পায়ের ছাপে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেখেছি। আর কারোর ওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এ ব্যাপারে নির্বিকার, উদাসীন। যদিও অনেকেই বসে রয়েছে নাটমন্দিরে। তাদের সামনে, দু-পাশে, পায়ের তলায় ছড়িয়ে রয়েছে দেবীর চরণচিহ্ন।

চিত্ত সাহাচৌধুরী বলে আর একজন সেবাইতের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম রাজবলহাটের বাইরে, কোলকাতায়। ঘটনার পেছনে মানুষের হাত থাকতে পারে এই সম্ভাবনার কথা বেমালুম উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। অথচ তার অফিসের এক সহকর্মীকে তিনি উল্টো কথাই বলেছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সহকর্মী আমার পরিচিত।

প্রথমদিনই দেখা হয়েছিল তিনজন অবসর প্রাপ্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে।

রাজবলহাটের রাধাকান্ত জীউর মন্দিরে। এরা বারান্দায় বসে গল্প করছিলেন। পায়ের ছাপের প্রসঙ্গ উঠল। একজনও দেবীর মহিমার কথা তুললেন না। তাদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথন শুরু হলো। একটা অংশ তুলে দিচ্ছি।

—দেখ, পায়ের ছাপ যদি মায়েরই, তবে আলতা পরা নেই কেন?

—কেন? স্নান করে ওঠার সময় হয়ত আলতার ছাপ মুছে গেছে।

—এই যুক্তিটা তোমার ঠিক হলো না!

ভাবটা এই—এই যুক্তিটা ঠিক না হলেও 'পায়ের ছাপ দেবীর নয়'—এটা সত্যি।

দ্বিতীয় দিন আলাপ হয়েছিল কয়েকজন স্থানীয় যুবকের সঙ্গে। এরা দুপুর-বেলায় 'অন্নভোগে'র প্রসাদ পাবার জন্য মন্দিরে বসেছিলেন (এ-জন্য অবশ্য প্রত্যেককে সকালে তিন টাকা করে জমা রাখতে হয়েছিল)। এরা মনে করেন ছাপটা নাটমন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় থেকেই ছিল।

—তাহলে এতদিন চোখে পড়ে নি কেন? এতগুলো ছাপ! চল্লিশ বছর আগে নাটমন্দিরের প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যে কারোর চোখে পড়বে না!

উত্তর দিতে ইতস্তত করছেন দেখে বললাম, "আপনারা কেউ এ-ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিলেন?"

—খোঁজ নিয়েই বা কি হবে?

এ-এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তার ছাপ। দেখি, বুঝি সবই। তবে যা চলছে, চলুক। কি হবে ওসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে।

স্থানীয় হাই স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক কিংবা চায়ের দোকানের মালিক —কেউই মূল সত্য কতটুকু জানেন খুলে বলতে চান নি। ধীরে-সুস্থে কথা ঘুরিয়েছেন অন্য প্রসঙ্গে।

স্থানীয় লোকেরাই যখন খুলে বলতে চান না, তখন পুরোহিতদের কাছ থেকে আশা করার কি-ই বা আছে? রাজবলহাটে যে দুই পুরোহিতের সঙ্গে আলাপ করেছি, তারা দুজনেই দেবীর মহিমা প্রচার করার চেষ্টা করেছেন, মূল প্রশ্ন থেকে সরে এসে। প্রচারের টেকনিক হলো—স্বপ্নে দর্শন দেবার নানা গল্প ছড়ানো। দু-ধরনের গল্প। এক, স্বপ্নাদেশ পালন করলে অর্থপ্রাপ্তি, রোগমুক্তি। এবং দুই, আদেশ পালন না করলে ব্যক্তিগত বিপর্যয়। যেমন, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে কোন প্রিয়জনের মৃত্যু। তবে এটা লক্ষণীয়, দুই পুরোহিতের কেউ পায়ের ছাপের প্রসঙ্গ নিজে থেকে টেনে আনেন নি। মন্দির সম্পর্কে নানা কাহিনী, কিংবদন্তী তাদের কাছ থেকে শোনার পর আমাকেই বাধ্য হয়ে সে-প্রশ্ন তুলতে হয়েছে।

মোজাইক বা সিমেন্টের ওপর এ-ধরনের দাগ তৈরি করা যায়। প্রয়োজন শুধু অ্যাসিডের। হার্ডওয়্যারের দোকানে বাথরুম পরিষ্কার করার জন্য মিউরিয়েটিক অ্যাসিড (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড) পাওয়া যায়। সেই অ্যাসিড পায়ের পাতায় বা জুতোর তলায় মাখিয়ে মেঝের ওপর ছাপ ফেলুন। এবার অ্যাসিডকে ভাল-ভাবে কাজ করার জন্য দু-তিন ঘণ্টা রেখে দিন। ঐ সময় মোছা বা ঘষার চেষ্টা করবেন না। এরপর থেকে রাজবলহাটের 'অলৌকিক' পদচিহ্ন আপনার ঘরেই দেখতে পাবেন। প্রতিদিন। জল দিয়ে, সাবান দিয়ে ঘষে যতই তোলার চেষ্টা করুন, ছাপটা ঠিকই থাকবে। তবে বেশ কিছুদিন পরে তা ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে যাবে। মন্দিরের ছাপও আর প্রথম দিনের মতো স্পষ্ট নেই। 'যত মোছা যায় ততো জ্বল জ্বল করে' ওঠার প্রশ্ন ওঠে না।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। পরপর শুধুমাত্র বাঁ-পায়ের ছাপ পড়েছে। এক পায়ে দেবীর লাফিয়ে চলার দৃশ্য কল্পনা করুন। বাঁ-পায়ের ছাঁচে অ্যাসিড ফেলে ছাপ তৈরি করা সহজ। এ-ঘটনা যাদের কীর্তি তারা সহজ রাস্তাই বেছে নিয়েছেন।

ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটা ব্যাপার বেরিয়ে আসে। এক, ঘটনার সঙ্গে অর্থপ্রাপ্তির সম্পর্ক এবং তার সাথে সেবাইতদের স্বার্থের সম্পর্ক স্পষ্ট। তাই সেবাইতরা এ-ব্যাপারে জড়িত থাকতে পারেন। দুই, স্থানীয় লোকেরা, এ-ব্যাপারে কতটুকু জানেন—সে-বিষয়ে মুখ খুলতে চান না। এমন কি নিজের মতামতও সোজাসুজি রাখতে চান না। তিন, দেবতার প্রতিপত্তি বাঁচিয়ে রাখার একটা উপায় দেবতার ক্ষমতা সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচার করা। চার, স্থানীয় যুবকরা যদিও নিজেদের মতামত সোজা কথায় রাখেন নি, সুতরাং সত্য অনুসন্ধানের ব্যাপারে তাদের নিষ্ক্রিয় ভাব রয়েছে।

ঘটনার পেছনে অলৌকিক শক্তির হাত নেই—সত্য হিসাবে এটা বেরিয়ে এলেও বর্তমান প্রতিবেদনের কিছু দুর্বলতাও স্পষ্ট। ঘটনার পরিকল্পনাকার, হিসেবে কারা নির্দিষ্টভাবে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিভাবে কখন এই পায়ের ছাপ ফেলা হয়েছিল, এইসব প্রশ্নের উত্তর জানা গেলে ভালো হতো।

□ মন্দিরের ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্যের জন্য অন্যতম পুরোহিত চিত্ত সাহাচৌধুরীর কাছে প্রতিবেদক কৃতজ্ঞ।

অম্লান ভট্টাচার্য

জুলাই ১৯৮৪

তন্ত্রের দেশ : মায়ং

কামরূপ কামাখ্যার দেশ অসম। অসমের মায়ং স্থানটি তন্ত্র-মন্ত্রের পীঠস্থান—এটা প্রচলিত লোক-বিশ্বাস।

মায়ং বিশেষ করে সাপের ওঝাদের জন্য 'বোনাস পয়েন্ট'। অসমের যে কোন হাটে-বাজারে যদি কোন ওঝা মায়ং-এর লোক বলে পরিচয় দেয় তাহলেই তার কেরামতি সন্দেহের অতীত বলে অনেকেই মেনে নেন। তারা অনেকরকম অসাধ্য সাধন করতে পারেন—এমন কি সর্পাঘাতে মরা রোগীও বাঁচাতে পারেন বলে দাবি করেন এবং অনেকেই অন্ধভাবে তা বিশ্বাসও করেন। এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, মায়ং-এ অনেকে যাদুমন্ত্রে এতই পারদর্শী যে, তারা ছেলেকে মেয়েতে রূপান্তর করতে এবং মানুষকে ভেড়া বানাতে পারেন।

১৮২৯ সালে বাংলায় প্রথম প্রকাশিত 'আসাম বুরঞ্জী' (বুরঞ্জী=ইতিহাস) মায়ং-এর উল্লেখ করেছেন। মায়ং ব্রহ্মপুত্রের তীরে কামরূপ আর নগাঁও জেলার সীমানা বরাবর চন্দ্রপুর থেকে আট কিলোমিটার দূরে একটি অনুন্নত অঞ্চল। গত শতাব্দীতে মায়ং ছোট্ট একটি ব্রিটিশ-আশ্রিত রাজ্য ছিল। বর্তমানে রাজ পরিবারের বংশধরেরা সাধারণ কৃষক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে। ব্রহ্মপুত্রের গায়ে লাগানো বলে মায়ং-এর বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায় প্রতি বছর জলমগ্ন হয় এবং সাধারণ কৃষকদের অধিকাংশেরই বছরে তিনমাসের বেশি নিজের ক্ষেতের ফসলে চলে না। ব্রহ্মপুত্রের বাঁধ ভূরাগাঁও পর্যন্ত এসে থেমে গেছে, মায়ং পর্যন্ত আর আসে নি। অনেকেই বলেন—মাছের ভেড়ির কন্ট্রাকটরদের চাপে পড়ে সরকার বাঁধ তৈরির কাজে হাত দেয় না। তাই সাধারণ মানুষের জীবনে বন্যা, ক্ষুধা, বাস্তুহীনতা ও অর্থাভাব নিত্যকার সমস্যা।

নগাঁও থেকে মহকুমা শহর মরিগাঁও হয়ে আমার মায়ং যাত্রা শুরু হলো। রাস্তার দুধারে ধানক্ষেত এবং কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে জনবসতি। দুপুর একটা নাগাদ বাস থেকে মায়ং হাইস্কুলের কাছে নামলাম। স্থানটিকে রাজা মায়ং বলা হয়। সেখানে স্কুলের ২/১ জন শিক্ষকের সাথে মন্ত্রের বিষয়ে আলোচনা হলো।

শ্রী হরেন শইকীয়ার বাড়ি। শ্রী শইকীয়া স্থানীয় এম. ই. স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি আমার অনুসন্ধান কাজের প্রধান অংশীদার হলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরত একজন ওঝার (স্থানীয় ভাষায় 'বেজ') সাথে দেখা হলো যিনি এ-অঞ্চলে মোটামুটি সবার কাছেই পরিচিত। উনি তন্ত্র-মন্ত্রের বলে বিভিন্ন ধরনের রোগীর নাকি চিকিৎসা করেন এবং সুস্থ করে তোলেন। জিজ্ঞাসা করলাম—

—আপনি কি কি রোগীর চিকিৎসা করেন ?

—অনেক রোগীরই চিকিৎসা করি।

—সর্পাঘাত রোগীরও কি চিকিৎসা করেন ?

—হ্যাঁ, করি।

—সব রোগীই কি বাঁচে ?

—সাপে কাটলে বাঁচে, কিন্তু কালে কাটলে বাঁচে না।

—আচ্ছা, আপনার কাছে কি বাইরে থেকে মন্ত্র শেখার জন্য কেউ আসে ?

—হ্যাঁ, অনেকেই আসে। কেউ চার বছর, কেউ তিন বছর, কেউ ছ-মাস থেকে মন্ত্রতন্ত্রের শিক্ষা নিয়ে যায়।

—আপনি কি ওদের থেকে কোন পারিশ্রমিক নেন ?

—না-না। ওরা আমার ছেলের মত। আমার বাড়ি থাকে, বিভিন্ন কাজকর্ম করে, তাছাড়া ওরা বাইরে গিয়ে তো আমার নাম প্রচার করে। আমি ওদের কাছ থেকে পয়সা নেব কেন ?

এরপর এক বাড়িতে ঢুকলাম। গৃহস্বামী শ্রী প্রদীপ শইকীয়া, প্রবীণ লোক। উনি এ-পাড়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। মায়ং-এর তন্ত্র-মন্ত্রের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় উনি ৫০ বছর আগের একটি কাহিনী বললেন। বাঘ বাঁধার মন্ত্র! গ্রামে বাঘ পড়লে সবাই ওঝার শরণাপন্ন হতেন। ওঝা মশাই দিনের বেলায় বাঘ ঝোপে ঝাড়ে ঢুকলে মন্ত্র বলে বেঁধে দিতেন। তখন বাঘ আর বন থেকে বের হতে পারত না। তখন সবাই মিলে বাঘ তাড়াতে শুরু করত। বনের একধারে থাকত ফাঁদ। বাঘ ফাঁদে পড়লেই গ্রামকে গ্রাম ছুটত বাঘ দেখতে।

বর্তমান তন্ত্রমন্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় উনি এই অঞ্চলে তেমন ওঝা না থাকার কথা বলেন। জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, অনেক ওঝাই অসমের পথেঘাটে দাবি করেন যে তিনি মায়ং থেকে শিখে গেছেন এবং সর্পাঘাতে মরা রোগী বাঁচাতে পারেন। আপনি কি আপনার জীবনে কখনও সর্পাঘাতে মরা রোগী বাঁচাতে দেখেছেন ?—না, তা দেখি নি। আমাদের এখানেই মাস দুই

আগে একটি মেয়ে মারা গেছে। তাকে তো সারানো গেল না।

—আচ্ছা, খানিকক্ষণ আগে আপনাদের এ-অঞ্চলের প্রধান ওঝার সাথে কথা হলো। ওনার বিষয়ে কিছু বলবেন ?

—দেখুন, উনি আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। কিন্তু ওনার পারদর্শিতার উপর আমার কোন বিশ্বাস নেই। কেন না বারবার ওনার গণনা ভুল হয়েছে। একবার আমার একটি মোষ হারালো। সাত দিন খোঁজ না পেয়ে সেই ওঝাকে ডাকলাম। উনি 'নখ দেখে' বললেন—এ মহিষ 'পুবিতরা অভয়ারণ্যে'র ভেতর আটকা পড়ে গেছে। ওঝার কথা শুনে আমাদের মুখ গেল শুকিয়ে—কেন না ওখানে গণ্ডারের ঘাঁটি। ওখানে যাওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু। অবশেষে দু-টি ছেলে দু-টি মোষের পিঠে চড়ে মোষ খুঁজতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। এমন সময় পাশের গ্রামের একজন লোক এসে বললো তার বাড়িতে তিন দিন হলো মোষটি বেঁধে রেখেছে। ওঝার মন্ত্র বা গণনা ভুল প্রমাণ হলো।

দ্বিতীয়বার একটি বড় কাঁসার বাটি হারিয়েছিল। উনি বেত চালিয়ে বাড়ির পেছনের পুকুরে বাটিটি আছে বলে বসলেন। বর্ষাকাল। ২০/২২ ফুট জলে ৮ জন লোক সারা পুকুর তোলপাড় করে। বাটি পাওয়া গেল না। পরের বার ধানক্ষেত চাষ করবার সময় লাঙ্গলের ফালের সাথে মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে এলো সেই বাটিটি। ধান রোপণের সময় চা খাওয়ার পর ক্ষেতেই বাটিটি ফেলে রেখে আসায় আস্তে আস্তে ওটা কাদার মধ্যে ঢুকে যায়।

—আপনি কি কখনো মানুষকে মন্ত্র-বলে ভেড়া করা, ছেলেকে মেয়েতে রূপান্তরিত করা বা অন্যান্য অলৌকিক কিছু দেখেছেন ?

উত্তরে গ্রামের মোড়ল সরাসরি বললেন—না।

সেদিন রাত্রে আরও কয়েকজনের সাথে কথা হলো, তারা সবাই বললেন—শোনা যায় একসময় মাঁয়ং-এ মন্ত্রতন্ত্র ছিল, কিন্তু এখন নেই।

কথা প্রসঙ্গে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা তুললাম। শ্রীযুক্ত শইকীয়া বললেন : গ্রামের মানুষ প্রায় সবই কৃষিজীবী। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরও তারা দু-বেলা পেট পুরে ভাত খেতে পান না। একদিকে বন্যা, অন্যদিকে উন্নত কৃষি পদ্ধতির অভাব। বন্যজন্তুর উপদ্রবেও ক্ষেতের শস্যহানি হয়। বিকল্প কর্ম-সংস্থানের সুযোগ না থাকায় গ্রামের মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে দিন যাপন করছেন। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের বাধ্য করেছে তন্ত্র-মন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হতে। গ্রামের একমাত্র সরকারি চিকিৎসালয়েও প্রায়ই চিকিৎসক থাকেন না। গুয়াহাটী বা নগাঁও গিয়ে চিকিৎসা করানোর সামর্থ ক-জনেরই বা আছে ?

ওঝাদের অর্থ নৈতিক অবস্থাও শোচনীয়। শিক্ষাগত যোগ্যতাও খুবই নিচু। তাই তারা জীবনধারণের এক উত্তম উপায় হিসাবে নিয়েছেন—এই ব্যবসা।

পরের দিন আমরা বের হলাম কামারপুরের উদ্দেশ্যে। প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরত্ব। একজন রিটায়ার্ড শিক্ষক কামারপুর বেসরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ চালাচ্ছেন। ওনাকে জিজ্ঞাসা করলে, উনি মন্ত্রতন্ত্রের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

—আপনি স্বচক্ষে কখনো দেখেছেন কি ?—আমি প্রশ্ন রাখলাম।

—কিছু তো আমি নিজেই জানি।

—যেমন ?

—যেমন, পিঠে নষ্ট করা, কেউ পিঠে ভাজতে থাকলে আমি মন্ত্র-বলে পিঠে নষ্ট করতে পারি।

—কখনো প্রমাণ করেছেন কি ?

—আমাকে তো পিঠে ভাজার সময় কেউই রান্না ঘরে যেতে দেয় না। তাই প্রমাণ করি কি করে ?

কামারপুর থেকে বলংপার। হাটের দিন। বেশ লোকের সমাগম। সেখানে দেখা হয়ে গেল একজন স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীর সাথে। উনিও মন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে বিশ্বাসী। তবে সর্পাঘাতে মরা লোক বাঁচাতে তিনিও দেখেন নি, জানালেন।

ফেরার পথে মায়ং হাইস্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকের সাথে দেখা হয়ে গেল। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ার দায়িত্ব তার রয়েছে। তিনিও মন্ত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করেন। তবে তিনি জানালেন, 'সর্পাঘাতে মৃত লোক জীবিত হয়—একথা বিশ্বাস করি না। কেননা একবার রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হলে তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।'

আমরা মায়ং সরকারি চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ডাঃ তোলেশ্বর নাথ মহাশয়ের সাথে দেখা করলাম। তিনি জানালেন যে, তার মন্ত্র-তন্ত্রের ওপর কোন আস্থাই নেই।

—কিন্তু ওঝারা সাপে কাটা রোগী কি করে বাঁচান বা সুস্থ করে তোলেন ?

তিনি জবাবে বললেন, 'বেশির ভাগ সাপের বিষ নেই। সাপে কাটার সাথে সাথে আমরা মৃত্যুভয়ে মূর্চ্ছা যাই। কিছু সময় পর আবার অবস্থা স্বাভাবিক হয়। এই অচৈতন্য বা আচ্ছন্ন অবস্থার সময়টাতে ওঝারা তাদের কাজ শুরু করে। তাই অনেকে বিশ্বাস করেন যে ওঝাদের মন্ত্রবলেই বিষ নেমে আসে।'

তিনিও বাটি হারানোর মতো জিনিস চুরির কাহিনী এবং হুক-ওয়ার্ম (Hook warm) আক্রান্ত রোগীকে বাণ মারা, মানসিক ভারসাম্য হারানো রোগীকে 'ভূতে ধরা' বলে বিশ্বাস করতে দেখেছেন। তিনি বললেন, তার ও অন্যান্যদের চেষ্টায় অবশ্য বেশ কিছু 'বাণ মারা' এবং 'ভূতে ধরা' রোগী মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় না নিয়েই চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ হয়েছে। গ্রাম-গঞ্জে প্রচলিত জলপড়া সম্বন্ধে তিনি সুন্দর বর্ণনা দিলেন।—'প্রস্রাবের গণ্ডগোল দেখা দিলে প্রায়ই চিকিৎসকরা ঠাণ্ডা জল খেতে বলেন। আপনি শুধু লোক দেখিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র বলে জল পড়ে দিন। সকালে বিকালে সে জল পান করলে স্বাভাবিকভাবেই রোগীর রোগ সেরে যাবে। আপনিও ভাল ওঝা হিসাবে নাম করে নিতে পারেন।'

মাস দুয়েক পূর্বে সর্পাঘাতে উত্তরা শইকীয়ার মৃত্যু হয়। এ সম্বন্ধে জানতে শ্রীকালীপ্রসন্ন শইকীয়া মহাশয়ের বাড়ি যাই। শীতের রাতে তিনি আগুনের পাশে বসেছিলেন। আমরা যাওয়াতে উঠে এলেন। সম্পর্কে তিনি উত্তরার কাকা। পাশেই উওরাদের বাড়ি। তিনি জানালেন, 'বিশ্বকর্মা পুজোর ১০/১২ দিন আগের কথা। উত্তরা স্কুল থেকে এসে ভাত খেয়ে মেঝেতে শুয়েছিল। হঠাৎ জেগে উঠল। পায়ে কি যেন ফুটল। একটা কালো সাপ চলে যেতে দেখেই সে বুঝতে পারল ব্যাপারটা। চিৎকার দিতেই সবাই ছুটে এলো এবং মেঝের কোণে একটি গর্তের মধ্যে সাপটা ঢুকে যেতে সবাই দেখল। কালো সাপ। সবাই ভাবল বিষ নেই। কিন্তু উওরা পা-টা ভাল করে বেঁধে ফেলল। মাকে জানালো—তার মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। ভয়ে ওরকম হচ্ছে বলে ভাবলেও ওঝা ডাকতে লোক পাঠানো হলো। ইতিমধ্যে বিষ পরীক্ষার কাজ শুরু হয়ে গেল। লবণ, চিনি, মরিচ খেতে দিয়ে স্বাদ জিজ্ঞাসা করলে সঠিক উত্তর পাওয়া গেল। উত্তরা জানাল তার চোখ দুটো জ্বালা পোড়া করছে। তাই ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা হলো। ইতিমধ্যে একজন ওঝা গাছের পাতা নিয়ে এসে মেয়েটির চোখে পাতার রস দিল। উনি বললেন, বিষ থাকলে চোখে ধরবে। কিন্তু চোখ ধরল না। ওঝাদের সব পরীক্ষা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে উপস্থিত এগারজন বিশিষ্ট ওঝার সামনেই, ওঝার দেশেই অষ্টাদশী সুন্দরী মেয়ে উত্তরা চিরদিনের জন্য চোখ বুজল। মৃতদেহটি নিয়ে ওঝারা বিভিন্ন মন্ত্র-বলে বিষ নামানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। মৃত্যুর তিনদিন পরে উত্তরাকে বাঁচানোর কোন সম্ভাবনা না থাকায় মৃতদেহটি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হলো।'

—আপনি কি তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাস করেন?—আমি কাহিনী শোনার পর জানতে চাইলাম।

—'না, এসব দ্বারা কিছু হবে বলে আমি মনে করি না।' দৃঢ়ভাবেই তিনি বললেন। উল্লেখযোগ্য, স্থানীয় লোকের ভেতর একমাত্র কালীবাবুই ব্যতিক্রম দেখলাম, যিনি মন্ত্রশক্তির ওপর আস্থা রাখেন না।

মায়ং আসার পূর্বে আমি ধরে নিয়েছিলাম যে কোন যাদুমন্ত্রের কারসাজি আমি দেখতে পাবো। কেন না অসমের সাধারণ লোকের এই জায়গাটা সম্বন্ধে এত ভয় রয়েছে, তার ভিত্তি নিশ্চয়ই কিছু আছে। কথা প্রসঙ্গে মায়ং-এর এক যুবক বন্ধু বললেন, কাছের একটি সরকারি চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক মায়ং-এর নাম শুনে তার অসুস্থ মাকে দেখতে আসতে অস্বীকার করেছিলেন। অবশ্য অনেক বোঝানোর পর তিনি আসেন এবং সব দেখে-শুনে তার মনের দ্বিধা-ভয় চলে যায়।

উপসংহারে বলা যায় যে, 'যাদুর দেশ' মায়ং ভারতের অন্যান্য জায়গার মতোই একটি সাধারণ জায়গা। এখানে অলৌকিক কোন কাজ হয় না। বাইরের যে কোন লোকই স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন। ভেড়া বনবার কোন সম্ভাবনাই এখানে নেই।

প্রতিবেদক অসমীয়াভাষী। বাংলা রচনায় অভ্যস্ত নন। মূল রিপোর্ট কিছুটা পরিমার্জিত করা হয়েছে। —স.ম.]

সত্যরঞ্জন কুণ্ডু

জুন ১৯৮৪

সন্ত অ্যানটনির রোষ

খুব প্রাচীনকাল থেকেই ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মাঝে মাঝে এক বিচিত্র মহামারী দেখা দিত। এর প্রকোপে হাজার হাজার ব্যক্তির মৃত্যু ঘটত। মহামারীতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দু-ধরনের লক্ষণ দেখা দিত। সমস্ত শরীরে অসহ্য জ্বালা ও যন্ত্রণা, বমি, হাত পায়ে অসহ্য ব্যথা, আঙুলগুলোতে ঝিনঝিনানি। পরে হাতে-পায়ের আঙুলগুলো শুকিয়ে পোড়া কাঠের মতো হয়ে শরীর থেকে খসে পড়ত। গর্ভবতীর সন্তান নষ্ট হয়ে যেত। আক্রান্ত ব্যক্তিদের অনেকেই মারা পড়ত। অনেকের আবার এই সব লক্ষণ দেখা না দিয়ে আরম্ভ হতো খিঁচুনী (convulsion), পরিণাম ছিল অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। যারাই প্রধান খাদ্য (staple food) হিসেবে রাই (Rye) দানার তৈরি রুটি ব্যবহার করত তারাই এই মহামারীর কবলে পড়ত; অন্যদের মধ্যে এ-রোগ প্রায় দেখাই যেত না। অসহায় মানুষ এই মহামারীর কারণ খুঁজে পেত না। হাত পায়ের আঙুল পোড়া কাঠের মতো হয়ে যাওয়ার ব্যাপার থেকে তারা খুব সহজেই ধরে নিয়েছিল যে মহামারী হল তাদের পাপের পরিণাম অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তিরা পাপের ফলে রুষ্ট ভগবানের কোপে পড়েছেন। ভগবানের রোষে আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাত-পা পুড়ে কাঠ হয়ে গেছে বা অন্যান্য লক্ষণগুলো দেখা দিয়েছে। এই মহামারীর আর এক নাম ছিল 'পবিত্র অগ্নি (Holy Fire)'। ভগবান তার পবিত্র আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে পাপীদের পাপ মুক্ত করতে চেষ্টা করছেন—হয়ত যারা খুব বেশি রকম পাপী (মহাপাতকী) তাদের কপালে জুটছে মৃত্যু।

সেই যুগে এক্ষেত্রে যা হওয়া স্বাভাবিক তাই ঘটত অর্থাৎ দলে দলে লোকে মন্দিরে, গীর্জায় জমা হতো—প্রার্থনা করত রোগমুক্তির। পরবর্তীকালে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীতে ভিয়েনের কাছে (দঃ-পূঃ ফ্রান্স) সন্ত অ্যানটনির (St. Anthony) গীর্জা যখন স্থাপিত হলো তখন দেখা গেল, ঐ গীর্জায় প্রার্থনা জানালে বেশ উপকার হচ্ছে। সারা মহাদেশে তখন ঐ 'জাগ্রত থানের' খবর ছড়িয়ে পড়ল। এরপর থেকে ইউরোপের কোথাও ঐ ধরনের মহামারী দেখা দিলেই দলে দলে লোকে সন্ত অ্যানটনির গীর্জায় হাজির হতো। নিজের দেশ থেকে ঐ গীর্জার দূরত্ব হয়ত কয়েক শ'-মাইল তবুও ঐ জাগ্রত থানে যাওয়া চাই-ই। সন্ত

অ্যানটনির গীর্জার নাম এতো ছড়িয়ে পড়ল যে, পরবর্তীকালে অনেকে ঐ মহামারীর নামকরণ করল সন্ত অ্যানটনির অগ্নি বা রোষ। আর সন্তের রোষ কমানোর জন্য, তার মনোরঞ্জনের জন্য, মহামারীতে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে তার গীর্জায় যাওয়া অবশ্য-কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। শত শত মাইল পথযাত্রার ধকল সইতে না পেরে অনেকে রাস্তায়ই মারা যেত। যারা গীর্জায় পৌছাত তাদের মধ্যেও কিছু মারা যেত, বাকিরা বেশ কিছু দিন ধরে গীর্জায় থেকে গিয়ে ভালো হয়ে নিজের দেশে ফিরে আসত।

যুগে যুগে পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা যা দেখতে পাই এ ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। 'বেয়াড়া' ধরনের একদল লোক পৃথিবীর সব জায়গাতে সর্বকালে দেখা যায়, যারা কার্যকারণের চিরাচরিত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হন না। ভগবানের রোষে মহামারীর উৎপত্তি এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে, তারা মহামারীর কারণ খুঁজতে থাকেন। অবশেষে ডোদার্ট (১৬৭৬) এবং ব্রুনার (১৬৯৬) এই মহামারীর কারণ খুঁজে পান। তারা দেখেন যে, ঐ মহামারীর লক্ষণগুলোর জন্য দায়ী হলো রাই-এর মধ্যে আরগটের (Ergot) উপস্থিতি।

রাই (Rye) হলো ঘাস জাতীয় একরকম শস্য। ইউরোপে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে রাশিয়ায় প্রচুর রাই-এর চাষ হতো। এই রাইতে যখন ফুল আসে তখন যদি Claviceps জাতীয় একরকম ছত্রাকের (fungus) আক্রমণ হয়, তবে ঐ ছত্রাক রাইফুলের ডিম্বকোষে আশ্রয় নিয়ে আস্তে আস্তে ঐ ফুলটাকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। যখন ফুলটা খাওয়া হয়ে যায়, খাবারে টান পড়ে তখন ঐ ছত্রাকের দেহ শুকিয়ে গিয়ে শক্ত (sclerotium) লবঙ্গের আকার ধারণ করে শীষে লেগে থাকে। একেই আমরা বলি আরগট। আরগট প্রধানত রাইতে পাওয়া গেলেও অন্যান্য শস্যদানা যেমন গম, যব, ইত্যাদিতেও মাঝে মাঝে পাওয়া যেতে পারে। আরগট-চূর্ণ বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে প্রসবের সময় প্রসব ব্যথাকে বাড়িয়ে সন্তান জন্মের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে ব্যবহার হচ্ছে (যদিও পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে, এরকম ব্যবহার মা ও গর্ভস্থ সন্তান উভয়ের পক্ষেই দারুণ ক্ষতিকর)।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরগটের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু নতুন অ্যালকালয়েড-এর সন্ধান পেয়েছেন। তাছাড়া হিস্টামিন, এল এস ডি জাতীয় পদার্থও আরগটে পাওয়া গেছে। আরগটে যে সব অ্যালকালয়েড আছে তাদের মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—একদলে পড়ে অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যালকালয়েড (যেমন আরগোটামিন) —যাদের সামান্য

মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করালে শরীরের সমস্ত রক্তবাহী নালী (ধমনী ও শিরা), অত্যধিক সঙ্কুচিত হয় এবং বেশ কিছুক্ষণ সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে এবং বমি পায়। বেশি মাত্রায় অথবা বারে বারে প্রয়োগ করলে শরীরের রক্ত চলাচল বিশেষ করে যে সব জায়গায় (যেমন হাতে, পায়ে) স্বাভাবিকভাবে রক্ত চলাচল (প্রবাহ) তুলনামূলকভাবে কম, সেই সব জায়গায় রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়—রক্ত চলাচলের অভাবে সেই অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গে পর্যায়ক্রমে ব্যথা, জ্বালা ও পচন (Gangrene) শুরু হয়—শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়ে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আবার অন্যদের এই সব লক্ষণ দেখা না দিয়ে, কেবলমাত্র খিঁচুনী দেখা দেয়, পরে মৃত্যু হয়। এই জাতীয় আরগট অ্যালকালয়েড খুব সামান্য পরিমাণে আধকপালী (Migraine) অসুখে এখনও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আরগটে অন্য যে-ধরনের অ্যালকালয়েড (আমিন জাতীয়) আছে (আরগো-মেট্রিন) সেটা শরীরে প্রবেশ করালে গর্ভবতী পশু বা গর্ভবতী মহিলার জরায়ুর পেশী বেশ জোরে ও দীর্ঘসময় ধরে সঙ্কুচিত হয়। প্রসবের আগে ব্যবহার করলে গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হতে পারে, গর্ভপাত হতে পারে, এমন কি মায়ের মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়। এই জাতীয় অ্যালকালয়েড এখন কেবলমাত্র সন্তান প্রসবের পরে রক্তস্রাব বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মোটামুটিভাবে তাহলে জানা গেল যে, আরগটের মধ্যে বেশ কিছু অ্যালকালয়েড আছে যেগুলো রক্ত চলাচল (প্রবাহ) কমিয়ে দিতে পারে, শরীরে পচন ধরাতে পারে এবং গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটাতে পারে। এবার তাহলে আমরা আবার কাহিনীর গোড়ায় ফিরে যাই।

মহামারীর কারণ হিসেবে তাহলে এখন আমরা বলতে পারি, যে কোন ভাবে রাইফুলে যদি Claviceps জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণ হতো তবে সেটা মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কারণ তখন না ছিল শস্যে ছত্রাক আক্রমণ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং না ছিল গাছের (শস্যের) রোগের ওষুধ। ঐ সব আক্রান্ত রাই গাছে প্রচুর পরিমাণে আরগট তৈরি হতো। আরগট মিশ্রিত রাই-এর তৈরি রুটি বেশ কিছুদিন ধরে খেলে শরীরে বেশ ভালো পরিমাণে আরগটের অ্যালকালয়েডগুলো ঢুকত। যার পরিণাম মহামারীর আকারে পূর্বে বর্ণিত সব লক্ষণগুলোর প্রকাশ—জ্বালা, যন্ত্রণা, হাতে-পায়ে পচন, আঙুলগুলো শুকিয়ে কালো হয়ে খসে পড়া, গর্ভবতীর গর্ভপাত ; স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হাজার হাজার লোকের অকাল মৃত্যু। 'ভগবানে'র বা 'সন্ত অ্যানটনি'র রোষের কারণে মহামারীর আগমন —এই যুক্তি এইভাবেই অসার বলে প্রমাণিত হলো।

সন্ত অ্যানটনির গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা জানালে রোগ মুক্তি ঘটত এর কারণ কি ? আগেই আমরা জেনেছি যে দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের ভিয়েনে সন্ত অ্যানটনির গীর্জায় যেতে লোকেদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হতো। এই দীর্ঘ পথযাত্রায় যারা বেশি পরিমাণে রোগাক্রান্ত তারা খুব সম্ভব মারা পড়ত। যারা সামান্য আক্রান্ত তারা পথযাত্রার সময় পথের ধারে যেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত, তাতে আরগট না থাকার সম্ভাবনা। উপরন্তু সন্তের গীর্জায় গিয়েও তারা আর রাইয়ের রুটি পেত না। বেশ কিছুদিন ধরে তারা সেখানে আস্তানা গেড়ে থাকত এবং আরগট বিহীন অন্য কোন শস্যের (যেমন গম, যব) রুটি খেত, যার ফলে ধীরে ধীরে শরীর থেকে বিষ (আরগট অ্যালকালয়েডগুলো) বেরিয়ে যেত, নতুন করে আর ঢুকত না। আস্তে আস্তে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠত, দেশে ফিরে আসত, জাগ্রত থান হিসেবে সন্ত অ্যানটনির গীর্জার নাম ছড়িয়ে পড়ত। সে-যুগে কেন, এ-যুগেও এ ধরনের 'জাগ্রত থানের' মহিমা এভাবেই ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সূত্র : 1. *Drugs, Medicines and Man* : Harold Burn, Unwin University Book, London

2. Goodman & Gilman's : *The Pharmacological Basis of Medical Pracitce*, 6th Edition, 1980

পীযূষকান্তি সরকার

মে ১৯৮৩

পুনার দরগায় পাথর রহস্য

'মহারাষ্ট্রের পুনায় এক জাগ্রত পীরের দরগা আছে, সেখানে রয়েছে মস্ত ভারি এক পাথর। এমনিতে সে-পাথর টলানো দায় কিন্তু তাতে আঙ্ুল ঠেকিয়ে আকণ্ঠ বিশ্বাসে দরবেশের নাম সজোরে উচ্চারণ করলে পাথর আপনা-আপনি মাটি ছেড়ে শূন্যে ভেসে ওঠে।'

কথাটা প্রথম শুনেছিলাম আমার এক আত্মীয়-বন্ধুর কাছে বছর পাঁচেক আগে —পুনায় কর্মসূত্রে গিয়ে তিনি ওই দরগার কথা শুনেছেন। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় নি। একটা ছোট পাখির পালকও যেখানে আপনা-আপনি শূন্যে উঠে যেতে পারে না সেখানে বিরাট ভারি এক পাথর…কীভাবে সম্ভব? বস্তুবাদী চিন্তার গোঁড়ামি নয়, সাধারণ বুদ্ধিতে অবিশ্বাস্য বলেই তখন কানে শোনা কাহিনীটা অগ্রাহ্য করেছিলাম। ব্যাপারটা বাস্তবিক ভাবিয়ে তুলল ১৯৭৯ সালে। সে বছর ১৬ই মে সংখ্যার 'পরিবর্তন' পত্রিকায় পড়লাম পুনার অলৌকিক পাথরের কথা—'আঙুলের ছোঁয়ায় যে পাথর শূন্যে ভাসে'—এই শিরোনামে; প্রতিবেদক শ্রীবিকাশ তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার দাবিকে সামনে রেখে লিখেছেন ৬০ কিলো আর ৯০ কিলোগ্রাম ওজনের দুটো 'বিস্ময়কর' পাথরের কথা যেগুলো ৭ জন বা ৯ জনের আঙুলের ছোঁয়া আর 'কামার আলীশা দরবেশ' নামের চিৎকারে মাথার ওপরে ভেসে ওঠে। জাগ্রত দরবেশের নাম-মাহাত্ম্য ছাড়া আর কোন যুক্তি নাকি এখানে খাটে না—ঐ প্রতিবেদকের ভাষায় 'এমন অলৌকিক ঘটনা যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিয়ে আজো হয় নি।'

ভাববার মতো বিষয় বৈ কি! 'পরিবর্তন'-এর মতো বহুল-প্রচারিত একটি পত্রিকায় কোনরকম বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ ছাড়াই যেভাবে দরগার আজব পাথরের অলৌকিকতাকে তুলে ধরা হয়েছে তাতে ভ্রান্তবিশ্বাস ছড়ানোর সুযোগ রয়েছে খুব [রচনাটিতে অনেক অসঙ্গতি, অনেক ফাঁক, অনেক সংশয়ের জায়গা রয়েছে, সে-বিষয়ে আলোচনা করা যাবে বর্তমান প্রতিবেদনের শেষে]।

মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপার আজ অল্প শিক্ষায় শিক্ষিত লোকটিও বোঝে, নিউটন নামক সাহেব-বিজ্ঞানীকে ধরে টানাটানি করতে হয় না। কোন প্রকারে ওপর

দিকে টান বা ঠেলা না পেলে কোন বস্তুই আপনা-আপনি ওপরে উঠে যেতে পারে না। হাত থেকে বাটি পড়ে যায়, গাছ থেকে পাতা পড়ে, এমনকি ধুলোবালিও ধীরে ধীরে নেমে আসে মাটিতেই—জ্ঞান হওয়া ইস্তক এরকম অসংখ্য প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় মাধ্যাকর্ষণের নিম্নমুখী টান সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত, এই প্রাকৃতিক নিয়মের কোন বিকল্প তত্ত্ব আমদানির সুযোগ নেই। এমন অবস্থায় পুনায় ওই পাথরের কাহিনীকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে গেলে মনের ভেতর বাদ সাধবে অনেকেই, যেমন সাধবেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী – তার ষাট বছর আগেকার বক্তব্য পুনরায় উচ্চারিত হবে :

'যেদিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূ-পৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।' (নিয়মের রাজত্ব, ১৩২৯)

কিন্তু দরগার ব্যাপারটা তাহলে কী? ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য লাগছে না বলেই তা বর্জনীয়—এমন চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলে ধর্মীয় গোঁড়ামির মতোই বৈজ্ঞানিক সংস্কারেরও শিকার হতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা মনের ধন্ধ কাটে না, অথচ সঠিক তথ্যগুলিও পাওয়া মুশকিল।...এভাবে অতৃপ্তি আর 'কনফিউশন' জমা হচ্ছিল। গত বছরে আমার এক প্রতিবেশী (দেশ ঘুরে বেড়ানো যার নেশা); মহারাষ্ট্রের এক বন্ধু এবং আরো কয়েকজনের কাছে দরগা-দরবেশ-ভাসন্ত পাথরের একই কাহিনী শুনলাম, শুনলাম তাদের গভীর বিশ্বাস মেশানো চমকপ্রদ বিবরণ।

সরাসরি অনুসন্ধানের সুযোগ এলো ১৯৮৩তে। পুনা শহরে আসা হলো ঘটনাচক্রে। যে-কদিন ছিলাম পুনায় তার মধ্যেই লক্ষ্য করেছি— হোটেলের বয়, বাসের কণ্ডাকটার, অটো-চালক, রাস্তার ভবঘুরে, ডিফেন্স ফ্যাকট্রির কারিগরী কর্মী, বিজ্ঞানী—প্রায় সবাই জানে দরগার কথা, 'ব্যাখ্যার অতীত' পাথর ভাসার কথা। ডিফেন্স লেবরেটরীর উচ্চপদস্থ এক দক্ষিণ-ভারতীয় প্রযুক্তিবিদের সঙ্গে অনেকক্ষন আলাপ হয়েছে এ-নিয়ে। তিনি নিজে পাথরে আঙুল ঠেকিয়ে চমৎকৃত হয়েছেন ; তার দুজন মারাঠী সহকারি বিজ্ঞান-কর্মীও প্রবল সম্মতিতে মাথা ঝাঁকালেন। আশ্চর্য ব্যাপার! বস্তু-বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির তত্ত্ব নিয়ে যাদের নিত্য কারবার, কামার আলীর দরগায় গিয়ে তাদের সেই বিজ্ঞানচর্চার পদ্ধতি অকেজো হয়ে যায়। বললাম—আপনারা কি জানতে চান নি কিভাবে স্রেফ দরবেশের নামের জোরেই মাটি ছেড়ে উঠছে অত ভারি একটা পাথর?

—কী জানবো, কার কাছেই বা জানতে চাইব ?

—কেন, অন্তত নিজের মনের কাছে ? নিজের বাস্তব বিচারবুদ্ধির কাছে ?

—না চাই নি। বহুকাল ধরেই শুনছি ওটা হয়। দেখলামও তাই হয়, ব্যস্। সামথিং মাইট বি দেয়ার হুইচ উই কান্‌ট্‌ মেক আউট (হয়তো কিছু একটা আছে যা আমাদের কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়)।

এখানেই বিপদ। শিক্ষিত বিজ্ঞানজানা মানুষেরাও যদি—'সব্বাই করে বলে সব্বাই করে তাই' মার্কা চিন্তার স্থবিরত্ব নিয়ে বসে থাকে তাহলে সাধারন মানুষের চিন্তা গুটিয়ে পঙ্গু হয়ে যাওয়াটা আর আশ্চর্যের কী ? এক বাঙালী তরুণের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো পুনায়। কথাবার্তায় বেশ চৌকশ। ঝোঁকের সঙ্গে বলল,

—আচ্ছা দাদা ; আপনি সাউণ্ড এনার্জির কথাটা ভাবছেন না কেন ? পাথরে আঙুল ঠেকিয়ে ওই যে সবাই 'দরবেশ' বলে চেঁচাচ্ছে সেই সাউণ্ড ওয়েভের ধাক্কায় মাধ্যাকর্ষণ মানে গ্র্যাভিটেশনের বিপরীত একটা ফোর্স যদি আসে তাহলে তো…ব্যাপারটা কি অসম্ভব ? হতেও তো পারে, না কি ?

এই আর এক মুশকিল। বিজ্ঞানের দুটো চারটে খুচরো পরিভাষা আর 'অল্পবিদ্যা' নিয়ে ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে ফেলার অপচেষ্টা অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। এরকম অর্দ্ধশিক্ষার জালাতনে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি আরো ঘুলিয়ে যায়। তরুণ বন্ধুটিকে বললাম,

—ভাই, ওভাবে বিজ্ঞানের কোন একটা নিয়ম যেখানে খুশি লাগিয়ে দেওয়া যায় না। চিৎকার বা শব্দ একটি শক্তি ঠিকই কিন্তু পাথর তোলার যান্ত্রিক শক্তি (mechanical energy) কোন 'শব্দে'র মধ্যেই নেই। ওই দুই পৃথক শক্তির পরিমাপে কোন তুলনা চলে না। বস্তুবিজ্ঞানের প্রাথমিক নিয়মগুলো তো স্কুল-পাঠ্য বইতেই রয়েছে। পাথর বা কোন বস্তুকে মাটি থেকে উঠতে হলে তার একটা উর্ধ্বমুখী বল বা ঠেলা, অর্থাৎ যান্ত্রিক শক্তি লাগবেই ; যে কোন প্রকারেই হোক এই যান্ত্রিক বল প্রয়োজন, বিজ্ঞান তাই বলে।

তরুণটি আর মাথা ঘামায় নি, কিন্তু আমার মাথায় চিন্তা উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে যতক্ষণ না ঘটনাস্থলে হাজির হতে পেরেছি।

পুনা শহরের কেন্দ্র ডেকান জিমখানা। সেখান থেকে ১৯/২০ কিলোমিটার দূর, বাঙ্গালোর রোডের ওপর, খেড় শিবাপুর স্টপেজ। বড় রাস্তা থেকে নেমে মিনিট দশেকের আঁকাবাঁকা হাঁটা রাস্তা আপনাকে নিয়ে যাবে কামার আলী দরবেশের দরগায়—ছোট একটা পাহাড় বা টিলার ওপর পাঁচিল ঘেরা দরগা। এমনিতে এলাকাটা নির্জন, লোকবসতি খুবই কম। বাস থেকে নেমে ভুজিয়ার

দোকানে ঢুকলাম প্রাথমিক খোঁজখবরের আশায়, চা-পকোড়ার খরচাটা হলো দক্ষিণা। দোকানি বলল—'প্রত্যহ লোক আসে, আমীর গরীব হিন্দু মুসলমান সব। দরগার মাহাত্ম্যের কথা অনেক দূর মুলুকে ছড়ানো। বহু মানুষের রোগ দুঃখ আরাম হয়, মনের বাসনা পূর্ণ হয়, দরবেশের দোয়ায়।' অত্যন্ত করিৎকর্মা লোক। মুখের কথার সঙ্গেই দ্রুত হাতে ঘুরে যায় চা-মেঠাই-ভুজিয়ার প্লেট। লোকে পায়ে পায়ে ঢুকেও পড়ছিল তার দোকানে, অনেকটাই তার কথার আকর্ষণে।...দুম্ করে বলে ফেল্লাম—আচ্ছা ভাই, ভারি একটা পাথর মাটি থেকে উঠে যায় শুনেছি বাবার নামে, ইয়ে কেয়া সচ্ হায় ?

—হাঁ হোতা তো হায়! যাচ্ছেন তো, যান, গিয়ে দেখেই আসুন! কেউ বলতে পারে কি ঠেলে তোলা হয়। কিন্তু আঙ্গুল দিয়ে কি পাথর তোলা যায়, বলুন ?

কথাটা মনের মধ্যে লাগলো। এই প্রথম একজন স্থানীয় লোকের মুখে পাথর ঠেলে তোলার প্রসঙ্গ উচ্চারিত হতে শুনলাম। তবে কি সেরকম কোন সম্ভাবনা আছে ? জানি না, জানতে হবে।

অবশেষে সেই বহুশ্রুত দরগার দোরে।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। নিচে ফুল-মালা-ফটো আর ধূপের দোকান সারসার। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে উত্যক্ত করে তোলে দোকানির সাকরেদরা —ঠিক যেমন জ্বালাতন হয় কালীঘাটে, পুরীতে, কামাখ্যায়, কন্যাকুমারিকার মন্দিরে। দরগায় ঢোকার মুখে বাউণ্ডুলে, ভিকিরি, অন্ধ-খঞ্জের দলাপাকানো ভিড়। চতুর্দিক সরগরম, ব্যবসাকেন্দ্রের মত,—টাকা-পয়সা লেনদেন যে ভালোই হয় তা প্রথম নজরেই বোঝা যায়।

ওপরে দরগার চত্বর বেশ পরিচ্ছন্ন। মাঝখানে মাজার গৃহ—রঙীন চাদরে ঢাকা দরবেশের সমাধি রয়েছে ভেতরে। বাঁ দিকে লম্বা শেড্-এর থামগুলোতে বাঁধানো ফটো ঝুলছে—দরগার মাহাত্ম্য কীর্তন করে গণ্যমান্য ব্যক্তির সার্টিফিকেট আর অলৌকিক পাথরের ছবি। সত্যিই চমকে যেতে হয়। কয়েকজন লোক মাথার ওপর আঙুল তুলে রয়েছে আর আঙুলের ডগায় ভাসছে সেই পাথর। পরপর অনেকগুলি এরকম ছবি টাঙানো, বিভিন্ন পোজ্-এ। ছবি নাকি মিথ্যে বলে না, তাহলে ?

এবার দেখলাম কাহিনীর নায়ক সেই পাথরকে, একটি নয়, দু-টি। প্রায়-গোলাকার ভারি বেলে পাথর, মাজারের ঠিক সামনেটায় পড়ে আছে মাটিতে। বড় পাথরটা হাতখানেক চওড়া (ব্যাস বা diameter), একফুট খানেক উঁচু,

ওজন হবে আন্দাজ ৭০কে জি (২ মনের মতো) ; ছোট পাথরটা চওড়ায় একফুট, ৮/১০ ইঞ্চি উঁচু আর ওজন হবে ৪০/৫০ কে জি (এক/সোয়া-এক মনের মতো)। দু-হাতে ধরে আন্দাজ করে নিলাম ওজনটা।...পাথর দুটো ওখানে এলো কি করে? তা নিয়েও বিভিন্ন কাহিনী, নানান পৌরাণিক বিশ্বাস, পরস্পরে মিল নেই। শুভ্র দাড়ি-গোঁফে নাকমুখ ঢাকা এক মোল্লাসাহেব বললেন—ছ-'শ বছর আগে মদিনা থেকে এসেছিল কামার আলী দরবেশ। পাথর দুটো আসলে দুই শয়তান, বড় অত্যাচারী ছিল ; দরবেশের অভিশাপে তারা আজ পাষাণ হয়ে ধুলোয় গড়ায়, কেবল দরবেশের নামেই তাদের উত্থান হতে পারে। নক্সাদার টুপি পরা আধ-পাগলা এক ফকির বলল—দরবেশের সময়কাল কেউ জানে না, তিনি এই শিবাপুরেরই লোক, কয়েক পুরুষের বাস। পাথর দুটো নাকি কামার আলীর স্মৃতিচিহ্ন।

গিয়েছিলাম দুপুরবেলা। ঠা ঠা রোদ। খোলা চত্বরে দাঁড়ানো কষ্টকর। তার মধ্যেই পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে, মোটর গাড়িতে দর্শনার্থীরা আসছে। সত্যিই আমীর-গরীব একাকার (ভেদাভেদও আছে, মাজারে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ)। কিছু আচার-অনুষ্ঠানের পর সবাই প্রণামী বা নজরানা দিচ্ছে, দুঃখীদের দান খয়রাত করছে।

কয়েক ঘণ্টা সেখানে ঘোরাঘুরি করে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছি (অত সময় ধরে ধর্মস্থানে প্রশ্ন আর কৌতূহল নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কারণে গুরুতর সন্দেহের শিকার হতে হয়েছিল শেষদিকে)। নিয়ম হলো—বড় পাথরে ১১ জন আর ছোটটিতে ৯ জন পুণ্যার্থী আঙুল ঠেকিয়ে একযোগে তারস্বরে "কামার আলী দরবেশ" বলে ঝটিতি চিৎকার করবে, চারপাশের ছোটবড় পাহাড়ে অনুরণিত হবে দরবেশের পুণ্যনাম, তারই মাহাত্ম্যে পাথর উঠবে ওপরে। ভক্তি আর বিশ্বাসে যত জোরে আওয়াজ তোলা যাবে, পাথর উঠবে তত ওপরে ; যার মনে অভক্তি বা সংশয় থাকবে, পাপ থাকবে, গলা আটকে যাবে যার—পাথর হেলে পড়বে তারই দিকে। সুতরাং সাবধান।

বর্তমান প্রতিবেদককেও সাবধান হতে হয়েছিলো অন্য কারণে—যতদূর সম্ভব নিরীহ নিষ্পাপ (?) মুখ করে, অন্তর্লীন কৌতূহলের তরঙ্গকে মুখের পর্দায় না এনে নজর খোলা রাখতে হয়েছিল সর্বদা।

পাথর ওঠার প্রথম প্রদর্শনীতেই পরিষ্কার হয়—পাথর মোটেই **আঙুলের ডগায় ভাসে না**, ওপরে উঠে ধপ্ করে মাটিতে পড়ে যে কোন ভারি জিনিসের মতো। ফটোতে যে ভাসন্ত পাথরের চিত্র দেখা যায় [৭৬ পাতায়] সেটা ষ্টিল

ফটোর বৈশিষ্ট্যের জন্য হয়, অর্থাৎ মাথার ওপর পাথর ওঠার মুহূর্তে যদি ক্যামেরার শাটার টেপা যায়, তবে ছবিতে পাথরকে ভাসন্তই মনে হবে—সঙ্গে যদি ধর্মীয় প্রচার থাকে তাহলে তো আরো বেশি করে মনে হবে। সুতরাং চাইলে ফটোকে দিয়েও মিথ্যে বলানো যায় অনায়াসে।

এবং পাথরের এই ঝটিতি উত্থান ও নিরালম্ব অবস্থায় পতন দেখে, পরপর অনেকবার কাণ্ডটা খুঁটিয়ে লক্ষ করে, নিজেও কয়েকবার তাতে অংশ নিয়ে, আমি শেষ অবধি এই ধারণায় নিঃসংশয় হতে পারলাম যে—পাথর আদৌ আপনা-আপনি 'নামের জোরে' ভেসে ওঠে না **পাথরকে কৌশলে ঠেলে তোলা হয়** ওপরে, তুলে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমার এই ধারণা গড়ে তোলা ও সিদ্ধান্তে হাজির হওয়ার প্রক্রিয়াটি এবার পাঠকের মনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব থেকে যায়। সে চেষ্টাই করছি।

প্রথমেই একসঙ্গে যে প্রশ্নগুলো এসে যাবে তা হলো—পাথর নিজে থেকে না উঠলে তাকে তুলছে কে? পুণ্যসঞ্চয়ীরা তো আর ঠেলে তুলবে না! অত বড় পাথর তোলাই কি সম্ভব? আঙুলের আর কত জোর? এরমধ্যে আবার কোন্ কায়দা থাকতে পারে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

কৌশলে পাথর ঠেলে ওঠানোর দায়িত্ব নেয় দরগার স্বনিয়োজিত মস্তান, ফকির, বাউণ্ডুলে আর মোল্লার স্যাঙাৎরা যারা সর্বক্ষণ এ-ধার ও-ধার ঘুরে বেড়ায় প্রণামীর উচ্ছিষ্ট আর দান-খয়রাতের প্রত্যাশায়। এরকম পরজীবীরা সব ধর্মস্থানেই

থাকে, এখানেও আছে ; তবে দরগার এরা অতি ধুরন্ধর, নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াও খুব। যখনই কোন নতুন পর্যটক বা দর্শনার্থী পাথর ছুঁতে আসে মুহূর্তে আশপাশের আনাচ-কানাচ ফুঁড়ে এগিয়ে আসে ওরা। দর্শনার্থী সাধারণত ১-২ জনই হয়, ৯ বা ১১ জন পেতে গেলে ওই বাউণ্ডুলেদের সাহায্য লাগবেই। ওরা সবাই হাত লাগিয়ে "কামার আলী দরবেশ" নামের সঙ্গে একযোগে ওপরমুখো ঠেলা দিয়ে পাথর তুলে দেয় ; যিনি ওই দলে থেকেও পাথরে স্রেফ আঙুল স্পর্শ করেছিলেন পরম বিশ্বাসে তিনি পাথরকে ওপরে উঠতে দেখেই প্রাণভরা তৃপ্তিতে সাধ্যমতো টাকা-পয়সা বখশিস্ দিয়ে ফেলেন, পাথর ওঠার যৌক্তিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা তার মনে ঠাঁই পায় না।

দুটো পাথরেরই প্রায়-গোলাকার আকৃতিতে সমতা (uniformity) রয়েছে। পাথরের পরিধি বরাবর একযোগে আঙুলের ঠেলা দিলে মিলিত ঊর্ধ্বমুখী বল পাথরের ওজনের বিপরীতে কাজ করবে এবং পাথর উঠবে। এটাই স্বাভাবিক। আমি মোট ১০/১১ বার পাথর তোলা প্রদর্শনীর একনিষ্ঠ দর্শক ছিলাম (অভিসন্ধি অবশ্যই ছিল—রহস্য উদ্ঘাটনের অভিসন্ধি)। প্রত্যেকবার দেখেছি ৯ জন বা ১১ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৭/৮ জনই ছিল দরগার ওই লোকেরা। তাদের মিলিত আঙুলের উপরমুখী ধাক্কার তুলনায় পুণ্যার্থী ব্যক্তির 'চাপ না দেওয়া'র পরিমাণ নেহাৎই নগণ্য। যদি ঘটনাচক্রে দু-তিনজন নবাগত আঙুল-ঠেকিয়ে পাশাপাশি থেকে যায় তবে পাথর সেদিকটায় কম ঠেলা খাওয়ার দরুন টাল খেয়ে গড়িয়ে পড়ে ; তার ব্যাখ্যা মিলে যায় তক্ষুণি—বলাই তো আছে মনে পাপ থাকলে, যথেষ্ট ভক্তি না থাকলে, পাথর তারদিকেই হেলে পড়বে। এরকম দুটো কেস-এর আমি প্রত্যক্ষদর্শী—দু-বারই দেখলাম 'পাপিষ্ঠ' বলে চিহ্নিত ব্যক্তি মুখ কালো করে দরগা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

পাথর ঠেলে তোলায় মতলববাজির সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো—সবসময় আঙুল রাখতে হয় পাথরের নিচে ; ওপরে বা পাথরের গায়ে আঙুল ছুঁইয়ে রাখলে হবে না। স্পষ্টতই তলায় আঙুল না থাকলে উপরদিকে ঠেলাও দেওয়া যাবে না, পাথরও উঠবে না, দরগাবাসীর আয়ও কমবে। আমি একবার উদ্যোগীদের একজনকে বিনীতভাবে প্রস্তাব দিয়েছিলাম পাথরের ওপরে আঙুল ঠেকিয়ে দরবেশের নাম করতে। উত্তরে সন্দিগ্ধ চোখের ভর্ৎসনায় আমাকে বলা হলো—ওভাবে হয় না, ওটা নিয়ম নয়। সেই সন্দিগ্ধ চাহনি আরো ক্রুদ্ধ হয়েছিল পরে যখন বলেছিলাম—দরবেশের নামের জোরেই যদি পাথর ওঠে, তবে দেখা যাক না ২/৩ জনে প্রাণপণে চিৎকার করে পাথর ভাসানো যায় কি-না। প্রস্তাবটা যে ওদের

মনপসন্দ্ হয় নি সেটা ভালোমতন মালুম হলো মাথায় রুমাল বাঁধা চাপদাড়ি এক 'এজেন্টে'র লাল চোখের অসন্তোষ দেখে।...তবে না চাইতেই এক মোক্ষম পরীক্ষা হয়ে গেল ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই। সাদা একটা ফিয়াট গাড়ি করে ৬ জন এলো। অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের পর যথারীতি পাথরে আঙুল—৬ জনেই অংশীদার। অর্থাৎ দরগার দালালরা এবার সংখ্যালঘু। ফলত যা হবার তাই হলো—পাথর মাটি থেকে ফুট দেড়েক উঠেই ধপ্ করে পড়ে গেল। হৈ হৈ করে ছুটে এলো কাছে দাঁড়ানো মস্তানরা। আবার সেই অভক্তি আর পাপের কৈফিয়ৎ। ওই ছ-জনের মধ্যে চারজনই ভয়ে দ্বিতীয়বার আর আঙুল ছোঁয়াতে রাজি হলো না; সুতরাং এবার পোড়খাওয়া আঙুলের যাদুতে পাথর উঠল—ধর্মবিশ্বাসের জয় ঘোষিত হলো।

একটা সংশয় বোধকরি পাঠকের মনে থেকেই যাচ্ছে—সাংঘাতিক ভারি একটা পাথর আঙুলের চাপেই বা উঠবে কি করে?···পাথর দুটো ভয়ঙ্কর রকমের ভারি কিন্তু নয়। একটা ধারণা দেওয়া যেতে পারে। মুসলিমদের বিশ্বাস হলো, ওই পাথরের একটিকে কাঁধে তুলে মাঝখানের সমাধিগৃহ মাজারের চারপাশে এক পাক ঘুরে এলে গোপন মনবাঞ্ছা পূর্ণ হয়? দেখলাম, ১৮/২০ বছরের কৃশ চেহারার যুবক বড় পাথরটাকেও চোখমুখ লাল করে তুলে ফেলছে কাঁধে। তবু সন্দেহমুক্ত হওয়া মুশকিল, কেন না আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে খুব ভারি বস্তু আঙুলের চাপে তোলার অভিজ্ঞতা বড় একটা হয় না। আসুন, একটু হিসেব করা যাক। বড় পাথরটা ১১জন, ছোটটা ৯জন, গড়ে ১০ জনের মধ্যে যদি ৬০ কেজিকে ভাগ করা যায় তবে প্রতি আঙুলে ওজন আসার কথা ৬ কেজি। খট্‌কা লাগে, এক আঙুলে ৬ কিলো মাল তোলা তো সম্ভব নয় বলেই মনে হয়! আপাতদৃষ্টিতে তাই, কিন্তু এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো বলপ্রয়োগের পদ্ধতি। যে-ওজন আপনি ধীরে শক্তিপ্রয়োগ করে টেনে তুলতে পারছেন না সেটাই পারছেন হ্যাঁচ্‌কা টানে—এমন অভিজ্ঞতা নিশ্চই সবারই রয়েছে।

বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় ইমপালসিভ ফোর্স (impulsive force)। স্থিরভাবে প্রযুক্ত চাপ বা বল (force) দিয়ে যে কাজ পাওয়া যায়, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি কাজ মেলে যদি সেই বল ঝট্‌কা দিয়ে ইম্‌পালসিভ ফোর্স হিসেবে প্রযুক্ত হয়। ব্যাপারটা মেলানো যাবে পথচলতি অভিজ্ঞতা থেকে। বাজারের ঝাঁকামুটে বা ট্রেনে ভেণ্ডাররা মস্ত ভারি বোঝা ২/৩ জনে ঝপ্ করে তুলে দেয় একজনের মাথায়—বাড়তি জোরটা তারা নেয় "হুউপ্" বা "হেঁইও" আওয়াজ তুলে। কল-কারখানায় ভারি মাল তোলা-তুলি করে যারা তাদের

মুখেও শোনা যায়, ওই ঝাঁকি-দেওয়া "হেঁইও" বা ঐ জাতীয় আওয়াজ। মুখের ওই আওয়াজটা ইমপালস্ তৈরিতে সাহায্য করে।

অবিকল এই কাণ্ডটাই হয় পুনার দরগায়। হেঁইও আওয়াজের বদলে ওরা বলে 'কামার কালী দরবেশ'। যে কোন পর্যটকই খেয়াল করলে দেখবেন নামটা

অতি দ্রুত ঝাঁকুনির মতো উচ্চারণ করা হয়। ডাকটা হয় এরকম—"কামারালী-দরবে-এ-শ্", সময়কাল এক-দেড় সেকেণ্ড। ওটাই ইমপাল্স্—আঙুলের জোর বাড়ায়। গোটা দশেক ঝাঁকুনি-দেওয়া উর্ধ্বমুখী বল এভাবে একত্রে সক্রিয় হলে তখন আর প্রতি আঙুলে ৬ কেজির হিসেবটা খাটে না, কার্যক্ষেত্রে আঙুলের ক্ষমতার মধ্যেই ওজনের মাত্রাটা এসে যায়। তত্ত্বগত এই ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষাটা করা হয়েছিল কলকাতায় ফিরে এসে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভাষায় যাকে বলা চলে নিশ্চিন্ত প্রমাণের পর্যায় (confirmatory test)। কলকাতা মেডিকেল কলেজের মাঠে ৯ জন ছাত্র-বন্ধু ১ মন ওজনের একটি পাথরকে একইভাবে আঙুলের সম্মিলিত চাপে মাথার ওপর

তুলেছে অনেকবার—প্রত্যেকবার মুখে কিছু উদ্দীপক শব্দ করলেও তারা অবশ্যই কামার আলী দরবেশকে একবারও ডাকে নি [৭৯ পাতার ছবি]; আঙুলের জোরেই পাথর উঠেছে, ধর্মের জোরে ভাসে নি।

দরগায় 'অলৌকিক' পাথর (যা প্রকৃতপক্ষে অতিমাত্রায় লৌকিক এবং বাস্তব) নিয়ে আরেকটি পরীক্ষা করেছিলাম : দলের মধ্যে থেকেও পাথরে আঙুল লাগিয়ে মুখ বুজে ছিলাম, দরবেশের নামোচ্চারণ করি নি—উদ্দেশ্য ছিল দেখা যে, ধর্মকাহিনী অনুযায়ী পাথর আমার দিকে পড়ে কি-না। অবশ্যই পড়ে নি কারণ আমার দু-পাশে দু-জন তাগড়া চেহারার ফকির ছিল যাদের আঙুলে যথেষ্ট জোর থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ঝুঁকিটা বড় বেশি নেওয়া হয়েছিল। সেই রুমাল বাঁধা দাড়িওয়ালা 'এজেন্ট' (যার কথা আগে বলেছি) আমার এই নীরব থাকা লক্ষ করে টেনে নিয়ে আসে আমাকে এক কোণায়। নানারকম জেরা চলে—কেন এসেছি, কোথা থেকে এসেছি ইত্যাদি। কোনভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিলাম বটে কিন্তু কাজটা যে খুব বিবেচকের মতো হয় নি তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মোন্মাদের কাছে যুক্তিশীল আচরণ আশা করা বাতুলতা। তবে এ-ঘটনায় দরগার ভেতরকার কুচক্র আর গোপন মতলবের ব্যাপারটা এই প্রতিবেদকের কাছে অন্তত স্পষ্ট হয়েছিল।

এক ফাঁকে আলাপ করেছিলাম (কয়েক মুদ্রার বিনিময়ে) ফকির-বাউণ্ডুলে-দেরই একজনের সঙ্গে, ইউনুস বাসা। কর্ণাটকের লোক, ১৩ বছর ধরে এই দরগায় পড়ে আছে। আরো অনেকের মতো তারও দিব্যি খাওয়া-দাওয়া জুটে যায়, পাথরে হাত লাগিয়ে বাড়তি ইনকাম আছে, 'বাবু'রা খুশি হয়ে বখশিস্ দেয়। ইউনুসের কাছে দরগার গুরুত্ব কেবল ওই জীবিকার জন্য, ধর্ম-অধর্ম নিয়ে তার কোনই মাথাব্যথা নেই।...মাজারের ভেতর সমাধির চারপাশ কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা, কোণায় ঝুলছে লণ্ঠনের চেরাগ, কাচ ফাটা। সামনে প্রণামীর বড়সড় বাক্স, দু-দুটো তালা ঝুলছে। পাশে নোটিশ বোর্ডে হিন্দীতে নির্দেশ লেখা —'প্রণামী বা নজরানার পয়সা বাক্সে ফেলবেন, কারুর হাতে দেবেন না।' দরগার তরুণ এক মৌলভী কিংবা পুরোহিত জানালেন—বাক্সের টাকা সরকারের। মহারাষ্ট্র-সরকার 'কামার আলী দরবেশ ট্রাস্ট' করেছেন। দরগার জেনুইন মোল্লারা ওই ট্রাস্ট থেকেই মাসোহারা পেয়ে থাকেন।

বড় বিচিত্র ব্যবস্থা। দেশের সুস্থ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের দায়িত্ব রয়েছে সরকারের। অথচ সেই সরকারেরই মদতে ধাপ্পাবাজি জালিয়াতি দিয়ে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের অর্থ অপহরণ করা হচ্ছে, চিন্তাকে পঙ্গু করা হচ্ছে। সারা ভারতের

শত শত ধর্মস্থানের মৌলিক চিত্র যেন প্রতিফলিত হয় এই পুনার দরগায়। সাধারণ মানুষ আর কতদিন এভাবে প্রতারিত হতে থাকবে জানি না। ফেরার পথে বড়-রাস্তায় বাসের জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম, দেখলাম অনেক সাইকেল, স্কুটার, ট্রাক, মোটরের চালকরা চলন্ত অবস্থাতেই দূরের দরগার উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকাচ্ছে। আরো বুঝলাম, দরবেশের নাম-মাহাত্ম্য ছড়িয়েছে বহু মানুষের অন্ধ মনের গহীন কোণে।

সবশেষে 'পরিবর্তন' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টিং-এর কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। দরগার পাথর প্রসঙ্গে আমাদের সব রকমের পর্যবেক্ষণের পর যে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে হাজির হওয়া গেল তার নিরিখে নির্দ্বিধায় বলা যায়—'পরিবর্তন'-এর আলোচ্য প্রতিবেদনটি অসত্য-ভাষণ আর দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যে ভর্তি। লেখক শ্রীবিকাশ কি সত্যিই দরগায় গিয়েছিলেন? আঙ্গুল ঠেকাতে ৭ জন আর ৯ জনের তথ্য তিনি পেলেন কোথায়? "যতক্ষণ একটানা এক শ্বাসে চিৎকার চলে ততক্ষণ পাথর শূন্যে ভাসে"—স্রেফ শোনা কথা লিখেছেন লেখক, কোনরকম যুক্তিবিচারের মধ্যেই যান নি, হলফ করে বলা যায়। "দরগার সীমানার এক ইঞ্চি বাইরে গিয়েও পাথর তুলতে চাই বিপুল শক্তি"—লেখক বা অন্য কেউ কি পরীক্ষা করেছেন? করলেই বুঝবেন কথাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। "দরবেশ ছাড়া অন্য কোন নামে বা শব্দে পাথর শূন্যে ভাসে না"—এ মন্তব্যও অর্বাচীনের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়; কলকাতার মেডিকেল কলেজে করা পরীক্ষার চিত্রটা লেখক ভালো করে দেখলে উপকৃত হবেন। দরগার ক্রিয়াকলাপ যদি জালিয়াতি হয়, তবে সেই ধর্ম-ব্যবসাকে আবার কোন পত্র-পত্রিকায় স-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও এক জালিয়াতি, এক বিকৃত সংস্কৃতির নজীর।

পাথরের ওজন (ধরা যাক W) মাধ্যাকর্ষণের টানে সোজাসুজি নিচের দিকে ক্রিয়া করে। পাথরের পরিধি বরাবর যে আঙুলের ঊর্ধ্বমুখী চাপ সেগুলি ছোট মাপের সমান্তরাল বল (parallel force) হিসেবে সক্রিয়; এরকম অনেকগুলি ছোট সমান্তরাল বলের মিলিত ফল বা লব্ধ বল (resultant force, ধরা যাক R) পাথরের মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে ওপর দিকে ক্রিয়া করে। মিলিত আঙুলের ধাক্কা যখন যথেষ্ট হয় তখন R বল W বলের চাইতে বড় হয়, পাথর ঝপ্ করে উঠে যায়।

কিন্তু যদি ছোট ছোট বলগুলির মধ্যে একটি বা একাধিক পাশাপাশি সক্রিয় ঊর্ধ্ববল অনুপস্থিত থেকে যায় (অর্থাৎ যদি আঙুলের চাপ না পড়ে) তবে ঊর্ধ্বমুখী

লব্ধ বল R-এর মান কমে যায় এবং তার ক্রিয়াবিন্দুও মাধ্যাকর্ষণের লাইন থেকে সরে আসে। এর ফলে যেদিকে ছোট বলের ঘাটতি সেদিকে পাথর কাত হয়ে পড়ে অসম বলের ক্রিয়ায়—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়, turning couple ক্রিয়াশীল হয়।

পদার্থবিদ্যার এই পাঠ থেকে দরগার পাথরের মাঝে মধ্যে হেলে পড়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা সহজেই মিলে যাবে আশা করি।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্টো-নভেম্বর ১৯৮৩

কালাপাহাড়রা ভালো আছেন

দিন কতক আগে সুকান্তদের বাড়ি গিয়েছিলাম। আমার ছেলেবেলার বন্ধু, কাছেই এক স্কুলে অঙ্ক শেখায়। একান্নবর্তী পরিবারে অন্য আর চার ভাইয়ের সঙ্গে সুকান্তও আছে স্ত্রী এবং একমাত্র ছেলে মনোজকে নিয়ে। বছর চারেক আগে ওর বাবা গলার ক্যানসারে মারা যান। শেষদিকটায় খুব ভুগেছিলেন ভদ্রলোক, ভারি কষ্ট পেয়ে গেছেন। মা আছেন, বহুদিনের হাঁপানীর রোগী, ইদানীং সেটা আরো বেড়েছে। ছেলেবেলায় আমরা ভীষণ ভয় করতাম ভদ্রমহিলাকে। এমনিতে যথেষ্ট স্নেহশীলা ছিলেন, বাড়ি গেলেই নাড়ু-মোয়া গোছের কিছু একটা হাতে ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু এঁটো-কাঁটা, ছোঁয়া-ছুঁয়ি ইত্যাদির ব্যাপারে তিনি ছিলেন ভারি খুঁতখুঁতে আর খিটখিটে—যাকে বলে শুচিবায়ুগ্রস্তা, একেবারে আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখতেন সবাইকে। আর ছিল পুজোর বাতিক। সেই নিয়েই কথা হচ্ছিল। নাতি মনোজকে নিয়েই এখন গোলমাল। তিন বছরের ছেলে, এখন পুরোদস্তুর কৌতূহলী আর উদ্দাম। সোজা হয়ে বেড়ে উঠতে চায়, ঠাকুমার অতো নিয়ম-কানুনের চাপাচুপি ভালো লাগবে কেন। ঠাকুমাও ছাড়বেন না, পাঁচ ছেলে তিন মেয়েকে 'নিয়মনিষ্ঠা শিখিয়েছেন, মানুষ করেছেন' তিনি, এতো মোটে একটি। কিন্তু পেরে সত্যিই উঠছেন না। এটা-ওটা ছুঁয়ে দিচ্ছে, পেতলের 'গোপালঠাকুর'কে সিংহাসন থেকে টেনে নামাচ্ছে, প্রসাদ হওয়ার আগেই বাতাসা নিয়ে দৌড়। নিষেধ, বকাঝকা আর মারধোরে যেন 'উৎপাত' আরো বেড়েই যাচ্ছে। শেষে ঠাকুমার রাগ গিয়ে পড়ছে মনোজের মা-র ওপর।

সব মিলিয়ে এখন এমন অবস্থা যে, একসঙ্গেই থাকাই মুশকিল। সে দুঃখই করছিল সুকান্ত। এমনি সময়েই ঘটল ঘটনাটা। প্রথমেই পর্দা ঠেলে দৌড়ে ঢুকলো মনোজ, হাতে চীনামাটির শিব। পেছন পেছন মা এবং ঠাকুমা। ভেঙে ফেলবে এই উৎকণ্ঠায় হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে চীনামাটির মূর্তি মাটিতে পড়ে শত টুকরো হলো। ঠাকুমার আর্তনাদ এবং কান্না—'এ ছেলের কি হবে গো।' মনোজের মার কঠিন মুখ দেখেই বুঝলাম, অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। মনোজকে কাছে ডেকে নিলাম। সুকান্ত নির্বাক। বৃদ্ধা তারস্বরে চীৎকার করে চলেছেন—'হবে না-ই বা কেন? যেমনি মায়ের শিক্ষা, তেমনি ছেলের। আচার-বিচার কি আর আছে! ঠাকুর-দেবতায় মান্যি নেই; বুঝবি তোরা, উচ্ছন্নে যাবি সব।' এখন আর উনি মা নন, ঠাকুমা নন, বিকারগ্রস্তা মানুষ একজন শুধু।

এ-ধরনের দুঃখজনক ঘটনার অভিজ্ঞতা কমবেশি অনেকেরই আছে। মনে আছে, ছেলেবেলায় বড়োরা পুজোমণ্ডপে মূর্তির সামনে নিয়ে গিয়ে বলতেন—'নমো করো, ঠাকুর।' বলতেন—'অমনি করে না, ঠাকুর পাপ দেবে।' অর্থাৎ মূর্তিগুলো হচ্ছে ঠাকুর, ঠাকুররা খুব ক্ষমতাবান, বিপদে সাহায্য করে, খারাপ কাজ করলে শাস্তি দেয়—এই ধরনের একটা ছবি, একটা ধারণা, মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার প্রচেষ্টাটা শুরু হয় সেই ছেলেবেলা থেকেই। তার পরে আছে নানান পুরাণ মহাকাব্য কাব্য মন্দির পুরোহিত উৎসব ব্রত পাঁচালি তীর্থ সিনেমা নাটক যাত্রা উপন্যাস গল্প কবিতা ছবি গান গুজব এবং কিছু উৎসাহী মানুষ। সবাই দেব-দেবীর মাহাত্ম বর্ণনায় গদগদ, প্রতিহিংসাপরায়ণতার প্রচারে নিষ্ঠুর। এই পরিবেশের মধ্যে দিয়েই শিশু যুবক হয়, অসহায়তা অভাব অজ্ঞতা আর পরাধীনতার উপলব্ধি বাড়ে, আর সেই সময়েই মনে ভেসে ওঠে—না, স্কুলে পড়া বিজ্ঞান নয়, বরং ছেলেবেলার সেই ঠাকুররা, পুরাণের মহাকাব্যের আর সিনেমায় দেখা সর্বশক্তিমান দেবদেবীরা। আমরা উৎসাহিত হই, উৎফুল্ল হই, আশান্বিত হই, ভীত হই তাদের কথা স্মরণ করে (যদিও শেষ পর্যন্ত তাতে অসহায়তা, অভাব, অজ্ঞতা আর পরাধীনতা কাটে না)। সেই সঙ্গে নিজের সন্তানটিকেও মূর্তির সামনে দাঁড় করিয়ে 'নমো' করতে শেখাই। পুরুষানুক্রমে বয়ে চলা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেই মাঝে মাঝে গড়ে ওঠেন সুকান্তর মা-র মতো চরিত্ররা, আরো কিছু অনুকূল উপাদানের সাহায্য নিয়ে।

কিন্তু এরও ফাঁক আছে, প্রতিক্রিয়া আছে। গোরা আর জয়ন্ত দত্তর মতো মানুষরা সেখান থেকেই বেরিয়ে আসছেন। সে-কথা থাক, বরং ঘটনাগুলো বলি।

শিয়ালদা রানাঘাট সেকশানে দমদমের পরই বেলঘরিয়া স্টেশন। স্টেশনের

ঠিক গায়েই পূর্বদিকে একটা বেশ পুরনো অশ্বত্থ গাছ ছিল, আর ছিল এই গাছতলাতেই এক জমাটি শিব-মন্দির। মন্দিরের আয় মন্দ ছিল না, বেশ কিছু মানুষ বেঁচে ছিল একে অবলম্বন করেই। প্রথমে শুধু শিব দিয়ে শুরু করলেও পরে শনি আদি নানান দেবদেবীর অধিষ্ঠান হয় ঐ মন্দিরে। ফেরিওয়ালারা দিনের ব্যবসা শুরু করার আগে এটা সেটা দিয়ে প্রণাম করে যেতো, অফিসযাত্রী-দের অনেকেই পয়সা দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে যেতো, শিবরাত্রিতে মেয়েরা লাইন দিয়ে জল ঢেলে যেতো শিবের মাথায়, আর মাঝে মাঝে হতো অহোরাত্র নাম-সংকীর্তন —তখন সারা দিন-রাত লাউডস্পিকারে শোনা যেতো শুধু কর্কশ তীব্র আর্তনাদ। '৭৯/'৮০ সাল নাগাদ এমনি এক সংকীর্তনের দিন বিকেলবেলা, দ্রুতগামী এক মেলট্রেনের ধাক্কা থেকে এক মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান যতীনদাসনগরের এক যুবক। বেলঘরিয়ার লেভেল ক্রশিং দিয়ে সব সময়েই প্রচুর লোক চলাচল করে এবং অতীতের কিছু দুর্ঘটনার ফলে আগে থাকতেই স্টেশনের লাউডস্পিকারে থ্রু ট্রেন সংক্রান্ত ঘোষণা করা হয় যাতে লোকজন সাবধান হয়ে যেতে পারে। উপরোক্ত দুর্ঘটনার দিনও যথারীতি ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু শিবমন্দিরের নাম-সংকীর্তনের আওয়াজের ফলে সেটা কেউই শুনতে পায় নি। দুর্ঘটনার পরে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ কিছু যুবক শিব-মন্দিরের লাউড-স্পিকার বন্ধ করতে বলে। শোনা যায় সে-সময় ব্যারাকপুরের পুলিশের একটি দল সংকীর্তন করছিল। যুবকদের কথা তারা কানেও তোলে না। তারপর যা ঘটে তা একেবারে অভাবনীয়। শিবকে ভেঙে টুকরো করা হয়, কংক্রিটের শনিঠাকুর ধুলোয় পরিণত হয়, সমস্ত তছনছ হওয়ার পর ছেলেরা মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয়। কিছু লুটপাটও হয়। রেল কর্তৃপক্ষও বহুদিন ধরে অস্বস্তিতে ছিলেন। রেলের জমির ওপর মন্দির। রাখতেও পারছিলেন না, ভাঙতেও পারছিলেন না। এই সুযোগে পুরনো অশ্বত্থটিকে গোটাগুটি উৎখাত করে জায়গাটা একেবারে পরিষ্কার করে ফেলেন কর্তৃপক্ষ। সেখানে আর মন্দির গজায় নি। এই ঘটনা এলাকার মানুষজনকে বেশ আলোড়িত করে। ঘরে-বাইরে এ-নিয়ে ফিসফাস থেকে উত্তপ্ত আলোচনা—সবই চলতে থাকে। বেলঘরিয়া এমনিতে একটু জঙ্গী অঞ্চল—তা-বলে একেবারে মন্দিরে হাত! আগ্রহ হয়েছিল আমারও। বন্ধুবান্ধব পরিচিতজনের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথাবার্তা চালাই, দোকান বাজার স্টেশন আড্ডার আলোচনাগুলোও মন দিয়ে শুনি। মানুষজনের প্রতিক্রিয়া দেখেশুনে আমি কিন্তু একটু আশ্চর্যই হই। ব্যতিক্রম থাকতেই পারে, কিন্তু :না, মন্দির ভাঙার ঘটনায় বিক্ষুব্ধ বা দুঃখিত এমন মানুষের দেখা আমি

পাই নি। বরং যেন একটা চাপা উল্লাস—'ঠিক করেছে, বেশ করেছে, আগেই হওয়া উচিত ছিল।' এর কারণ আমি খুঁজতে যাই নি, যাওয়া সম্ভবও ছিল না। তবু গোরাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম—'কি রে, মন্দিরটা ভাঙলি কেন,' ওতো একেবারে বুক ফুলিয়ে জবাব দিল—'না, ভাঙবে না! যত্ত গাঁজাড়ি জুয়াড়ি আর মাতালের আড্ডা, সব রকম দু-নম্বরী কাজের ঘাঁটি একটা।' অভিযোগ সত্যি কিনা ঠিক বলতে পারবো না, তবে এটা ঠিক যে, মন্দিরটার সম্বন্ধে এমন একটা প্রচার কিন্তু ছিলই। গোরা মাঝে মাঝে কাছের এক কারখানায় বদলিতে কাজ করে। শক্ত-পোক্ত জোয়ান। লেখাপড়ার জন্য খুব একটা আগ্রহ বা প্রয়োজনীয় সঙ্গতি কোনটাই বিশেষ ছিল না। তবে বাংলা খবরের কাগজ পড়তে পারে, চিঠি-চাপাটি লিখতে পারে। কথায় কথায় মা কালির দিব্যি গালে, কাগজে পা লাগলে টপ্ করে নমস্কার করে, অথচ শিব-শনিকে বাঁশপেটা করেও একেবারে নিঃশঙ্ক।

শুধু বাগদী-বৌ বলেছিল—'বার ঠাকুর এখন উড়ে বেড়াচ্ছেন, যেখানে বসবেন একেবারে ছারখার করবেন।' বাগদী-বৌ-এর বয়েস হয়েছে। লেঠেলের ঘরের মেয়ে, এখন এ-বাড়ি ও-বাড়ির কাজকর্ম করে দিন কাটে। ও একদম নিশ্চিত যে, 'বার ঠাকুর' (শনিঠাকুর) এ ঘটনার ভয়ঙ্কর এক বদলা নেবেই।

তিন বছর কেটে গেছে [এই সংকলনের কাল পর্যন্ত আট বছর]। এখনো বদলার তেমন কোন লক্ষণ কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। না মড়ক, না অগ্নিকাণ্ড, না বজ্রাঘাত—কিচ্ছু না। ৮০-র দশকের কালাপাহাড়রা ভালোই আছেন—যতখানি ভালো থাকা যায় বর্তমান অবস্থায়।

ভালো আছেন জয়ন্ত দত্ত-ও। ডাকাত তাড়ানো চেহারা। ত্রিশোর্ধ মানুষটি কথা বলেন ধীরে-সুস্থে, পরিষ্কার করে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। জাপান থেকে 'ক্যাটারপিলার'-এর যন্ত্রপাতি চালানো শিখে এসে, এখন কলকাতা কর্পোরেশনের বুলডোজার আর পে-লোডার চালান। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘদিন ধরে। আলাপ সেরে জিজ্ঞেস করি—'কেমন আছেন? ভাল তো? কোন বড়সড় বিপদ-আপদ রোগ-শোক নেই তো?'

'ভালো। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?'—একটু চিন্তান্বিত মনে হয় জয়ন্তবাবুকে।

'আসলে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি ঠাকুর-দেবতাকে অমান্য করলে, হেয় করলে বা অপমান করলে তার ফল খুব ভয়ঙ্কর হয়। কঠিন পীড়া, অঙ্গহানি, বংশলোপ মায় জীবনহানি—কি নয়? তা আপনি তো ম্যালা মন্দির-টন্দির ভেঙেছেন, সে কারণেই জিজ্ঞেস করা।'

'ও, তা বেশ আছি, কোন ঝামেলা নেই।'—হেসে ফ্যালেন উনি।

'আচ্ছা, এ পর্যন্ত কত মন্দির ভাঙতে হয়েছে আপনাকে?'

'৮০ সাল থেকে চার খেপে, তা খান পঞ্চাশেক তো হবেই।'

৬০-এর দশক থেকেই বৃহত্তর কলকাতার রাস্তার ধারে ধারে ক্ষুদে ক্ষুদে মন্দির গজিয়ে উঠতে থাকে। শিব, হনুমান, শনি-র। '৭০-এর পর থেকে যেন রাতারাতি বেড়ে উঠতে থাকে এই ফুটপাতের মন্দিরের সংখ্যা। দু-একটা মাজারও হয়। তারপর '৮০ সাল নাগাদ সরকারি নির্দেশে রাস্তার দু-পাশের 'বেআইনি উপনিবেশ' ভাঙ্গা শুরু হয়—পুলিস এবং কর্পোরেশনের সহযোগিতায়। অসংখ্য ঝুপড়ি আর দোকানপাটের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা পড়ে রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা ছোট আর মাঝারি মাপের মন্দিরগুলোও। '৮০ সাল থেকেই জয়ন্ত দত্ত এ-কাজে অংশ নিয়েছেন বুলডোজার নিয়ে। আরো কয়েকজন বুলডোজার অপারেটার—যারা একাজে হাত লাগিয়েছেন—ভালোই আছেন, সুস্থ স্বাভাবিক।

বেলঘরিয়ার গোরার মতো জয়ন্তবাবুও অভিযোগ করছিলেন, মন্দিরগুলো সম্পর্কে—'যত বদকাজের ঘাঁটি, ধান্দাবাজের আড্ডা।'

জিজ্ঞেস করি—'হাওড়ায় মন্দির ভাঙতে গিয়ে বেআইনি চোরাইমালের গুদাম বেরিয়ে পড়েছিল নাকি একবার। সে রকম কিছু পান নি?'

'সত্যনারায়ণ পার্কে অপারেশনের দিন সঙ্গে মিনিস্টার, কমিশনার সাহেব রয়েছেন। পার্কের মন্দিরটার বদনাম ছিল—সব রকমের ব্যবসা নাকি চলত এখানে। ওরা বোধহয় ভাবতেও পারে নি যে, সত্যি মন্দিরটা ভাঙা হবে। রেলিং উপড়ে মন্দিরটাকে ঠেলে ফেলার পর জায়গাটা পরিষ্কার করতে গিয়ে পাওয়া গেল এক পোঁটলা গাঁজা। পাইকপাড়ায় মদ পেয়েছি।'

'মন্দিরগুলো ভাঙতে ভয় লাগতো না—অভিশাপ-টাপের?'

'এক সময় এসব মানতাম। পরে যখন জানলাম-শুনলাম ব্যাপারগুলো সম্পর্কে, তখন থেকে ভয় চলে গেছে। বনহুগলীর কাছে একটা মন্দির ভেঙেছিলাম। ওতে তো মনে হয় তেত্রিশ কোটি ঠাকুর দেবতাই ঠাসা ছিল! পাইকপাড়ার পরে বি টি রোডের ওপর একটা শীতলা মন্দির আছে। সবাই বলল, খুব জাগ্রত। আমি কিন্তু চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম ভাঙবো বলে।'

'ভাঙলেন?'

'নাঃ। মন্দিরের কর্মকর্তারা শীতলার ওপর ভরসা না রেখে কোর্ট থেকে ইনজাংশন করিয়ে আনলো। ভাঙা আর হলো না।'

'আচ্ছা, এই মন্দির ভাঙতে গিয়ে কোন প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ পান নি আপনারা ?'

'তেমনি কিছু নয়। একবার বি টি রোডে মাজার ভাঙতে গেছি। একজন এসে সটান শুয়ে পড়ল আমার গাড়ির চাকার সামনে। আর একবার গাড়িতে আধলা পাথর পড়েছিল। ব্যাস। এছাড়া কোন সংগঠিত প্রতিবাদ দেখি নি।'

'আর একটা প্রশ্ন ছিল। মন্দির ভাঙার ফলে আপনাকে কাজের জায়গায় কিম্বা বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়স্বজন মহলে কোন রকম হেনস্থা হতে হয় কি ?'

'নাঃ।'

আশ্চর্য !

সংগ্রাহক

মে ১৯৮৩

কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের মেলা

মেলা-মেলা-মেলা। অগণিত মানুষের মেলা। মেলা দোকানের, মেলা তাঁবুর, মেলা 'গাইয়ের', মেলা সাধু-সন্ন্যাসীর, চোর-জোচ্চোরেরও মেলা। এই হলো কল্যাণীর ঘোষপাড়ার সতীমা-র মেলা। আজ দোল। সবে সকাল দশটা। তাতেই ভিড় দেখে মাথা খারাপ হবার যোগাড়।

বিরাট এক আমগাছ। তারই ছায়ায় ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে গান গাইছেন এক বাউল। গলায় তার টাকার মালা। হাতে ধরা দোতারা। ইনি এসেছেন বীরভূম থেকে। মেলায় এরা আছেন, মানুষজনকে মাতিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু যে কারণে হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া এইরকম নানান জায়গা থেকে মানুষজন কাতারে কাতারে এখানে এসেছে, আসছে, তা কেবল এই এদের গান শুনতেই নয়। মানুষ প্রধানত এসেছে ডালিমগাছতলায় পুজো দিতে আর হিমসাগরের জলে পুণ্যসঞ্চয়ের আকর্ষণে। ভক্তেরা এক 'পুণ্য' ডালিম-গাছের ডালে পোড়ামাটির ঘোড়া কিংবা ঢিল বেঁধে মানসিক জানিয়ে যায়। ভক্তের বিশ্বাস পুণ্যবতী সতীমার উদ্দেশে ঐ ডালিমগাছের কাছে মানসিক করলে সবরকমের মনস্কামনাই পূরণ হয়। নিয়ম হলো, মনস্কামনা পূরণ হলে নিজের

হাতে ঐ বাঁধা ঢিল বা ঘোড়া খুলে মানসিকে পুজো দিতে হবে। অথচ নিজের ঘোড়াটি চেনা ভগবানেরও (?) দুঃসাধ্য ; হাজার হাজার হুবহু একই রকমের ঘোড়া ঝুলছে ডালে ডালে, আর কতগুলো ফোচকে ছোঁড়া (নাস্তিক ?) সুযোগ-মতো পটাপট ডাল থেকে ছিঁড়ে নিচ্ছে সেই ঘোড়া—পাশেই আবার তা বিক্রি হচ্ছে। এসব ব্যাপারে ভক্তদের তেমন মনোযোগ নেই। পাণ্ডারা ব্যস্ত পুজোর কাপড় প্রসাদ সামলাতে আর তা পাচারের ধান্দায়।

কিন্তু কেন এই ডালিমতলায় হাজারো মানুষের এমন ভিড়ের বাড়াবাড়ি ? কেন কাতারে কাতারে অন্ধ, বোবা, সন্তানহীনা, বিধবারা ছুটে আসেন বছরের পর বছর ? ইতিহাসটা কেটে-ছেটে সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায় এইরকম :
সতীমা-র মেলা মূলত 'কর্তাভজা' ধর্ম-সম্প্রদায়ের মেলা। 'কর্তাভজা'রা খ্রীস্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন কোন ধর্মেরই নয়। শোনা যায় আউলচাঁদ এই ধর্মের প্রবক্তা। অষ্টাদশ শতকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। রামশরণ পাল (মৃত্যু ১৭৮৩) নামে এক ব্যক্তির বিচক্ষণতা ও প্রচেষ্টায় বর্তমান কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রকৃত বিকাশ ঘটে। যতদূর জানা যায়, রামশরণ পাল আদতে ছিলেন এক মামুলী ভাগ্যান্বেষী। ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গাতীরে ঘোষপাড়ায় আসেন তিনি ভাগ্যান্বেষণে। অতি তুখোড় লোক, তাই সহজেই রামসুন্দর নামে এক তহশীলদারের সহযোগী হিসেবে কাজ করে সদগোপ জমিদার গোবিন্দ ঘোষের মেয়ে সরস্বতীদেবীকে বিবাহ করেন তিনি। এরপর 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের কর্তা হয়ে আউলিয়া ধর্মমত-ও তিনিই প্রচার করেন (তারও এক বৃহৎ ইতিহাস আছে। এখানে আর আনছি না সে সব)। এই সরস্বতীদেবীই ডালিমতলায় 'সিদ্ধিলাভ' করেন এবং পরে সতীমাঈ নামে প্রচারিত হন। ওদিকে জমিদার গোবিন্দ ঘোষের জামাই ও কন্যা ধর্মগুরু হওয়ায় তার খাজনা আদায় ও প্রজা বশ করা সহজ হয়ে যায়।

প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে বারবার মনে হচ্ছে—নতুন করে মেলার বিবরণ কি আর দেব, তিনদিন ধরে ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখা আর একশ' দেড়শ' বছর আগে নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দেখার মধ্যে সত্যিই তেমন কোন ফারাক আমাদের চোখে পড়ে নি—অথচ এতগুলি বছর গড়িয়ে গেছে। কবি নবীনচন্দ্র সেনের ভাষাতেই দেখা যাচ্ছে :
'আমি সমস্ত দিন দেখিয়াছি যে, কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে ভক্ত দুই মাইল পথ লঙ্ঘন করিয়া ঘোষপাড়ায় মেলাক্ষেত্রে আসিতেছে এবং হিমসাগরে স্নান করিয়া ভক্তিতে অধীর হইয়া রামশরণ পালের ও তাহার স্ত্রী

'সতীমাঈ'-এর সমাধি দর্শন করিতেছে। আমি দেখিয়াছি যে, শতশত নরনারী 'সতীমাঈ'র সমাধি সমীপস্থ 'দাড়িম্বতলায়' বৈষ্ণবদের মত দশাপ্রাপ্ত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় দিনরাত্রি ধরণা দিয়া পড়িয়া আছে। কেহবা অপদেবতাশ্রিত লোকের মত মাথা ঘুরাইতেছে ও কেহ উন্মাদের মত নৃত্য করিতেছে।...এখন রামশরণ পালের দুই বংশধর আছেন। দুইটিই মহামূর্খ। তথাপি উভয়েই বর্তমান কর্তা। তাঁহারা সেই সমাধি বাড়ীতেই বাস করেন।...দেখিয়াছি, মূর্খ কর্তা দুজন দুই 'গদি'তে বসিয়া আছেন এবং সহস্র সহস্র যাত্রী তাঁহাদের ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া এবং প্রণামি দিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেছে।'

[নবীনচন্দ্র সেনের আত্মজীবনী থেকে, ১৮৯৫]

রামশরণ পালের আজকের (১৯৮২) বংশধরদের কাছেও এই মেলা একটা বড়সড় ব্যবসাক্ষেত্র। মোটা আয় হয়। তারা থাকেন কলকাতার বালীগঞ্জে।

সোমপ্রকাশ, ৪ঠা এপ্রিল ১৮৬৪ : 'অন্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় ইহাদের বুজরুকীও অল্প নয়। কোন পরিচিত ব্যক্তিকে বোবা সাজাইয়া···"বোবার কথা হউক"···প্রভৃতি বলিয়া রোগ আরাম করিতেছে। এই রাধাকৃষ্ণের দোল উপলক্ষে প্রতি বৎসর অনেক চুরি ও হত্যা হইয়া থাকে। এ বৎসর তিন ব্যক্তির ওলাওঠায় মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া আসিয়াছি। ইহার পর আর কত হয় বলিতে পারি না। পুলিশের কনস্টেবলেরাও অত্যাচার করিয়া পয়সা গ্রহণ করে।'

আজকাল অবশ্য কাউকে বোবা সাজিয়ে 'বোবার কথা হউক' বলে বোবাকে কথা বলানোর মতো বুজরুকি বোধহয় হয় না, আর পুলিশের জুলুম করা, ঘুষ নেওয়ার কথা শুনেছি, চোখে দেখি নি।

সংবাদ প্রভাকর, ৩০শে মার্চ ১৮৪৮ (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত) : '···ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধপূর্বক বৃক্ষমূলে বা রম্যস্থলে বা পুষ্করিণীর ঘাটে বা মাঠে বা গৃহস্থের উঠোনে অথবা রাজপথে স্ব-স্ব মহাশয় অর্থাৎ উপগুরু বেষ্টন করিয়া একান্তঃকরণে কর্তাগুণকীর্তন করিতেছে। কি আশ্চর্য্য, কি কুহক! যুবতী ও কুলের কুলবধূ প্রভৃতি কামিনীগণ যাহারা পিঞ্জরের পক্ষীর ন্যায় নিয়ত অন্তঃপুরে বদ্ধা থাকে তাহারা এককালীন লজ্জা ও কুলভয় এবং মনের বিকারকে জলাঞ্জলি দিয়া পর পুরুষের সহিত একাসনোপবিষ্টা হইয়া আনন্দ লহরী ও গোপীযন্ত্রে গীত ও বাদ্য করিতেছে, ক্ষণেক২ ঠাকুর২ বলিয়া চীৎকার, ক্ষণেক বা করতালি ও জয়ধ্বনি প্রদান করিতেছে। ···যাহারা ভূমিসার করিয়াছে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ উৎকট পীড়াতে পীড়িত, কেহ বা সমূহ বিপদগ্রস্ত, কেহ বা মনের তাপে তাপিত ও কেহ বা সন্তান-সন্ততি বিরহে দুঃখিত হইয়া স্ব-স্ব দায় হইতে উদ্ধার হওনের

ভরসায় মনোরথ সিদ্ধকরণের প্রত্যাশায় এরূপ হত্যে দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কর্তার উদ্দেশে ঐ পবিত্র বৃক্ষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ দোহাই ঠাকুর দোহাই সতীমা, আমরা নরাধম অতি পাপী, আমাদের অপরাধ মার্জনা কর, ইত্যাদি কাতরোক্তি করিতেছে।…'

এ দেখা আমাদেরও দেখা। এদের প্রায় সবাই কিন্তু বঞ্চিত হতভাগ্য মানুষ। এদের সুস্থ সুন্দর জীবনের জন্য আকুতি, অজ্ঞতা, সরলতাই কিছু ধুরন্ধর লোকের ব্যবসার মূলধন। তবে পয়সাওয়ালা, শিক্ষিত ভক্ত লোকও পাবেন! বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে **Ph. D.** করেছেন এমন লোককেও আমরা ভক্তিভরে ডালিমগাছে ঘোড়া বাঁধতে দেখেছি।

মেলার দক্ষিণপ্রান্তে হিমসাগর, দুধসাগরও বলেন কেউ কেউ, এর জলের নাকি যাদুকরী গুণ আছে। কিন্তু কেন যে একটা এঁদো পুকুরের এমন অদ্ভুত নাম, তার কোন যুৎসই ব্যাখ্যা আমরা পাই নি। ভক্তের বিশ্বাস এই পুকুরটাতে আগে নাকি জোয়ার-ভাটা খেলত ; আজকাল আধুনিক মানুষের অনাচারের ফলে সে-সব নাকি বন্ধ হয়ে গেছে। অতি উত্তম। কিন্তু বদ্ধ পুকুরটার জঘন্য নোংরা

·· ২৯শে ফেব্রুয়ারি (১৯৮০) থেকে ঘোষপাড়ায় বিরাট মেলা বসেছিল। কিন্তু এবার দোলপূর্ণিমায় ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ গেছে। জলকাদায় শিশু-বৃদ্ধা সহ লক্ষ লোকের দুর্দশার অন্ত ছিল না।…একটি শিশুকন্যাকে নিয়ে তার মাসী হাওড়ার দানসাগর থেকে এসেছিল সতীমায়ের মেলায়। ছোট মেয়েটি ঝড়-বাদলে অসুস্থ হয়ে পড়লে সমবেত অনেকের পরামর্শে মাসী মেয়েটিকে হিমসাগরে (একটি এঁদো পুকুর যার নোংরা জলে হাজার লোকে স্নান করে পুণ্যলোভে) স্নান করিয়ে সতীমায়ের থানে ডালিমতলায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে রাখে। মেলাতে ডাক্তার ছিল কিন্তু দৈবশক্তির ওপর ভরসা ছিল অনেক বেশি, ফলত শিশুটি মারা যায়। মাসীর বুকফাটা আর্তনাদে মেলার বাতাস ভারী হয়। জলকাদার মধ্যে সে মৃত শিশুকে আঁকড়ে বসেছিল। শেষ অবধি পুলিশের সাহায্যে মৃতদেহ সরানো হয়।

□ কল্যাণী থেকে প্রকাশিত 'প্রগতিবার্তা'র (১৯৮০ সালের) রিপোর্ট

জল (মেলার দিনগুলোয় প্রত্যহ ভোরে হাজার হাজার লোক এই হিমসাগরের চারধারে মলত্যাগ করে, প্রস্রাব করে) পবিত্র মনে করে অঞ্জলি ভরে মাথায় ছোঁয়ানো আর পান করার অর্থ টা কি দাঁড়ায় ? এতে অসুখ সারবার কথা, না বাড়বার কথা ? অথচ অসংখ্য মোহাচ্ছন্ন ধর্মান্ধ মানুষ তাই করছে।

এসব কথা ভক্তদের বোঝাবার বা বলবার মতো সাহস আমাদের ছিল না। দেখলাম যুবতীরাও লজ্জা ভুলে কাপড় খুলে ধীরে-সুস্থে ভক্তিভরে স্নান করছে। শুধু মহিলা কিংবা বয়স্ক-বয়স্কারাই নন, যুবকেরাও কিছু পিছিয়ে নেই। হিমসাগরে স্নান করে তারাও দণ্ডি কাটতে কাটতে চলেছে ডালিমগাছের দিকে, চার-পাঁচশো গজ দূরে। বিশ্বাসে কত কি-ই না করতে পারে মানুষ, কত কি-ই না হয়! ভাবতে পারেন—স্নান করে এই প্রখর রোদে দুশো গজ তিনশোবার দণ্ডি কেটে ডালিমগাছের কাছে গিয়ে পুজো দেবে, মানত করবে।

কতরকমেরই মানুষ এসেছে মেলায়। গাছতলাতে বাবাদের, সাধু সন্ন্যাসীদের আড্ডাখানার কাছে ঘুর ঘুর করছে কিছু তরুণ যুবক, সুযোগমতো বাবাদের কল্কেতে দু-টান দিচ্ছে। স্কুল কলেজে পড়া ছেলে সব। সতীমায়ের মেলা এদের কাছে গঞ্জিকা সেবনের উৎসব।

শিক্ষিত লোকের বৈজ্ঞানিক মন

মেলায় খোলা মনে খোলা চোখে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এর ওর সাথে দু-চারটে কথা বলছি। শিক্ষিত লোক দেখলে সুযোগমতো জিজ্ঞেস করছি, কেন এসেছেন ? শিক্ষিত, তাই সেয়ানাও বেশি :

—আর মশাই বলেন কেন, এই আমার স্ত্রী, কে একে বোঝাবে এভাবে সন্তান পাওয়া যায় না। আরে বাবা, বিজ্ঞানের যুগ। ডাক্তাররা কিছু করতে না পারলে সতীমায়ের সাধ্য আছে ? কিন্তু এ কথা কে বোঝে। অগত্যা আমি বলি, তোমার যখন এতই বায়না তো চল, দেখা যাক সতীমায়ের দৌলতে ছেলে পাওয়া যায় কি-না। তা মশাই কিছু কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেও বটে। আমারই অফিসের সহকর্মী, ওর মায়ের প্যারালিসিসটাতো এভাবেই সারলো! বিশ্বাস করতেও মন চায়না, আবার বিশ্বাস না করেই বা যাই কোথায় ? ঐ ডালিমতলার মাটি আর হিমসাগরের জল, এ নিয়ে একটা এক্সপেরিমেণ্ট হওয়া দরকার বুঝলেন ?

আমরা বললাম—এক্সপেরিমেণ্ট হচ্ছে তো!

—কোথায়, কোথায় ?

—কেন, মেলায় ঢুকতেই দেখেন নি রাস্তার ডানধারে একটা বিজ্ঞানের

অনুষ্ঠান হচ্ছে? ওখানে microscope-এ জলের মধ্যেকার জীবাণুগুলোকে দেখানো হচ্ছে। দেখবেন রোগ-জীবাণু গিজ গিজ করছে। ওটা কিন্তু হিমসাগরের জল।

এতক্ষণ খেয়াল করি নি, আমাদের এই কথোপকথন মন দিয়ে শুনছিলেন আরেক শিক্ষিত ভদ্রলোক। এম এস সি, পি এইচ-ডি ইত্যাদি কটা লেজুড় এনার নামের পেছনে আছে চেহারা দেখে বুঝিনি, তবে মুখ দেখে বুঝলাম প্রচণ্ড রেগে গেছেন উনি। আমাদের এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারটাই (পরে বুঝলাম) ওনার মনের অন্তঃপুরে কোথাও গিয়ে ধাক্কা মেরেছে। বিনা ভূমিকাতেই ফেটে পড়লেন:

—বিজ্ঞান কি কারো বাপের সম্পত্তি? আমিও মশায় বিজ্ঞানের ডক্টরেট। কলেজে বিজ্ঞান পড়াই। যা খুশি তাই বললেই হলো? যা ইচ্ছে করলেই হলো?

—আমরাও তো ঠিক এই কথাগুলিই বলছি। বলছি, ধরে নেওয়ার আগে একটু বিচার করে নেওয়া দরকার। অন্ধভাবে সব বিশ্বাস করা কি ঠিক?

—তার মানে? সব কিছু উড়িয়ে দেব? কতটুকু জানেন আপনারা, কতটুকু বোঝেন? জানেন, আইনস্টাইন অব্দি অলৌকিক-অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করতেন? তা ছাড়া দানিকেনের তত্ত্বকে কি আজকের যুগের বিজ্ঞানীরা উড়িয়ে দিতে পারছে? নস্যাৎ করতে পারছে? যা খুশি কপচালেই হলো?

—আপনি রেগে গেছেন। শুনুন—প্রথমত, কে কত জানে সে নিয়ে তর্ক করার কোনো মানে হয় না। প্রকৃত জানা মানুষের নিজেরই উন্নতি ঘটায়, সেটা অন্যকে জানানোর ব্যাপার নয়। দ্বিতীয়ত, আইনস্টাইন অতিপ্রাকৃত শক্তি বা সুপার-ন্যাচারাল পাওয়ারে বিশ্বাস করতেন, এটা ডাহা মিথ্যে কথা। তাছাড়া আইনস্টাইন কোন কিছু বলতেন বা মানতেন বলে আমরাও সেগুলোকে প্রশ্ন না করে অন্ধভাবে মেনে নেব, এটা কোন সুযুক্তি নয় মোটেই। আর দানিকেনের তত্ত্ব বলে গৃহীত তত্ত্ব কিছু নেই। উনি অঢেল পয়সা খরচ করে দুনিয়া জুড়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন—এটা আজ প্রমাণিত, হয়তো যথেষ্ট প্রচারিত নয়।

—দেখুন, উল্টোপাল্টা তর্ক করবেন না। আপনারা জানেন।...মাঝপথে থামিয়ে দিলাম ভদ্রলোককে।—বুঝলাম, আপনার ক্রোধ প্রকাশ করা ছাড়া কিছু বলার নেই। আপনার সঙ্গে আর আলোচনা করে লাভ নেই। আপনি লোক ভালো নন।

আমরা কেটে পড়লাম ওখান থেকে। শুনতে পেলাম পেছনে বিজ্ঞানের

ডক্টরেট মশাই গজরাচ্ছেন—একথা আগেই বোঝা উচিত ছিল। শা-লা নাস্তিক কোথাকার। অ্যাহ্, সব একেবারে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা দেবেন!

হায় আমাদের দেশ। এই তো উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের বৈজ্ঞানিক মনের নমুনা!

* * *

বোবাকে কথা বলানোর অমানবিক চেষ্টা

অনেকক্ষণ ধরে একটা 'আঁ আঁ' আওড়াজ কানে আসছিল। একটু এগোতেই দেখি বিশাল এক জটলা। হিমসাগরের ঘাটের কাছে একটি সাত-আট বছরের বাচ্চা ছেলে। বোবা। একজন রুক্ষ-চুলের লোক বুক-জলে দাঁড়িয়ে ছেলেটার একটা হাত ধরে ছুড়ে ফেলছে আরো গভীর জলে। কিছুক্ষণ এভাবে চুবিয়ে রেখে আবার টেনে তুলছে। বোবা ছেলেটা ভয়ে আতঙ্কে বেদনায় বিকৃত গোঙানির মতো আওয়াজ বার করছে—আঁ আঁ করে; বুক কাঁপিয়ে দেয় সে স্বর। অনবরত চলছে ছেলেটার এই চুবুনি হিমসাগরের বুকে। কয়েক মিনিট বাদে বাদে পুকুর ধারে নিয়ে এসে ছেলেটার মুখে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে পচা বাসি ফুল, কাদা, পাথর কুচি, এইসব। একজন ছেলেটাকে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে জোর করে মুখ হাঁ করাচ্ছে, অন্যজন আঙুল দিয়ে ঠেসে গলায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে এইসব পদার্থ; সঙ্গে সঙ্গে আবার তাকে ছুড়ে দিচ্ছে জলে। ফলে সবকিছু নাক মুখ দিয়ে জলের সঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে পেটে। অন্যদের সাথে আমরাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট দশেক ধরে দেখলাম এই অমানুষিক প্রক্রিয়া। এতগুলি ধর্মান্ধ মানুষ, প্রতিবাদ করলে ফলটা কি দাঁড়ায় কে জানে, ভরসা হচ্ছিল না। ভয়ে-অত্যাচারে আধমরা হয়ে ছেলেটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। আর সমানে নির্দয়ভাবে কিল চড় চলছে।

—বল্, মা বল্। বল্ বলছি···।

বোবা ছেলেটা যন্ত্রণায় আঁ আঁ করে গোঙানির আওয়াজ বের করে খালি, 'মা' বলে না। পাড়ের কাছে কয়েক হাজার নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে—প্রতিবাদহীন। ফিস্ ফিস্ করে একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে, 'মা বললো বুঝি? তা তো বলবেই, এর নাম হিমসাগর।'···'দেখলে মায়াও হয় অথচ এরকম একটু কষ্ট না দিলে রোগ ভালো হবে কি করে?'...কি অন্ধ বিশ্বাস! এই বিশ্বাসেই বোধহয় মানুষ আগেকার দিনে মানুষ-বলি দিত। আমরা পাশে দাঁড়ানো একটি কলেজে-পড়া ছেলে তার বন্ধুকে গভীর বিশ্বাসের সাথে বললো, 'দেখবি, ছেলেটা

অটোমেটিক্যালি কথা বলবে।'

এতক্ষণ ধরে 'মা' বলানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ক্ষান্তি দিয়ে ওরা ওপরে উঠে এলো। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন জিজ্ঞেস করলো—এরপর কি করবেন?

—দণ্ডি কাটতে কাটতে মায়ের কাছে নিয়ে যাবো। এর মধ্যেই ও ভালো হয়ে যাবে। কত বোবা কথা বলল, কত অন্ধের চোখ খুলে গেল এই করে!

ওই কর্মতৎপর লোক দু-জনের একজন ছেলেটার মামা, অন্যজন প্রতিবেশী। মা বেঁচে নেই। বাবা এ-দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে সরে গেছে শুনলাম। দু-পাশ দিয়ে দু-জনে শক্ত করে হাত ধরে ছেলেটাকে জোর করে উপুড় করে শোয়ানো হচ্ছে—'বল্ পাঁঠা, মা বল্। শালা মা বলবি না, বল্।' সঙ্গে সঙ্গে কিল-চড়-ঘুষি।

প্রতিবাদ প্রতিরোধ

ভেতরটা কেঁদে ওঠে নিঃশব্দে। ৬/৭ বছরের একটা বোবা ছেলে। মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারে না। তার ওপর এই অত্যাচার। এই সময় কে একজন মৃদু গলায় বলল—এভাবে কি হয়? এক্ষুণি তো মারা পড়বে ছেলেটা।

আমরাও অমনি এগিয়ে গেলাম। ধৈর্যের বাঁধটা যেন ভাঙার অপেক্ষাতেই ছিল।—শুনুন, মারধোর বন্ধ করুন। এমনিতে যা করার করুন। ওভাবে মারবেন না।

অনেকেই সায় দিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, মারাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। এরাই সেই জনসাধারণ যারা এতক্ষণ ধরে নির্বাক হয়ে ঘটনা দেখছিল।

মামা আর প্রতিবেশী একটু হকচকিয়ে গেল।—কিন্তু না মারলে তো চলবে না বাবু, রোগ তো ভালো হবে না!

বুঝলাম ওরা ভয় পেয়েছে। জনসমর্থন আমাদের দিকে, তাই আরো এগিয়ে বললাম—দেখুন, বাচ্চাটা যদি মারা যায় তবে কিন্তু সব কটাকে জেলে পুরবো। যে-পরিমাণ পচা ফুল, পাঁক আর ইটের টুকরো এর পেটে ঢুকিয়েছেন আর যেভাবে একে জলে চুবিয়েছেন, মেরেছেন—কি অবস্থা করেছেন তাকিয়ে দেখুন—এরতো যখন তখন হার্টফেল করতে পারে! তখন কি করবেন? বেশি আর বাড়াবাড়ি করবেন না। এই মেলায় ডাক্তাররা ক্যাম্প করেছে, সেখানে নিয়ে যেতে হবে। চলুন। আর এতে রাজি না হলে পুলিশ ডাকবো।

লোক দু-জন যথেষ্ট ভয় পেয়েছিল। তাছাড়া 'মা' বলানোর এই নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় তাদের নিজেদেরও আস্থা বিশ্বাস কিঞ্চিৎ টলেছিল মনে হয়।

টানাটানিতে বাধ্য হয়েই আমাদের সাথে চললো ডাক্তারের কাছে।···সমবেত জনতার অনেকেরই বিরোধিতায় সায় ছিল না—এমন ধর্মীয় ব্যাপারে এতটা হস্তক্ষেপ! কিন্তু নিরীহ বাচ্চাটার ওপর মারধোর এত বেশি পরিমাণে হয়েছিল যে, ঐ মানুষগুলোর অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে মানবিকতার জোরালো সংঘাত চলছিল মনে। সেই অবকাশে আমাদের প্রতিবাদ শুভ পরিণতি এনে দিয়েছে। ছেলেটা সে যাত্রায় রক্ষা পেল। নাম নিতাই সরকার। বাবা ধীরেন সরকার, ক্ষেতমজুর। হরিণঘাটা থেকে পাড়ার লোকের পরামর্শে এসেছিলেন। বাড়ি মাল্লাবেলিয়ার জাহির পাড়ায়।

আজকাল নাকি এ-জাতের বোবাকে কথা বলানো, অন্ধকে চোখে দেখানোর ঘটনা কম বটে। আমরা কিন্তু আরো কিছু ছোটখাটো ঘটনা চাক্ষুষ করেছি। দেখেছি কিভাবে দু-তিন বছরের অন্ধ ছেলেকে হিমসাগরে স্নান করিয়ে ছেলের মা পিটিয়ে পিটিয়ে দণ্ডি কাটিয়ে ডালিমগাছের দিকে নিয়ে চলেছে। বঞ্চিত হতভাগ্য দিশাহারা মানুষ আর কি-ই বা করতে পারে? এ-সমাজ তাদের প্রতি বিরূপ। সমবেদনা জানানোর কেউ নেই, কথা শোনার কেউ নেই, সমস্যার সমাধানের সঠিক পথও জানা নেই। অতএব সতীমার মেলার মত নানা ধর্মীয় মেলায় ধর্মান্ধ মানুষের উন্মাদনা চলবে—কতদিন জানা নেই।

* * *

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জাতীয় সেবা প্রকল্পে'র (NSS) পক্ষ থেকে মেলার মধ্যে লিফলেট বিলি হচ্ছিল। লিফলেট-এ যে-কথাটা বিশেষভাবে বলা ছিল, তা এবারকার মেলায় বিজ্ঞান-অনুষ্ঠানের কথা। এই প্রথম হচ্ছে। মেলায় ঢুকতেই রাস্তার ডানধারে একটা তোরণ। তাতে সুন্দর করে লেখা—কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সেবা প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা ও কল্যাণী বিজ্ঞান সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিজ্ঞানের প্রদর্শনী। ভাবলাম সারাদিন ধরে তো রাস্তার এপারে ধর্মোন্মাদ মানুষদের দেখলাম, এবার রাস্তার ওপারের কাণ্ডকারখানা দেখা যাক।

মেলায় বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান

সন্ধ্যা নেমে গেছে। বেশ বড় লাইন পড়েছে। টেলিস্কোপে আকাশ দেখানো হচ্ছে। বেশ তো, নিখরচায় যন্ত্র দিয়ে আকাশ দেখা! দাঁড়িয়ে পড়লাম লাইনে। খোলা মাঠের বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে আয়োজন। একদিকে সারি সারি কিছু পোস্টারের প্রদর্শনী। অন্যধারে ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থা। রাতে মাইক্রোস্কোপে

জলের জীবাণু দেখানো বন্ধ। দিনে চালু ছিল। রাতে বন্ধ আলোর অভাবে। জেনারেটার চালিয়ে অন্যান্য আয়োজনগুলি করা গেছে। জনা কয়েক আঞ্চলিক ছেলে প্রচুর দৌড়দৌড়ি করে গোটা ব্যাপারটা সামাল দিচ্ছেন। এর মধ্যে লাইন এগিয়েছে। আমাদের টেলিস্কোপে চোখ রাখবার সুযোগ এলো। বেশ হতাশ হলাম। চাঁদ দেখানো হচ্ছে—খালি চোখে আমরা চাঁদকে যা দেখি তার চাইতে খুব বড় কিছু মনে হলো না। মানুষজন কিন্তু লাইন দিয়ে মহা উৎসাহে তাই দেখছে। বিজ্ঞানের যন্ত্র, তাতে চোখ রাখা—সেই আনন্দ। কয়েকজন একটু ক্ষুব্ধও হয়েছেন দেখলাম। টেলিস্কোপটা আরেকটু ভালো হলে ভালো হতো। তবু যে-কাজটায় এরা হাত দিয়েছেন, সাধারণ মানুষের জীবনবোধের সঙ্গে বিজ্ঞানবোধকে মেশানোর কাজটা, সেটা যেমনি মূল্যবান তেমনি কঠিন। ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে, কিন্তু ফাঁকিবাজির কোন স্থান নেই। আরো তৈরি হয়ে নামতে হবে বিজ্ঞানকর্মীদের—মনে মনে ভাবলাম।

ওপাশে পর্দা টাঙিয়ে ফিল্ম দেখানো হচ্ছে। সব ইংরাজি তথ্যচিত্র। **Health & Society, Evolution of Man, The Zoo** এইসব। খুব কমই বুঝছে কিংবা কিছুই হয়ত বুঝছে না লোকে, তবু ভিড়ের কিছু কমতি নেই। বিনা-পয়সায় ছবি দেখার সুযোগই বা কবার আসে অধিকাংশ লোকের জীবনে!

প্রশংসা করবার মতো অন্য আয়োজন হলো পোস্টার প্রদর্শনীর। অনেকগুলি বিষয়ে পোস্টার। একটা-দুটো বাদে সবই কলকাতা থেকে আনা। **The Tenth Man**—প্রতিবন্ধীদের ওপর প্রায় ৩০/৩২টা ইংরিজি পোস্টার। যতগুলো পোস্টার প্রায় ততগুলো ছবি। মনোযোগ আকর্ষণের উপকরণ যথেষ্ট। খুবই মূল্যবান—উদ্দেশ্য এবং অর্থ, দু-দিক থেকেই।…'আসুন একটু বিচার করি'—হস্ত-রেখাবিদ্যা আর জ্যোতিষশাস্ত্রকে খণ্ডন করে বানানো বাংলা পোস্টার। রক্তে-মেশা বিষয়, তাই মন টানবেই। বেশ বর্ণ-বৈচিত্র্যও রয়েছে।……এরকমই আরেকটি পোস্টার সেট 'যে না মানে সে গাধা'—কুসংস্কার বনাম বিজ্ঞানবোধ-এর আলোচনার বিষয়। ১০ মার্চে '৮২-র অষ্টগ্রহ সম্মেলন নিয়ে বানানো পোস্টারও ছিল। গ্রহ-সম্মেলনে কোন ভয়ের ব্যাপার নেই, অপপ্রচারে কান দেবেন না—এই কথাগুলি সুন্দর করে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ দূষণ নিয়েও একটা পোস্টার সেট ছিল।…এককথায় বলতে গেলে পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজনটা সার্থক হয়েছে। মেলার বহু মানুষ এসে দেখেছেন, প্রশ্ন করেছেন, আলোচনা করেছেন, মাঝে মাঝে ভিড় উপচে পড়েছে, দু-এক সময় বেশ তর্ক-বিতর্কও হতে

দেখলাম পোস্টারের বিষয়বস্তু নিয়ে। অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত সুস্থ বিতর্ক।

—শুনুন, একটু এদিকে আসবেন?

একজন ভদ্র পোশাকের গ্রাম্য যুবক বিজ্ঞানকর্মীদের একজনকে আলাদা করে ডেকে নিলেন।—দেখুন, এই যে আমার চোখ দেখছেন, খারাপ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, এখনো দেখাচ্ছি। কিছুই উপকার হলো না। আমি নাকি অন্ধ হয়ে যাবো। সত্যি বলতে কি সতীমায়ের ভরসা আমার নেই। আপনাদের দেখে জোর পাচ্ছি। কি করি বলুন তো? আপনারা বিজ্ঞানের লোক, কলকাতায় থাকেন, অনেক জানেন। চোখটা কি করে সারবে বলুন তো!

স্পষ্ট উত্তর দেওয়া যায় নি এই অসহায় মানুষটিকে। উত্তর সেই মলিন চেহারার লোকটিকেও দেওয়া যায় নি যিনি একই রকম প্রত্যাশী চোখ নিয়ে আরেক কর্মীর হাত দু-হাতে ধরে বলেছিলেন—আমার বউটার একটা কিছু করতে পারেন আপনেরা? পণ্ডিত লোক আপনেরা, বিজ্ঞান জানেন। সতীমায়ে আমার বিশ্বাস নাই।

—কি হয়েছে আপনার স্ত্রীর?

—যক্ষ্মা, দাদা যক্ষ্মা। টি বি। তায় আমার কাজ-কাম নাই। কুনো কাজের সন্ধান দিতে পারেন?

কঠিন, আরো কঠিন সব প্রশ্ন। ঘুরে ঘুরে দেখলাম বিজ্ঞান প্রদর্শনী মানুষদের টানছে বটে, কিন্তু বহু দুরূহ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে কর্মীদের যার উত্তর বা সমাধান তাদের কাছে নেই। এর উত্তর রয়েছে সমাজ-ব্যবস্থার গভীরে, উত্তর রয়েছে মানুষ ও তার আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে। এগুলি এড়িয়ে যাওয়া চলে না। বিজ্ঞান অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞান প্রচার যদি এইসব চিন্তাকে বাদ দিয়ে কেবল 'জ্ঞান' দেওয়া ও মনোরঞ্জনের কাজে নিয়োজিত থাকে তাহলে সে বিজ্ঞানচর্চায় ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। সতীমা-র মেলায় বিজ্ঞান অনুষ্ঠানের সৎ ও সুষ্ঠু প্রয়াস আমাদের কাছে আরেকবার এই সত্যটিকে এনে হাজির করলো।

সঞ্জয় পণ্ডিত

এপ্রিল ১৯৮২

আবার ঘুরে সতীমায়ের মেলায়

চার বছর পরে, যা দেখলাম যা বুঝলাম

কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের বিরাট মেলা বসে ফি-বছর, দোল পূর্ণিমার সময়। এবছরও বসেছিল। দিন সাতেকের মেলা, লোক জমেছে কাতারে কাতারে। মূলত 'কর্তাভজা' ধর্ম-সম্প্রদায়ের মেলা ছিল এটি, এখন সব সম্প্রদায়ের সব ধর্ম-অধর্মের মানুষজনই ভিড় করে ঘোষপাড়ার মেলায় অগাধ বিশ্বাসে, অন্ধ মনের তাড়নায়।

মেলা প্রাঙ্গণের দক্ষিণে আছে এক এঁদো পুকুর, বদ্ধ নোংরা জল (হাজারো মানুষের পায়খানা-প্রস্রাবের জায়গাও এটি, মেলার সময়)। এই পুকুরের নাম 'হিমসাগর', আরো বেশি ভক্তিপ্রাণ লোকেরা 'পুণ্য দুধসাগর'ও বলেন। এই পুকুরের জলের নাকি যাদুকরী গুণ আছে। এই জলে ডুব দিয়ে, এই জল-মাটি (চূড়ান্ত দূষিত নিঃসন্দেহে) খেয়ে নাকি অন্ধ দৃষ্টি পায়, বোবা কথা ফিরে পায়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ এই অমোঘ বিশ্বাসের ভরসায় প্রতি বছর তাদের বোবা-কালা সন্তানকে নিয়ে এসেছেন এখানে। পাণ্ডাদের সহায়তা নিয়ে অবোধ শিশুকে 'হিমসাগরে'র ধারে এনে অকথ্য অমানবিক অত্যাচার করা হয়েছে, বোবাকে কথা বলানোর চেষ্টায়। গল্প নয়, জ্বলন্ত সত্য। এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা আমরা বলেছি ঠিক আগের রচনাটিতেই—ধর্মের নামে, অবৈজ্ঞানিক ধারণার তাড়নায়, জঘন্য অমানবিক প্রক্রিয়ার দলিল। উৎস মানুষ-এর মুষ্টিমেয় কর্মী এবং জনা কয়েক সহানুভূতিশীল মেলার মানুষ সেদিন সামান্য ক্ষমতায় চেষ্টা করেছিলেন অসহনীয় অত্যাচার ঠেকাতে, চেষ্টা করেছিলেন অসহায় বোবা শিশুর ততোধিক অসহায় পিতামাতাকে যতটা সম্ভব বোঝাতে। কিন্তু তা করতে গিয়ে আমরা সেদিন, সেই ১৯৮২ সালে, অনুভব করেছিলাম আমরা নিজেরাও কত অসহায়। সেদিন মেলায় একটা বিজ্ঞান প্রদর্শনীরও আয়োজন ছিল, প্রদর্শনী মানুষজনদের আকর্ষণও হয়তো করছিল, কিন্তু জীবন ও জীবিকা নিয়ে বহু দুরূহ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল কর্মীদের যার উত্তর বা সমাধান কর্মীদের কাছে ছিল না।...

যাইহোক, এরপর, এই চিন্তাটা প্রসারিত হয়েছে বিভিন্ন গণমুখী বিজ্ঞান সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে। ১৯৮৬ সালে, চুঁচুড়ার 'প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র' উৎস মানুষ এপ্রিল '৮২-র প্রকাশিত রিপোর্টিং-এর অংশবিশেষ ছাপিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের মধ্যে বিলি করেছেন। উদ্দেশ্য সতীমা-র মেলা উপলক্ষে হিমসাগরকে ঘিরে প্রতিবন্ধীদের ওপর যে-অমানুষিক নির্যাতন চলে তা বন্ধ করা এবং সাথে সাথে সাধ্যমতো প্রতিবন্ধীদের বিকল্প বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। ঘটনা দেখে আসতে এবছরও আমরা সতীমায়ের মেলা ঘুরে এলাম। কি দেখে এলাম সে কথাই বলব।

'হিমসাগর'কে নিয়ে বহু গল্প-কথা আছে। হিমসাগর বিঘে দুই-তিনের একটা পুকুর যাতে বর্ষাকালে কিঞ্চিৎ জল জমে। অন্য সময় শুকনো খটখটে। সতীমায়ের মেলার ঠিক আগে এ-পুকুরে বড় জোর পায়ের গোড়ালি ডোবানো যেতো। গত চার-পাঁচ বছর ধরেই প্রতিবার দোল পূর্ণিমার দিন দুই আগে পুকুরের একধারে মাটির গভীরে পাইপ বসিয়ে পাম্পে করে মাটির তলা থেকে জল তুলে পুকুরে ঢালা হয়। এ-বছর আমরা দোল পূর্ণিমার দিন সকালে যখন এই সাগরে (পুকুরে) যাই তখনও পাম্প চলছে। দু-দিন ধরে পাম্প করে জল তুলে পুকুরে ঢেলেও জলের গভীরতা কোথাও কোমর জলের বেশি করা যায় নি। সেখানেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্নান করছে।...

—নাম?

—ভগবতী ঘোষ।

—কোথা থেকে এসেছেন?

—পাঁচদাড়া পলাশীপাড়া।

—এসেছেন কেন?

—দেখছ তো বাবা, আমার এই গলা (গয়টার)। শুনলুম হিমসাগরে স্নান করলে সর্বরোগ জ্বালা দূর হয়ে যায়। তাই এলুম ডুব দিতে।...

—নাম?

—ছেলের নাম না আমার? ও বাবলু মণ্ডল, আমার নাম কল্যাণ মণ্ডল।

—বাসা?

—হাওড়া জেলা বাগনান।

—কেন এসেছেন?

—ছেলে কথা বলতে পারে না, কানেও শোনে না। অল্প বয়সে, তিন চার বছর আগে, একবার চান করিয়ে নিয়ে গেছি। উপসম হয় নি। আবার এলুম—

এবার যদি কিছু হয়।...

মেলায় প্রতি তিন-চার মিনিট অন্তর অন্তর মাইকে বলা হচ্ছে—যারা কথা বলতে পারে না, কানে শুনতে পারে না, বোবা-কালা-অন্ধ মানসিক জড়তা সম্পন্ন—এদের নিয়ে যারা এসেছেন, তারা আমাদের NSS ক্যাম্পে এসে যোগাযোগ করুন। এখানে প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এদের বৈজ্ঞানিক-ভাবে পরীক্ষা করে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

NSS ক্যাম্পের গায়েই প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্রের ক্যাম্প। কুড়ি-পঁচিশ জন মহিলা পুরুষ রীতিমতো কর্মব্যস্ত। সেখানে সংগঠক সুব্রত ব্যানার্জীর সাথে কথা হলো।

—আপনাদের 'উৎস মানুষ' পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯৮২ সালের কল্যাণী ঘোষপাড়ার সতীমায়ের মেলার ওপর প্রতিবেদনটি পড়ে হিমসাগরে প্রতিবন্ধীদের ওপর অত্যাচার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হই। এরপর আমরা কয়েকজন ব্যক্তি এবং কয়েকটি সংগঠনের সাথে কথাবার্তা বলি। বিশেষ করে চুঁচুড়া ক্লাবের সাথে কথাবার্তা হবার পর আমরা ঠিক করি সতীমায়ের মেলায় ক্যাম্প করব। প্রতিবন্ধীদের রোগ সারানোর নামে অমানুষিক অত্যাচার বন্ধ করব। গত বছরই আমরা এখানে প্রথম ক্যাম্প করি। দোলের দিন। সে-বছর আমরা ৫০/৫৫-টা কেস পাই। এদের মধ্যে প্রায় চল্লিশ জন পরে আমাদের চুঁচুড়ার সেণ্টারে এসে ফাইনাল টেস্টিং করিয়ে যায়। এদের মধ্যে ২২ জনের বেশ উন্নতি হয়। এরা পরবর্তীকালেও আমাদের সেণ্টারের সাথে যোগাযোগ রাখে।

এবারে আমাদের এই প্রোজেক্ট-এ আরও বেশ কয়েকটা সংগঠন এসেছে। আমরা একসাথে কাজ করছি। আমাদের সাথে আছে 'রিহ্যাবিলিটেসন সেণ্টার ফর চিল্ড্রেন', 'ইছাপুর ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুল', 'মনোবিকাশ কেন্দ্র', 'ইউনেসকো,' 'সোসিও লিগাল এইড অ্যাণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার' এবং 'অক্সফাম', আমরা শুধুমাত্র দোলের দিনই ক্যাম্প করি। এ-বছর এখনো অব্দি, মানে এই বেলা সাড়ে দশটার মধ্যেই ছাপ্পান্নটা কেস পেয়েছি। বুঝতেই পারছেন, খবর বেশ ভালোই। এ-বছর আমাদের ভলাণ্টিয়ারের সংখ্যা চৌত্রিশ জন। বারো তেরজন হিমসাগরের আশেপাশে রয়েছে। সেখান থেকে কেস ধরে নিয়ে আসছে। এবছর বেশ কিছু কেস সরাসরি আমাদের এখানে এসেছে। মাইকের ঘোষণা শুনেই তারা এসেছে, হিমসাগরে যায় নি। হিমসাগরের কাছে যদি কয়েকটা চোঙ বসানো যেতো ভালো হতো। মাইকের আওয়াজ সেখানে পৌঁছচ্ছে না।

সে যাই হোক, মনে হয় এ-বছর বোবা-কালা ছেলে-মেয়েদের পাণ্ডাদের

হেফাজতে রেখে কথা বলানোর চেষ্টা কমেছে। বাবা-মা নিজেরাই ব্যাপারটা করছে।

এরই মধ্যে প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্রের এক ভলান্টিয়ার হিমসাগর থেকে একটি ছেলেকে তুলে নিয়ে এলেন। সুব্রতবাবুর কোমর অব্দি জলে ভিজে জব্‌জব্‌ করছে। ৬/৭ বছরের ছেলেটিকে জলে ডুবিয়ে মা-বাবা চেষ্টা করছিলেন কথা বলানোর।

এরা '৮৬-তে প্রতিবন্ধীদের ওপর হিমসাগরে অত্যাচার নিয়ে একটি ভিডিও ফিল্মও তুলেছেন। উদ্দেশ্য ব্যাপক প্রচার করে প্রতিবন্ধীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা।

আরেকটা প্রসঙ্গে দু-চার লাইন না বললেই নয়। বিরাশি সালের পর থেকে প্রায় প্রতিবছরই বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের পক্ষ থেকে এখানে কিছু বিজ্ঞান অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। '৮৬ সালেও হয়েছিল। তবে তা বড়ই অসংগঠিত এবং অনুষ্ঠান কি ভাবে বেশি বেশি করে কার্যকর করে তোলা যায় সে-ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনাও অসংলগ্ন।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের NSS কর্তৃপক্ষ প্রতিবছরই বেশ কিছু টাকা-পয়সা খরচ করে প্রচুর ভলান্টিয়ার নিয়োগ করে, মেলায় শৃঙ্খলা রক্ষার কাজটি করে থাকেন। কাজটি ভালোই, তবে এর সাথে সাথে যদি তারা প্রতিবন্ধীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করার কাজটিও করতেন আরো ভালো হতো।

প্রদীপ দত্ত

মে ১৯৮৬

গঙ্গাজলে রোগজীবাণু

একবিন্দু গঙ্গাজলেরও অপার মহিমা। 'সর্বপাপহর পুণ্যতোয়া' গঙ্গার বুকে যে সুধারস অকৃপণ ধারায় বইছে তার অলৌকিকতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ নাকি—গঙ্গাজলে কখনো পোকা হয় না। যে কোন ধর্মভীরু হিন্দু এ-কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। বিশ্বাসের বড় কারণ হলো—গঙ্গা থেকে তুলে আনা এক বোতল জল দীর্ঘকাল ঘরে রেখে দিলেও তাতে পোকামাকড় বিশেষ দেখা যায় না, অথচ এক বোতল কলের জলে দিন দুয়েক পরেই পোকা কিলবিল করতে দেখা যায়। অকাট্য প্রমাণ !! অতএব 'গঙ্গাজলের মহিমা'য় সন্দেহ করে কে !

কিন্তু বিজ্ঞানীরা উল্টো কথা বলছেন। তাদের বক্তব্য হলো, জলে পোকা-মাকড় ব্যাকটিরিয়া ভাইরাস ইত্যাদি আছে কি নেই তা জানতে হলে খালি চোখে দেখা মোটেই যথেষ্ট নয়। মাইক্রোস্কোপে দেখতে হবে, নানাবিধ জৈব রাসায়নিক পরীক্ষা করতে হবে। ল্যাবরেটরিতে সেরকম পরীক্ষাদি করে জানা গেছে—গঙ্গাজল আদৌ বিশুদ্ধ নয়, যথেষ্ট পরিমাণ রোগজীবাণু এতে আছে এবং তাতে অসুখ-বিসুখ হয়। তবে এদের পরিমাণ সীমিত এবং যথেচ্ছহারে বংশবৃদ্ধিও এদের ঘটে না। এর কয়েকটি কারণ আছে :

১. গঙ্গাজলে রয়েছে ব্যাক্‌টিরিওফেজ (Bacteriophage) নামে এক ধরনের ভাইরাস, যা রোগ-জীবাণুকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে। ফলে গঙ্গার জল দিয়ে E-coli, Pseudomonas, Klepsiella Salmonella প্রভৃতি জীবাণু মারা যায়। এই ব্যাক্‌টিরিওফেজ ভাইরাস কেবল গঙ্গায় নয়, অন্যান্য নদী ও পুকুরেও আছে, এমনকি পয়ঃপ্রণালীর নোংরা জলেও আছে।

২. গঙ্গাজলে Dellovibrio Parasite ব্যাকটেরিয়া আছে যারা জীবাণু-কুলের শত্রু।

৩. আর আছে, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক-উৎপাদনকারী অতি ক্ষুদ্র জৈব দেহ (micro-organism)। অ্যান্টিবায়োটিক যে রোগ-জীবাণু মারে সে তো সবারই জানা।

এই তিনের উপস্থিতিতে গঙ্গাজলে ব্যাপক জীবাণুর জন্ম ব্যাহত হয়। এছাড়া

গঙ্গায় সর্বদা স্রোত থাকে—জল আটকা থাকে না, আর গঙ্গাতীরের কল-কারখানার অ্যাসিড ও বিষাক্ত পদার্থ প্রতিনিয়ত গঙ্গার বুকে পড়ছে। এ-কারণেও জলাশয়ের পরিচিত পোকা ও জীবাণুরা গঙ্গাজলে বিশেষ জন্মায় না। তা বলে গঙ্গাজল কখনোই জীবাণুমুক্ত থাকে না।

☐ তথ্যগুলি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো-কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ও গবেষকদের থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

পুণ্যধাম বারাণসীর গঙ্গাজল কেমন

কেবল বারাণসী থেকেই বছরে হাজার তিনেক মৃতদেহ আধপোড়া অবস্থায় গঙ্গার বুকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়—ফলে গঙ্গার জলের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার ক্ষমতার ওপর প্রবল চাপ পড়েছে। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ বি ডি ত্রিপাঠী হিসেব করে দেখেছেন, বছরে ১৪০ থেকে ২০০ টন ওজনের মৃতদেহ এবং ২০০ থেকে ৩০০ টন ছাই জলে ফেলে দেওয়া হয়। মানুষ ছাড়াও অন্যান্য অনেক জীবজন্তুর মৃতদেহও গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়—এর পরিমাণও কম নয়, বছরে ৬ হাজার। আবার গঙ্গার ধারে ধারে যেসব শিল্প রয়েছে তা থেকেও রোজ গঙ্গার জলে নোংরা ফেলা হয়। এক রাজঘাটেই ঘণ্টায় ৩০০ গ্যালন অশুদ্ধ জল গঙ্গায় এসে পড়েছে।

সূত্র : পি টি আই, আনন্দবাজার, ২২ ডিসেম্বর '৮১

সংযোজন

গঙ্গাজলে রোগজীবাণু

গঙ্গাজলের মহিমা সম্পর্কে ব্যাপক জনমানসে যে ধারণা, তার সমর্থনে ঘরে সঞ্চিত গঙ্গাজলে 'পোকা' না হওয়ার কথা অনেকে উল্লেখ করেন। সাধারণভাবে এ-ধারণা যে ঠিক নয়, গঙ্গাজলেও যে আণুবীক্ষণিক জীবাণু থাকতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে থাকেও সে-কথাই বলা হয়েছে সংক্ষিপ্ত করে ঠিক আগের রচনাটিতে। কিন্তু সেখানে এমন কিছু কথা বলা হয়েছে এবং এমন কিছু না-বলা কথার আভাস রয়ে গেছে যা থেকে এমন ভ্রান্ত ধারণারও সৃষ্টি হতে পারে যে, ক্ষেত্রবিশেষে গঙ্গাজলে 'পোকামাকড়' বা জীবাণু শুধু যে খুবই সীমিত থাকতে পারে তাই নয়, কোন কোন রোগজীবাণুর প্রতিরোধেও বুঝি গঙ্গাজলকে ব্যবহার করা সম্ভব। এরকম বিভ্রান্তি অবসানের প্রয়াসে দু-টি ছোট্ট পরীক্ষার ফলাফল এবং প্রাসঙ্গিক কিছু পরীক্ষামূলক তথ্য আলোচ্য রচনার পরিপূরক হিসেবে এখানে দেওয়া হলো।

পরীক্ষা : ১

ভালোভাবে গরম জলে ধোয়া তিনটি পরিষ্কার কাঁচের শিশিতে একই দিনে প্রায় আধ-লিটার টিউবওয়েল, পুকুর ও গঙ্গার জল রেখে তিনদিন পর দেখা গেল— পুকুরের জলে সত্যিই 'পোকা' কিলবিল করছে, কিন্তু কলের ও গঙ্গার জলে তেমন কিছু নেই। সংগ্রহের সময় পুকুরের ও গঙ্গার জল ছিল ঘোলা ও অর্ধস্বচ্ছ। তিন দিন পর সেগুলি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়েছে, নিচে কিছু তলানি হয়েছে। টিউব-ওয়েলের জল গোড়া থেকেই পরিষ্কার ছিল। দশদিন পরেও পুকুরের জলের শিশিতে 'পোকাগুলি' দৃশ্য ছিল। ভালো করে লক্ষ্য করতে দু-রকম 'পোকার' অস্তিত্ব বোঝা গেল। অভিজ্ঞজনের মতে ওরা ডাফ্‌নিয়া ও মশার লার্ভা বা শূককীট। এ-পরীক্ষার সময় ছিল '৮২-র জানুয়ারি মাস।

পরীক্ষা : ২

প্রথম পরীক্ষার মতোই তিনটি পাত্রে টিউবওয়েল, পুকুর ও গঙ্গার (ব্যারাকপুর গান্ধীঘাট থেকে সংগৃহীত) জল নিয়ে পরীক্ষাগারে সেগুলিকে সেন্ট্রিফিউজ করে তলানি অংশ সংগৃহীত হয়। উদ্দেশ্য—এসব জলের মধ্যে ভাসমান-ভ্রাম্যমান আণুবীক্ষণিক জীবাণুগুলিকে একত্রে অল্প পরিমাণ জলে সংগ্রহ করা। এরপর

তিনটি কাচের বিশেষ পাত্রে (পেট্রিডিস) কৃত্রিম খাদ্য-মাধ্যমে দু-ফোঁটা করে ঐ তলানি জল দিয়ে সেগুলিকে স্বাভাবিক উষ্ণতায় (৩০ °সে.) রাখা হয়। একদিন পরে দেখা যায়, সবগুলিতেই জীবাণু বা ব্যাকটিরিয়ার কলোনী (সমাবেশ) তৈরি হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে তিনটি পেট্রিডিস-ই রঙ-বেরঙ-এর জীবাণুর (প্রধানত ব্যাকটিরিয়া ও ফাংগাস বা ছত্রাক) কলোনীতে ভরে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, গরম জলে ধোয়া পরিষ্কার কাঁচের শিশিতে জল সংগ্রহ করা হলেও এবং বাড়ি থেকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে আসার সময় শিশির মুখ পলিথিন বা ছিপি দিয়ে আঁটা থাকলেও, এ-ব্যবস্থায় বাইরের জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরীক্ষাটি তাই আবার করা হলো।

এবার পরীক্ষাগার থেকে তিনটি কাঁচের ফ্লাস্ককে অটোক্লেভে (প্রেসার কুকারের বড় সংস্করণ বলা যেতে পারে) জীবাণুমুক্ত করে, জীবাণুমুক্ত তুলো দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়ে যাওয়া হয়। টিউবওয়েল, পুকুর ও গঙ্গার (ব্যারাকপুরের গঙ্গা— পাড় থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরের) জল ভরেই ফ্লাস্কের মুখ আবার ওই বিশেষ তুলো দিয়ে বন্ধ করা হয়। এবার জলগুলিকে সেন্ট্রিফিউজ না করেই ব্যবহার করা হয় পেট্রিডিসে-র খাদ্য-মাধ্যমে। এটি দু-বার করা হয়, একবার সরাসরি আর একবার ২০ গুণ লঘু করে (পাতিত বা জীবাণুমুক্ত বা অটোক্লেভ্ড্ জল দিয়ে লঘু করা হয়)। দু-ক্ষেত্রেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুকুরের ও গঙ্গার জলে ব্যাকটিরিয়ার সমাবেশ বা কলোনী দেখা যায়। তুলনামূলকভাবে পুকুরের জলের পেট্রিডিসে অবশ্য কলোনীর ঘনত্ব বেশি ছিল। ৪৮ ঘণ্টা পরে, টিউবওয়েলের জলেও ব্যাকটিরিয়ার কলোনী দৃশ্য হয়। চারদিন পরে টিউবওয়েলের জলের ডিসে দু'-একটি ফাংগাসের কলোনীও দেখা যায়। কিন্তু পুকুর ও গঙ্গা জলের পাত্রে এবার কোন ফাংগাস দেখা যায় নি। উল্লেখ করা যেতে পারে, কৃত্রিমভাবে পেট্রিডিসে বংশবৃদ্ধির পর বিভিন্ন জীবাণুকে যে-কোন বিশেষজ্ঞ সহজেই মাইক্রোসকোপের সাহায্যে সনাক্ত করতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় উৎস বিশেষে তিনটি ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ ব্যাকটিরিয়ার প্রাধান্য আছে।

আলোচনা :

সাধারণত লোকে খালিচোখে দৃশ্যমান 'পোকা'র কথাই বলেন এবং প্রথম পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় যে, এ-ধরনের 'পোকা' না হওয়াই যদি গঙ্গাজলের বিশুদ্ধতা বা পবিত্রতার প্রমাণ হয়, তবে টিউবওয়েলের জলও সমান 'বিশুদ্ধ' বা 'পবিত্র' হতে পারে। ডাফ্নিয়া বা মশার লার্ভার অস্তিত্ব শুধুমাত্র স্থির ও উন্মুক্ত জলেই সম্ভব, তাই শুধুমাত্র গঙ্গার জল কেন, টিউবওয়েলের জলেও এদের দেখা যায় নি,

যে-কোন স্রোতযুক্ত নদীর জলেও এরা অনুপস্থিত থাকবে বলে ধরে নেওয়া যায় সঙ্গত কারণেই।

পরীক্ষা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, গঙ্গাজল মোটেই জীবাণুশূন্য নয়। গঙ্গাজলে অবশ্যই ব্যাকটিরিওফেজ, Delloribrio parasite bacteria এবং কিছু অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনকারী জৈব দেহ থাকতে পারে (আগের রচনা, পৃ: ১০২ দ্রষ্টব্য), কিন্তু আসল ব্যাপার হলো তাদের পরিমাণ বা ঘনত্ব। একক আয়তন জলে এগুলির পরিমাণ কতটা, তার উপর নির্ভর করবে এদের জীবাণু বিরোধী কার্যকারিতা। গঙ্গার জলে এদের ঘনত্ব বেশি হবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আর তাই 'গঙ্গার জল দিয়ে E. Coli, Pseudomonas, Klepsiella Salmonella প্রভৃতি জীবাণু মারা যায়'—এটা মেনে নেওয়া যায় না।

আর একটি কথা, কলকারখানার অ্যাসিড ও বিষাক্ত পদার্থ গঙ্গাতে যা ফেলা হয় তার মোট পরিমাণ যদিও বিশাল, তবুও বিভিন্ন জীবাণুর বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে এইসব বিষাক্ত পদার্থ মারাত্মক বেশি মাত্রায় (concentration) আছে—এমন বলা যায় না ; নিচের সারণি থেকেই স্পষ্ট হবে। উল্লিখিত পরীক্ষায় ব্যারাকপুরের গঙ্গার জল ব্যবহার করা হয়েছে, ব্যারাকপুর-টিটাগড় শিল্পাঞ্চলে গঙ্গা যথেষ্ট শিল্প-দূষিত। আর নিচের সারণির গঙ্গাজল আর একটি শিল্পাঞ্চল—কাশীপুরের।

সারণি

পদার্থ		গঙ্গাজল		টিউব-ওয়েলের জল	পানীয় জলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উচ্চসীমা
		দিন*	রাত*		
কঠিন পদার্থ (প্রতি লিটারে মিলিগ্রাম হিসাবে)	প্রলম্বিত	৪২০-৬৮০	২৪০-৪৬০	—	৫০০
	দ্রবীভূত	১২০-১৮০	১৬০-২০০	২৬০-৫৬০	
দ্রবীভূত অক্সিজেন (প্রতি লিটারে মিলিগ্রাম হিসাবে)		৬·৬-৭	৬·৩-৬·৭	৩·৮-৬·২	—

* প্রতি ১ ঘণ্টা অন্তর দিনে ৬টি ও রাতে ৬টি জলের নমুনা নেওয়া হয়েছিল।

** তিনটি কলের জল নেওয়া হয়েছিল।

- তবে শুধুমাত্র কঠিন পদার্থের মোট পরিমাণ দিয়েই অপরিশুদ্ধতার ব্যাপারে সবটুকু বোঝা সম্ভব নয়। কি ধরনের পদার্থ আছে তাও বিবেচ্য। সীসা, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, সায়ানোজেন ইত্যাদি খুব কম পরিমাণে থাকলেও মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু তা যেমন বিশেষ বিশেষ জীবাণুর অবাধ বংশবৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকারক, সেই কারণেই bacteriophage ইত্যাদি পরজীবীর বংশবৃদ্ধির পক্ষেও অনুকূল নয়, কেন না নানা ধরনের জীবাণুর দেহকে আশ্রয় করেই এসব পরজীবীর অস্তিত্ব বজায় থাকে।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার: জলের জীবাণু-সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি করে দিয়েছেন গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও নমিতা ঘোষ। গঙ্গাজল ও কলের জলের বিশ্লেষণসংক্রান্ত তথ্য নারায়ণ দেবনাথের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

রবীন মজুমদার

জুন ১৯৮২

অবাক জলপান

যখন কলকাতা তথা সারা বিশ্বে পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে, বলা হচ্ছে —Save your soil, drink clean water, breathe pure air, ঠিক তখনই উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমা শহরের নিকটবর্তী দণ্ডিরহাট (আমতলা) গ্রামের একটি নোংরা পুকুরের (নাম বাবুর পুকুর) জলপান করতে আসছে বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার মানুষ। ধর্মান্ধতা মানুষকে বিষও পান করাতে পারে সেটা বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে আণবিক যুগে পৌছানোর পরেও দেখতে পাচ্ছি। যেখানে বর্তমান দশককে চিহ্নিত করা হয়েছে 'International Water Supply and Sanitation Decade', যার শ্লোগান হলো 'Clean Water and Sanitation for all by 1990', অন্যদিকে ঘোষণা করা হচ্ছে '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য', এই 'শুভক্ষণে' আবর্জনাযুক্ত জলপানপর্ব পুরাদমে চলছে। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে, আমাদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের যথেষ্ট অভাব। WHO (World Health

Organisation) নির্ধারণ করেছে, ভারতে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের বিশুদ্ধ জল ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাব।

জলপান পর্বের কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল, বসিরহাটের স্থায়ী বাসিন্দা লাখোপতি (যিনি আদৌ সাধু বা সন্ন্যাসী নন) মাননীয় পরিমল আইচ মজুমদার সম্প্রতি দেবতা কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, তার ঐ পুকুরের জল তার হাত মারফৎ কোন নির্দিষ্ট রোগের জন্য যদি কেউ পরপর তিনদিন খায়, তাহলে তার রোগ নিরাময় হবে। জলরূপী 'ওষুধ' খাওয়ার সময় ডাক্তারের ওষুধ না খাওয়াই ভালো বলে জনমানসে প্রচারিত। উনি সপ্তাহের প্রতি শনিবারে জলদান করেন। এই জল নিতে দূরদূরান্তের মানুষ আসছে। এমনকি মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, কলকাতা এবং দুর্গম সুন্দরবনাঞ্চল থেকেও। প্রতি শনিবারে সাত/আট হাজার মানুষ আসে। জল বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় ভোর চারটে থেকে বিকাল/রাত অবধি, যতক্ষণ ভক্তের লাইন শেষ না হয়। তবে স্থানীয় 'অভ্যুদয় সংঘ' স্বেচ্ছা-দক্ষিণা গ্রহণ করছে। সংঘের উদ্দেশ্য সাধু। কারণ, অভ্যুদয় সংঘের প্রতিটি সদস্য দৃঢ় তৎপরতায় সুষ্ঠুভাবে জল বিতরণের জন্য সর্বক্ষণ পুলিশবাহিনীর মতো লাঠিহাতে কর্তব্যরত। এতে ক্লাব প্রতি শনিবারে দানস্বরূপ, গড়ে ৭০ টাকার মতো দক্ষিণা পায়।

ভারতে শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ বিশুদ্ধ জলপান করতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে এর পরিমাণ অনেক বেশি। বিশ্বে শতকরা ৮০ ভাগ রোগ জলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ভারতে ৫০ শতাংশ অসুখ অশুদ্ধ জলপানের কারণে ঘটে। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে যখন আন্ত্রিকে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫,০০০ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ২,০০০-এ পৌঁছেছে (মে '৮৪ অবধি), তখন এই বিষাক্ত জলপান চাক্ষুষ করার পর বসিরহাট স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পৌর কর্তৃপক্ষ বিপদসূচক সতর্কবাণী জারি করে বিজ্ঞপ্তি দেয় এবং ঐ ব্যক্তিকেও (পরিমল আইচ মজুমদার) নিষেধ করে। কিন্তু নাছোড়বান্দা ভক্তের দল এই সংবাদ পাওয়ার পর, পৌর কমিশনারকে (সুনীল দাস) গালিগালাজ করে, বাড়িতে হামলা করে হাতের কাছে যা পেয়েছে তা তছনছ করে। ঐ নাছোড়বান্দা ভক্তদের কিছুতেই বোঝানো গেল না। তাই, সাময়িক বিরতির পর পুরাদমে চলছে জলপান। তবু মিউনিসিপ্যালিটি ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়েছে। যে কোন ব্যক্তি পুকুর পাড়ে দাঁড়ালেই চাক্ষুষ করবেন, সবুজাভ জল এবং পুকুরের চারিদিকে ময়লা আবর্জনা পচছে-গলছে। অনেক ড্রেনের আবর্জনা-যুক্ত জল ঐ পুকুরেই এসে পড়ে। এটাও জানা গেল, স্বপ্নের কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি ঐ পুকুরে মাছ চাষের জন্য রাত্রিতে আবর্জনা (মল) ফেলতেন এবং

কাঁটাগাছ পুঁতে রাখতেন যাতে লোকে ও পুকুর ব্যবহার করতে না পারে।

আমরা কলকাতাস্থ 'দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলে'র পক্ষ থেকে সকাল ন-টার সময় যখন উক্তস্থানে পৌছাই, তখন প্রথমেই দেখতে পাই, প্রায় চার হাজার মানুষ রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে জলপানের আশায় তীর্থের কাকের মতো অসীম ধৈর্য নিয়ে সারিবদ্ধ। তবে ঐ দীর্ঘ সারিতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি। সেই অজস্র মানুষের মধ্যে শ'খানেক মানুষের কাছে জানা গেল, তারা যে যেখান থেকে শুনেছে অচলাভক্তি নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। উপস্থিত ভক্তেরা শতকরা ৭০ ভাগ হিন্দু এবং ৩০ ভাগ মুসলিম ধর্মাবলম্বী। ভক্তদের অধিকাংশই নিরক্ষর। ভাবতে অবাক লাগছে—ক্যানসার, টিবি, টিউমার, পক্ষাঘাত, বাত, জনডিস, পেটের অসুখ, এমনকি অস্থিসংক্রান্ত রোগ সারাতেও অনেকে এসেছেন।

প্রথমে হাসনাবাদ থেকে আগত মধ্যবয়স্ক আধাশিক্ষিত একজন লোকের সাথে কথা বলার পর জানলাম, তার এলাকায় বিপুল সাড়া পড়ে গেছে। তিনি আরও বললেন, 'এ জল মিষ্টি ও অনেকের সারছে'। ২৪ পরগণার দত্তপুকুর থেকে আগত নবম শ্রেণীর ছাত্র সমীর বসু তার পায়ের অস্থি সংক্রান্ত ব্যাপারে এসেছে। ছেলেটি হাঁটার সময় বাঁ পা ভাঁজ করতে পারে না। ওর অটল ভক্তি। দু-বার খাওয়ার পরেও উপশমের কোন লক্ষণ দেখছে না। ২০ কিলোমিটার দূর থেকে আগত ব্যক্তি ফুসফুসের টিবি এবং ঐ একই স্থানের বৃদ্ধ টুপিধারী মুসলিম সুফী তার 'জয়েন্টে'র বিভিন্ন জায়গায় যন্ত্রণার জন্য এসেছেন। কলকাতার শ্যামবাজার থেকে ১৬ বছরের যুবতী এসেছে জনডিস রোগের জন্য। কলকাতার ভবানীপুরের ম্যাট্রিকুলেট গিরিন রায় (বয়স ৮০) পেটের ব্যথার জন্য এসেছেন—এ-নিয়ে তিনবার, কোন উপশম হয়নি। ধান্যকুড়িয়া হাইস্কুলের এগারো ক্লাশের ছাত্র মহেন্দ্র সরকার এসেছে কানের রোগ নিরাময়ের জন্য। এরকম নানা মানুষ এসেছে নানা রোগ নিয়ে।

ভারতে প্রতিবছর পানীয় জলবাহিত ব্যাধিতে (water-born disease) পাঁচ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয় ও কুড়ি লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে। যেমন, টাইফয়েড, কলেরা, জনডিস প্রভৃতি। ঐ পুকুরের দূষিত জল পান করলে বিভিন্ন প্রকার water-born disease দেখা দেবে। সম্ভাব্য রোগগুলি হলো, ভাইরাস ঘটিত জনডিস, পোলিও, ব্যাকটিরিয়া ঘটিত ডায়ারিয়া টাইফয়েড ও প্যারাটাই-ফয়েড, প্রোটোজোয়াঘটিত আমাশয় এবং বিভিন্ন প্রকার কৃমি এবং গিনিওয়ার্ম (Guinea worm) রোগ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো হাজার হাজার মানুষ কেন আসছে? বিশ্লেষণের পর হয়ত উপলব্ধি হবে, এরা প্রত্যেকেই হতাশার শিকার এবং বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা ও চেতনার অভাব রয়েছে ভীষণভাবে। তাছাড়া এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থায় সরকারি হিসাবমতে ৫০ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে; ৩৬·২৩ শতাংশ মাত্র অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন এবং ব্যাপক মানুষ অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে। অধিকাংশই ভালো চিকিৎসার সুযোগ পায় না। হাসপাতালগুলিতে অব্যবস্থা এবং তাদের পক্ষে নার্সিং হোমে যাওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠে না। যার ফলশ্রুতি হিসাবে, মানুষ দৈবের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের আশ্রয় গ্রহণ করে। সর্বোপরি স্বাস্থ্য পরিকল্পনা আদৌ সাধারণের উপযোগী নয়। এজন্য বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সর্বাংশে দায়ী।

রফিকুল ইসলাম

নভেম্বর ১৯৮৪

রাজা ট্যান্টেলাস ও তামার কলসী

অভিশপ্ত রাজা ট্যান্টেলাস একবিন্দু জলের জন্য হাহাকার করে মরেছেন। কিছুতেই তিনি মুখে তুলতে পারতেন না জল। ঠোঁটের গোড়ায় এসেই তা থমকে যেত। গল্পটা ছিল এই। তা অভিশাপ তো একটা রূপক মাত্র। এর আড়ালের ব্যাপারটা যদি একটু তলিয়ে দেখা যায় তবে মনে হয় ঘটনাটা ঘটেছিল এ-রকম। হঠাৎ রাজা একদিন চেয়ে বসলেন পরিষ্কার পানীয় জল, যাকে বলে বিশুদ্ধ জীবাণুমুক্ত জল। আর যে করেই হোক কোন জলে জীবাণুর সামান্যতম উপস্থিতিও টের পেয়ে যেতেন রাজা। তাতেই যত বিপত্তি। কারণ বাকি জীবনটা বোধহয় আমাশা, জিয়ার্ডিয়া নিয়ে ঘর করবার বাসনা ছিল না তার। তাই মন্ত্রী-সান্ত্রীরা ছুটল দেশবিদেশে। লোক-লস্কর খেটে খেটে হয়রান। সোনার ঘড়ায় করে বয়ে আনতে লাগল রাশি রাশি জল। কিন্তু কিছুতেই মন ভরে না রাজার। ঠোঁটের কাছে আনেন আর ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেন সব। হবেই বা কি করে, তখনো তো জল পরিশ্রুত করার কোন পদ্ধতিই জানা ছিল না। তবু জেদ ছাড়লেন না রাজা। তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রইলেই নির্জলা। অবশ্য আজকের দিনে জল পরিশ্রুত করার অসংখ্য পদ্ধতি জানা থাকলেও, দেশের কোটি কোটি

প্রজাট্যান্টেলাসরা জীবাণুমুক্ত জল ছাড়াই দিন কাটান। তারা রাজার মতো জেদ ধরতেও জানেন না, আবার জল ছাড়াও চলে না তাদের। অগত্যা এ দেশের মানুষদের মৃত্যুর কারণের তালিকায় সবচেয়ে বড় অংশীদার আজও পেটের বিভিন্ন রোগগুলো। আর রোগভোগের কথা? জীবনে কতবার পেটের বিভিন্ন অসুখে ভুগেছেন তা নিশ্চয়ই কোন হিসেব দিয়ে বোঝাতে হবে না। স্ব-অভিজ্ঞতায় সবাই অনেক ভালোই জানেন সেটা। শুধু পেটের রোগ নয়, আপনাদের জানা না জানা বহু রোগই ছড়ানোর পেছনে জড়িয়ে রয়েছে জল; জলের বিভিন্ন ধরনের দৈনন্দিনের ব্যবহারের মধ্যে, শুধু পানীয় জলের মারফৎ নয়। আর এতো সবারই জানা আগামী 'দু-হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য' কর্মসূচীর যে কথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করেছেন, যার প্রধান অংশীদার আমাদের দেশও, সেখানে তারা এই 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' ব্যাপারটার কিছু সূচক বেঁধে দিয়েছেন। যেমন বর্তমানের শিশুমৃত্যুর হার ১৪০ থেকে নামিয়ে ৫০শে আনা (য়ুরোপের দেশগুলোতে তা ১০-এরও কম), তেমনি আর একটি সূচক হলো সকলের ঘরে ঘরে পর্যাপ্ত প্রতিশ্রুত জলের যোগান সুনির্দিষ্ট করা। ঘরে ঘরে না হলেও অন্তত তা ১৫ মিনিট হাঁটা দূরত্বের আওতায় যেন অবশ্যই থাকে। কিন্তু ১৫ মিনিট তো দূর অস্ত্, যারা কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রমে জল বয়ে আনেন দূরবর্তী কোন অঞ্চল থেকে, প্রশ্নটা আমাদের সেইখানে। তারা আনবেনই বা কিসে করে আর জল জমিয়েই বা রাখবেন কোন্ ধরনের পাত্রে। প্রশ্নটা একটু বেখাপ্পা লাগছে, তাই তো! রাজা ট্যাণ্টেলাস আনিয়েছিলেন সোনার পাত্রে আর ভুলটা করে-ছিলেন তাতেই। যদি তিনি জল আনাতেন তামার পাত্রে? সুশ্রুত-সংহিতায় অবশ্য সেরকমই বিধান ছিল। আর সম্প্রতি নাগপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিস্তৃত পরীক্ষার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করা গেছে যে, তামার পাত্রে জল রাখা শুধু সুবিধাজনকই নয় নিরাপদও বটে। তামার পাত্রের রয়েছে এক বিশেষ গুণ। তা হলো জলকে জীবাণুমুক্ত করার ক্ষমতা। তাই জলে অল্পস্বল্প জীবাণু থাকলে বা সংরক্ষণের সময় দূষিত হওয়ার যে সম্ভাবনা থাকে, তা রোধ করতে পারে তামার পাত্র। দু-হাজার কলিফর্ম ব্যাক্টেরিয়া (একধরনের জীবাণু, যা জলের বিশুদ্ধতা নিরূপণে সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোন জলে যদি কলিফর্ম না থাকে বা থাকলেও যদি প্রতি সি.সি. জলে ১০০-র কম হয়, তবে তা বিশুদ্ধ পানীয় জল হিসেবে ছাড়পত্র পায়) রেখে দেখা গেছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। কারণটা আর কিছুই নয়। তামার পাত্র থেকে কিছু পরিমাণ তামার আয়ন (Cu^{++}) জলে এসে মেশে, আর এই তামার আয়নের

রয়েছে জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা। এরজন্য অবশ্য পাত্রের ভেতরের অংশটি যথেষ্ট পরিষ্কার চক্‌চকে হওয়া চাই। ময়লার কোন আবরণ যেন না থাকে। জলে ফটকিরি বা অন্য কোন ধরনের রাসায়নিক যেন মেশান না হয়। আর প্রতিদিন পাত্রটি ঘষে-মেজে চক্‌চকে রাখতে হবে অবশ্যই। হায়! রাজা ট্যাণ্টেলাস যদি জানতেন ব্যাপারটা।

কিন্তু দেশের সাড়ে পাঁচলাখ গ্রামের মধ্যে ৫০ হাজার গ্রামেও যখন পরিশ্রুত জলের যোগান দিয়ে ওঠা এখনো সম্ভব হয়ে ওঠে নি, আর এইসব গ্রামের অধিকাংশের জীবনে যখন ভাত জোটে না দু-বেলা, নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা, তখন তাদের তামার কলসী কিনতে বলা 'রুটির বদলে কেক' খেতে বলার মতোই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তারা বড়জোর কিনতে পারেন মাটির একটা কলসী। হয়ত এখানেও একটু ভরসা দেওয়া যেতে পারে। যদিও পরীক্ষাটা আজও প্রামাণ্য স্তরে পৌঁছয় নি—বলা হচ্ছে মাটির কলসীরও রয়েছে জল পরিশ্রুত করার কিছু ক্ষমতা। না, মাটির অবশ্যই জীবাণু নষ্ট করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু কলসীর গায়ে রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছিদ্র, এগুলো দিয়ে জল চুঁইয়ে বাইরে আসে—সেখানে এসে বাষ্পীভূত হয়। সমগ্র প্রক্রিয়াটি এইভাবে চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় কিছু পরিমাণ জীবাণুও শোষিত হয়ে যায় ছিদ্রগুলোতে; শুধু জলটা ঠাণ্ডা থাকা নয়, কিছু পরিমাণ পরিশ্রুত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। অনেকটা সেই ঘরে ব্যবহৃত ফিল্টারের মতো। এখানে 'ক্যাণ্ডেল'-এর কিছু কাজ করে দেয় মাটির পাত্র। একইভাবে কাপড়ে কিছু activated কাঠকয়লা বা অভাবে সাধারণ কাঠকয়লা (charcoal) জলে ঝুলিয়ে রাখলে বেশ কিছু পরিমাণ ময়লাও জীবাণুমুক্ত করা যায়। কিন্তু এইসব দিয়ে জলকে পরিপূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা অবশ্যই সম্ভব নয়। মাত্র জল সংরক্ষণের উপায় হিসেবে নেওয়া যেতে পারে।

তবে হ্যাঁ, যারা কলকাতায় বা অন্য কোথাও মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহের সুবিধাটুকু ভোগ করেন, তারা কিন্তু খবরদার, জল জমিয়ে রাখার ব্যাপারে একদম মন দেবেন না। সবাই নিশ্চয়ই জানেন, শহরে জল পরিশ্রুত করার জন্য ব্যবহার করা হয় ক্লোরিন। জীবাণুমুক্ত করার পরও অতিরিক্ত কিছু ক্লোরিন (residual) মেশান হয় জলে, সরবরাহ তথা সংরক্ষণের সময় দূষিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে। কিন্তু কার্যত বিস্তৃত জলের পাইপে জমে থাকা আবর্জনা ও বিভিন্ন জৈব পদার্থ নষ্ট করতে অধিকাংশ অতিরিক্ত ক্লোরিনটুকুই খরচ হয়ে যায়। তাই দূরবর্তী ট্যাপের মুখে জল যখন পৌঁছায় তখন তার ক্লোরিনের পরিমাণ নগণ্যই থাকে। যদি যথেষ্ট পরিমাণ থেকেও থাকত, তাহলেও

একটা কথা মনে রাখা দরকার, তা হলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণও কমতে থাকে। বড়জোর ঘণ্টা দুয়েক এই ক্লোরিন পেতে পারেন আপনি। তাই সব থেকে ভালো উপায় হচ্ছে, প্রতিদিনের জল প্রতিদিনই খরচ করে ফেলা। কারণ জল পরিশ্রুত করার সময় যে পরিমাণ ও যে সময় ধরে ক্লোরিন মেশান হয় তাতে জীবাণুদের বিভিন্ন কঠিন অবস্থা যেমন সিস্ট্ (আমাশা ইত্যাদির), ওভা (বিভিন্ন ধরনের কৃমির ডিম) বা স্পোর (ব্যাক্টেরিয়া)-গুলো মরে না। ক্লোরিনের পরিমাণ কমে গেলে এরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, আমাশার জীবাণুদের এই অবস্থায় বংশবৃদ্ধির হার সাধারণ অপেক্ষা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যায়! আর যারা ঘরে ঘরে ফিল্টার কিনে নিশ্চিন্ত আছেন তাদের জন্যও একটা দুঃসংবাদ আছে, তাহলো এইসব ফিল্টারগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে গিয়ে (Environmental Sanitation Department) দেখেছেন, যদিও এগুলোর সিস্ট্, ওভা ইত্যাদিদের সম্পূর্ণরূপে ছেঁকে ফেলার ক্ষমতা থাকার কথা, কার্যত এই ছাঁকার কাজটি কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। এগুলো কিছু পরিমাণ ফিল্টারের ফাঁক দিয়ে পরিশ্রুত জলে চলে যেতে দেখা যাচ্ছে।

যাই হোক, এতক্ষণ আমরা যে-সব কথা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তা ছিল মূলত পানীয় জলের। জল বলতে সাধারণত আমাদের মাথায় এটাই আসে। আর সেখানেও যথেষ্ট গণ্ডগোল। যদি আগামীকাল আলাদীনের প্রদীপের ছোঁয়ায় আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে জীবাণুমুক্ত পানীয় জল পৌঁছে যায়, তাহলে কি এই সমস্ত পেটের রোগ নির্মূল হয়ে যাবে। অনেকটা কমবে নিশ্চয়ই কিন্তু পুরোটা নয়, যেমন উত্তরপ্রদেশে সমীক্ষায় কলেরা, টাইফয়েডের হার কমিয়ে আনা গেছে ৬৫% থেকে ৭৫% পর্যন্ত। কিন্তু সেখানে পেটের অসুখের হার (dysentary) কমেছে মাত্র ২৩%। ব্যাপারটায় কোন ধাঁধা নেই। আমাদের পেটের বিভিন্ন ধরনের রোগগুলো শুধুমাত্র পানীয় জলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে না, পড়ে জলের অন্যান্য ধরনের ব্যবহারগুলোর মধ্যে দিয়ে। হাত-মুখ ধোওয়া, শৌচকরা, বাসনপত্র, শাকসবজি ধোওয়া থেকে শুরু করে স্নান ইত্যাদি সমস্ত ধরনের জলের দৈনন্দিনের ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই অধিকাংশ রোগগুলো ছড়ায়। শুধু পেটের জানা রোগ যেমন, জণ্ডিস (Viral hepatitis), আমাশা, জিয়ার্ডিয়া বা বিভিন্ন ধরনের পেট খারাপই নয়, গ্রামাঞ্চলের বাচ্চাদের সারা শরীর জুড়ে যে সব খোস, বা কাটা ইত্যাদি থেকে ঘা, এমনকি চোখের রোগ ট্রাকোমা ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ার কিছুটা কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে জলের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারে।

তাই শুধু জলের গুণমান নয় পরিমাণটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ

ব্যাপার। শুধু পানীয় জল নয়, ব্যবহৃত সমস্ত ধরনের জল যেমন পরিশ্রুত হবে, তেমনি পর্যাপ্ত হওয়া চাই। পানের জন্য এক ধরনের জল আর অন্যান্য ব্যবহারের জন্য অন্য ধরনের জল নির্দিষ্ট করাটা আদৌ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার নয়। আজকের দিনে জলবাহিত রোগ (water borne) বলতে সেগুলোই বোঝায়, যা মূলত পানীয় জলের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়—যেমন কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি। আর বাকি পেটের বিভিন্ন রোগ (dysentary) ও অন্যান্য যে রোগগুলোর কথা এতক্ষণ বললাম, যা মূলত ছড়ায় জলের অন্যান্য ব্যবহারগুলোর মধ্যে তাদের বলে water washed বা জলতাড়িত রোগ। জলের পরিমাণের ব্যাপারটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা সম্প্রতি আমেরিকায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পালিত একটি পরীক্ষায় প্রমাণ করা গেছে। সেখানে স্রেফ জলের যোগান পর্যাপ্ত করে পেটের রোগ (dysentary) অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া গেছে। জল সরবরাহ বাড়িয়ে ট্রাকোমার প্রভাব অনেক কমিয়ে ফেলা যায়। কার্যক্ষেত্রে এও দেখা গেছে, জলের যোগান পর্যাপ্ত করলেই তার ব্যবহারটা বাড়ে না যদি না তা পৌঁছে দেওয়া যায় ঘরে ঘরে। তাই 'পর্যাপ্ত জল ব্যবহার স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান অঙ্গ' এটা বোঝা বা বোঝানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেবার ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে।

অবশ্য খোদ কলকাতা শহরেই এখনো জল সরবরাহ করা হয় দু-ধরনের। এক পানীয় জল, দুই গঙ্গার জল। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারবার এ পদ্ধতি তুলে দিতে বলেছেন। আর সব থেকে বিপজ্জনক ব্যাপার হলো আমাদের দেশের জল দেওয়ার পদ্ধতি। যা দেওয়া হয় বিচ্ছিন্ন সময় ধরে। অর্থাৎ দিনের কয়েক ঘণ্টা সরবরাহ করা হয়, বাকি সময়টা জল বন্ধ থাকে। তাছাড়া কম চাপে জল সরবরাহের ব্যাপার তো রয়েছেই। যখন জল দেওয়া বন্ধ থাকে, তখন বিস্তৃত পাইপের অধিকাংশটাই ফাঁকা থাকে। এর ফলে ভেতরের চাপ কম হওয়ার দরুন পাইপে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছিদ্র থাকলে কিংবা খোলা ট্যাপের মুখ দিয়ে (ট্যাপের মুখ প্রায়শই খোলা থাকে) বাইরের ময়লা ইত্যাদি পাইপের ভেতর চলে যায়। একে বলে বিপরীত সাইফন প্রক্রিয়া (Back Siphoning)। জলের চাপ যখন কম থাকে, তখনো এটা ঘটার কিছু সম্ভাবনা থাকে, বিশেষত যখন পানীয় জলের পাইপ ও অন্য জলের পাইপ বা নর্দমার পাইপ পাশাপাশি থাকে। যেহেতু অপর দুটো পাইপে প্রায় সব সময়ই প্রবাহ থাকে, এবং তুলনায় জলের পাইপে যখন কম চাপ থাকে তখন, বিশেষত পাইপের জোড়মুখগুলোর সামান্যতম ফাঁক দিয়েও এটা খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটতে পারে। তাই আজ পৃথিবীর সমস্ত উন্নত শহরে

সমস্তক্ষণ ধরে উচ্চচাপে জল সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। পরিশ্রুত জল সরবরাহের এটি একটি অবশ্য শর্ত।

গ্রামাঞ্চলে অবশ্য আপাতত নলকূপের অন্য কোন বিকল্প দেখা যাচ্ছে না। কেউ হয়ত ক্লোরিন ট্যাবলেট ব্যবহারের কথা বলতে পারেন। এমনিতেই ক্লোরিন মেশানো জলের স্বাদ-গন্ধের জন্য সাধারণের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হয় না, তারপরও এর সম্বন্ধে দু-টি সতর্কতা রয়েছে। এক, ঘোলা জলে ক্লোরিন মেশালে তার কার্যক্ষমতা অনেকটাই বাধাপ্রাপ্ত হয়। জল বেশি ক্ষারীয় হলেও এ-ব্যাপারটাই ঘটবে। আর দ্বিতীয়টা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জলে যে বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ থাকে, ক্লোরিন তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের হ্যালো-জেনেটেড যৌগ। এর কয়েকটি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া গেছে যে, এগুলি ক্যান্সার সৃষ্টিতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাকি কয়েকটি সম্বন্ধেও সংশয় দানা বেঁধেছে। তাই বিশ্বজুড়ে আজ সোরগোল দেখা দিয়েছে। অনেকে ইতিমধ্যে ওজোন গ্যাস (O_3) দিয়ে জৈব পদার্থগুলো ভাঙছেন। কেউ ব্যবহার করতে চলেছেন খরচসাপেক্ষ অতিবেগুনী রশ্মি (Ultraviolet-ray)। অবশ্য আমাদের দেশের শহরবাসীরা এই সামান্য ক্যান্সারের ভয়ে নিশ্চয়ই ভীত হবেন না। আর আমাশা জিয়ার্ডিয়াকে জীবনসঙ্গী করার জন্য বুক বাঁধুন। নইলে একটাই উপায়, ট্যান্টেলাস হতে হবে আপনাদের।

স্মরজিৎ জানা

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩

সাক্ষাৎ বক্রেশ্বর

বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার

'বক্রেশ্বর মনঃ পাতু দেবী মহিষ মর্দিনী
ভৈরবো বক্রনাথস্ত নদী তত্র পাপহরা।'
অর্থাৎ বক্রেশ্বর আমার মনকে রক্ষা করুন—যেখানে দেবী হলেন মহিষমর্দিনী, ভৈরব হলেন বক্রনাথ আর যেখানে নদীটি হলো পাপহরা। ('পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা, ৪র্থ খণ্ড'; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার প্রকাশন—অশোক মিত্র সম্পাদিত।)

এরকম দৈবকামনায় প্রাণমন সমর্পণ করে প্রতিদিন বহু মানুষ ছুটে যাচ্ছে বীরভূম জেলার এই পুণ্যধাম বক্রেশ্বরে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পর্যটনক্ষেত্র, 'ব্যাধি-নিরাময়ের গুণসম্পন্ন' উষ্ণ প্রস্রবণ ক্ষেত্র এবং একাধারে শৈবধাম ও অতি প্রাচীন তন্ত্রসাধনক্ষেত্র এই বক্রেশ্বর। এটি একান্নপীঠের একটি পীঠস্থানও বটে; বলা হয় দেবীর ভ্রূমধ্য পড়েছিল এখানে। বক্রেশ্বরধামকে ঘিরে বক্রেশ্বর নদের ক্ষীণ জলস্রোত মিশেছে কোপাই নদীর সঙ্গে। যেতে হলে সিউড়ি থেকে বাস আছে, মাইল পনের দূর। দুবরাজপুর স্টেশন থেকে উত্তর-পূর্বে ছ-মাইল দূরত্ব হবে। আর আছে পর্যটন বিভাগের বাস।

বক্রেশ্বরের অলঙ্কার বলতে অনেকগুলি শিবমন্দির আর ছোট বড় কুণ্ড। মন্দিরগুলি স্যাঁৎসেঁতে; পুণ্যার্থীদের আনাগোনা আর ফুল-পাতা তেল-সিঁন্দুর জল-কাদায় অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর। প্রস্রবণ বা কুণ্ডগুলির বৈচিত্র আছে। পাশাপাশি আটটি ছোটবড় জলাশয়—সবকটিতেই ক্রমাগত জল উঠছে; কোনটি তপ্ত, কোনটি উষ্ণ, কোনটি ঠাণ্ডা, কোনটিতে আবার বুড়্‌বুড়্ করে গ্যাস উঠছে। শ'তিনেক বছর আগেই নাকি এই বিচিত্র গরম জলের কুণ্ডগুলি আঞ্চলিক মানুষের চোখে পড়েছিল। তাদের বিস্ময় বেড়েছিল আরো এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতায়—কুণ্ডের জলে বহু কঠিন রোগশোক নাকি সেরে যায় ম্যাজিকের মতো। এরকম ধারণা থেকে মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তির জন্ম হয়েছিল সহজেই; অথচ কেন ওই জলাশয়ের জল সব সময় গরম, কোথায় এর উৎস, কেমন করেই বা রোগের

আরোগ্য হয় ওই জলে—এসব প্রশ্নের কোন বস্তুগ্রাহ্য উত্তর সেই প্রাচীনকালে মেলে নি ফলে ব্যাখ্যার জায়গাটা দখল করে নিয়েছে অন্ধবিশ্বাস, রহস্যময় দৈবশক্তির প্রতি অন্ধবিশ্বাস।

শোনা যায়, কিছু তান্ত্রিক প্রথমে বক্রেশ্বরে এসে আসন গেড়ে বসে। দেবীর পীঠস্থান রচিত হয়। মুখে মুখে প্রচার বাড়ে। লোক সমাগম হতে থাকে। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি হয় প্রথম শিবমন্দির—বাবা বক্রনাথের স্থিতি—অষ্টাবক্র-মুনির নামে শিবের অধিষ্ঠান। আটটি কুণ্ডের নামকরণ হয়—অগ্নিকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, ক্ষারকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, জীবৎসকুণ্ড, চন্দ্রকুণ্ড বা সৌভাগ্যকুণ্ড এবং শ্বেত-গঙ্গা। প্রত্যেকটি কুণ্ডের নামকরণের পেছনে একটি করে কাহিনী রয়েছে। যেমন সৌভাগ্যকুণ্ড সম্পর্কে গল্প হলো—হিমালয় কন্যা গৌরী শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য বক্রেশ্বরে এসে তপস্যা করে এবং এই কুণ্ডে স্নান করে ইচ্ছাপূরণের বর লাভ করে। এ-রকম সৌভাগ্য অর্জনের জন্যই কুণ্ডের নাম সৌভাগ্যকুণ্ড। আর তপ্ত জলের সঙ্গে বাবা বক্রনাথের মাহাত্ম্য মেলানোর জন্য প্রচারিত হয়েছে দু-টি নাটকীয় পৌরাণিক আখ্যান। গল্পগুলো শুনলেই বোঝা যায়, কুণ্ডের জল চিরতপ্ত বা চির উষ্ণ থাকা সম্পর্কে মানুষের যে স্বাভাবিক কৌতূহল তা নিরসনের চেষ্টা হয়েছে ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে—বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অভাবে। গল্প দুটো অল্প কথায় বলি।

প্রথম উপাখ্যানের শুরু স্বর্গে, লক্ষ্মীদেবীর স্বয়ম্বর সভায়। নিমন্ত্রিত অনেকে, মর্ত্য থেকে মুনি-ঋষিরাও গেছেন। কিন্তু মহামুনিদের আদর-আপ্যায়ন যেন ঠিকমতো হচ্ছে না, দেবতাদের সঙ্গে বৈষম্য হচ্ছে। মুনিরা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন অনেকেই। সুব্রত মুনির রাগ বরাবরই বেশি। চড়চড় করে বাড়ছে রাগ, শরীর জ্বলছে। শেষমেশ আর সহ্য করতে পারলেন না, ক্রোধের প্রচণ্ডতা এমনই যে চাপা রাগের ভয়ঙ্কর চাপে শরীরের আটটা অঙ্গ বিশ্রীভাবে বেঁকে দুমড়ে গেল। সুব্রত মুনি হয়ে গেলেন অষ্টাবক্রমুনি। সেই বিকৃত চেহারা, তপ্ত শরীর, আর ভাঙ্গা মন নিয়ে মুনি শিবের তপস্যা শুরু করলেন। গুপ্ত-কাশীতে (যা আজকের বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর) শিবসাধনা চলল দশ হাজার বছর। শিব অবশেষে সন্তুষ্ট হলেন ; বর দিলেন—তোমার শান্তি হোক। উত্তাপ বর্জন হোক। তোমার নামেই আমার স্থিতি হবে এখানে। সেই থেকে ওই পুণ্যধাম হয়ে গেল শিবতীর্থ বক্রেশ্বর।

দ্বিতীয় উপাখ্যানের অকুস্থল হলো মর্ত্য। হিরণ্যকশিপু দেবকুলকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ত্রাহি ত্রাহি রব। স্বয়ং নারায়ণ তখন নরসিংহমূর্তি ধারণ করে

হিরণ্যকশিপুকে বধ করলেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু ব্রাহ্মণ সন্তান। ব্রহ্মহত্যার কারণে নারায়ণের হাত-পায়ের নখে তীব্র জ্বালা শুরু হয়। স্বয়ং ভগবানের এই যন্ত্রণার খবর পেয়ে ছুটে এলেন অষ্টাবক্রমুনি—নারায়ণের সব জ্বালা তুলে নিলেন নিজের শরীরে। নিয়েই শুরু হলো তার অসহনীয় দেহ-যন্ত্রণা। ভক্তের এই কষ্ট দেখে এবার ভগবান নারায়ণেরই কষ্ট হলো। তিনি মুনিকে বললেন—ওহে অষ্টাবক্র! তুমি শিবের মাথা স্পর্শ করে বসে থাকো ; ভারতের যত তীর্থ, সব তীর্থের জল অন্তঃসলীলা হয়ে এসে তোমার মাথায় পড়বে—তোমার জ্বালা দূর করবে। তাই হলো। মুনির অবস্থান হলো গুপ্তকাশীতে। তার জ্বালা-যন্ত্রণা-ধোয়া জল তাপ বহন করে এনে জমতে থাকলো বক্রেশ্বরের কুণ্ডগুলিতে। তাই সে জল চিরতপ্ত এবং দৈবগুণে সমৃদ্ধ।

রাজগীরে ভিড়ের চাপে মৃত্যু

১৪ মার্চ। আজ এখানে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে গিয়ে ভিড়ের চাপে পনের জন মারা যান। এদের মধ্যে দশজন মহিলা আছেন। কুন্ড থেকে সব মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে। জেলা প্রশাসন মৃতদেহ সংকারের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে ৫০০ টাকা দিয়েছে।

মলমাস-মেলার শেষদিনে অমাবস্যা পড়ায় অসংখ্য পুণ্যার্থী যখন স্নানের অপেক্ষায় ছিলেন তখন নির্ধারিত সময়ে গেট খোলার আগেই জনতার একাংশ গেট ভেঙে ফেলে। একমাস ধরে মলমাস মেলা চলছিল।···

[পি টি আই, যুগান্তর, ১৫ মার্চ, ১৯৮৩]

পৌরাণিক উপাখ্যান তার আপন বৈশিষ্ট্যে ডালপালা বিস্তার করে। কিন্তু সে তো পুরাণকালেরই কথা। আজ বিজ্ঞানের বিকাশ তপ্তকুণ্ড বা উষ্ণ প্রস্রবণের (hot spring) নির্ভুল ব্যাখ্যা এনে দিয়েছে। কোথা থেকে কোন্ জল কি-ভাবে আসছে, কী তার উপাদান, কী তার ক্রিয়া—সবই ধীরে ধীরে জানা হয়ে গেছে। তবু ধর্মস্থানের প্রতি অন্ধমোহের আবরণ সাধারণ মানুষের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলকে আবৃত করে রাখে ভীষণভাবে। এবং যেহেতু সে আবরণকে টিকিয়ে রাখতে পারলে অধ্যাত্মবাদী ও ধর্মব্যবসায়ীদের প্রভাব এবং ব্যবসাও টিকে থাকে,

তাই এখানে স্বার্থের খেলাও চলে খুব। কিন্তু বিজ্ঞানের বর্শামুখ স্থবির বিশ্বাসের অচলায়তনকে ধ্বসিয়ে দিয়েছে বার-বার। এরকম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের গতি প্রকৃতির খবর এবং ধর্মবিশ্বাসের ব্যূহের মধ্যে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের খবরগুলির সঙ্গে খুববেশি জানাচেনার সুযোগ আমাদের হয় না। আপাতত বক্রেশ্বরে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়টি আমরা আলোচনা করব।

উষ্ণ প্রস্রবণের জল-বাতাসে চর্মরোগ, পেটের রোগ এবং অন্যান্য বেশ কিছু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের ব্যাপারটি দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর নানা দেশেই প্রচারিত। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। উন্নত দেশগুলিতে উষ্ণ-প্রস্রবণের চিকিৎসাকেন্দ্র বা SPA এক সময় স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জায়গা হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিজের চক্ষু চিকিৎসার জন্য অষ্ট্রিয়ায় গিয়েছিলেন। চোখে অস্ত্রোপচারের পর তিনি কিছুদিন কার্লসবাড-এর স্পা-তে গিয়েছিলেন হাওয়া বদল করতে। সেখানকার চিকিৎসার প্রক্রিয়া এবং চমৎকার আবহাওয়া বিধানচন্দ্র রায়কে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বীরভূমের বক্রেশ্বরের কথা আগেই শুনেছিলেন। দেশে ফিরে এসেই যোগাযোগ করলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে। উষ্ণ প্রস্রবণের জল তেজস্ক্রিয় (radio active) হয়ে থাকে। বিধান রায় অধ্যাপক বসুকে বক্রেশ্বরের কুণ্ডের জলের তেজস্ক্রিয়তা মাপার ব্যবস্থা করতে বলেন যাতে বক্রেশ্বরে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা স্পা খোলার সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা করা যায়। প্রস্তাবটিতে সত্যেন বসুও বেশ উৎসাহ পেয়ে যান। দেরি না করে তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অব সায়েন্স্ (IACS) সংস্থার মাধ্যমে একটি ছোট দল তৈরি করে ফেলেন। বেশ কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ দলটিকে অখ্যাত অল্প-পরিচিতি বক্রেশ্বরে পাঠানো হয় ১৯৫৪ সালে। সেই পর্যবেক্ষক দলের প্রধান ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি তখন IACS-এ পদার্থ বিজ্ঞানের কিছু মৌলিক গবেষণা চালাচ্ছিলেন। ১৯৫৪ সালের পর, বহুবার তিনি ও তার গবেষকদল বক্রেশ্বর গিয়েছেন, ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, কুণ্ডের জলে তেজস্ক্রিয়তা মাপতে গিয়ে সেখানে হিলিয়ামের উপস্থিতিও আবিষ্কার করে ফেলেছেন (এতে গবেষণার একটা নতুন দিক খুলে গিয়েছিল), অবশ্য শেষ অবধি মূল্যবান হিলিয়াম গ্যাসের এই সংগ্রহটিকে আর কাজে লাগানো যায় নি ; ভারতের 'আণবিক শক্তি বিভাগ' হিলিয়াম প্রকল্প হাতে নেওয়ার পর কোন অজ্ঞাতকারণে সব ধামাচাপা পড়ে গেছে।

সে যাই হোক, আমাদের মূল আলোচনা হিলিয়াম প্রকল্প নিয়ে নয়। আমরা বর্ষীয়ান অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছিলাম বক্রেশ্বরের গোড়ার কথা শুনতে, তাদের অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের কথা শুনতে। সাক্ষাৎকারের শুরুতেই শ্যামাদাসবাবু বললেন—

'হ্যাঁ, যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রথম আমরাই গিয়েছিলাম। সেই ২৮/২৯ বছর আগে জায়গাটা ছিল নেহাৎ-ই দুরধিগম্য। গাড়ির রাস্তা ছিল না, পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে ছাড়া কুণ্ডগুলির কাছে পৌছনো যেত না। ওখানে গ্যাছেন তো, পাশেই একটা নদী আছে, বক্রেশ্বর নদী নাম। একবার তো বর্ষাকালে বাঁশ আর কলসীর ভেলা বেঁধে আমাদের বক্রেশ্বর নদী পার হতে হয়েছিল। কাজের সময় তাঁবু খাটিয়ে থাকতুম, কিছুদিন পরীক্ষা-টরীক্ষা চালিয়ে ফিরে আসতুম।'

প্রশ্ন ॥ আচ্ছা, আপনারা শুরুতে তো কুণ্ডের জলে তেজস্ক্রিয়তা মাপতেই গিয়েছিলেন, তাই না?

শ্যা. চ. ॥ হ্যাঁ, ওখানকার অগ্নিকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড এরকম আটটা কুণ্ডের সবকটিতেই জলের রেডিও অ্যাক্‌টিভিটি আমরা মেপেছিলুম। এই কাজ করতে গিয়ে ওখানে হিলিয়াম গ্যাসের সন্ধানও আমরা পেয়ে যাই। আধুনিক পৃথিবীতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য হিলিয়ামের উপকারিতা বিরাট।

প্রশ্ন ॥ হ্যাঁ, প্রসঙ্গত অনেক কিছুই আপনার কাছে আমাদের জানবার থাকবে। প্রথমে একটু বলবেন—উষ্ণ প্রস্রবণে ক্রমাগত গরম জল উঠে আসার রহস্যটা কী? আপনি তো জানেন, এ-নিয়ে অনেকরকম ধর্মীয় এবং পৌরাণিক বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। আমরা আসল ঘটনাটা জানতে চাইছি।

শ্যা. চ. ॥ হট স্প্রিং বা উষ্ণ প্রস্রবণের বৈশিষ্ট্য হলো স্থানবিশেষে মাটি ভেদ করে গরম জলের স্রোত উঠে আসা। যদিও এই প্রস্রবণ এলাকায় ওপরের মাটির স্তরবিন্যাসের কোন ত্রুটি চোখে পড়ে না, কিন্তু মাটির নিচে কোন স্তর-চ্যুতি বা ফাটল থাকে, যার ভেতর দিয়ে গরম জল আপনা-আপনি বের হয়। অবশ্যই ভূ-স্তরের গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্যই এমনটা হতে পারে। যে-কোন অঞ্চলে উষ্ণ প্রস্রবণ হতে পারবে না। বক্রেশ্বর ছাড়া রাজগীরের নামও তো সবাই শুনেছেন।

ভূ-বিজ্ঞানীরা বলছেন হট স্প্রিং দু-রকমের। প্রথমটির নাম ভেডোস (Vadose)। ভূ-পৃষ্ঠের ওপরের জল মাটি চুঁয়ে ভেতরে ঢোকে এবং প্রবেশ্য (permeable) পাথর বা ভূমিস্তরের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক জলের লেভেলেরও নিচে নেমে যায়। এখন আমাদের পৃথিবীর ভেতরটা তো খুব

গরম, প্রতি ৩০ মিটার গভীরতার জন্য তাপমাত্রা ১° সে. করে বেড়ে যায়, তাই ভেডোস-জল যত নিচে নামে ততই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নিচে তপ্ত পাথরের ওপর দিয়ে এই জল গড়িয়ে চলে (horizontally), তারপর কোন খাড়া পাথরস্তরে বাধা পেয়ে জলস্রোত ওপর দিকে ওঠে এবং ফাটলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে কুণ্ড তৈরি করে। সাধারণত এই জাতীয় প্রস্রবণের তাপমাত্র ৫০° সেন্টিগ্রেডের নিচে হয়।

দ্বিতীয় ধরনেরটা হলো Juvanile Spring, বাংলায় নবীন প্রস্রবণ বলা চলে। এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন জার্মান বিজ্ঞানী ই স্যুয়েস্ (E. Suess)। তার মতে, মাটির অনেক নিচে, লিথোস্ফিয়ারে, অত্যধিক চাপ আর তাপে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস জুড়ে গিয়ে (synthesised) নবীন জলের সৃষ্টি হয়। এই জলের জন্মই মাটির নিচে, ফাটল বেয়ে প্রস্রবণের আকারে ওপরে উঠে এ জল নবীন অবস্থায় প্রথম বার আকাশের মুখ দেখে। সাধারণত এরকম উষ্ণ প্রস্রবণের তাপমাত্রা ৬০° সেন্টিগ্রেডের বেশি হয়। আমার ধারণা বক্রেশ্বরের অগ্নিকুণ্ডের জল এই শ্রেণীতে পড়ে।

প্রশ্ন ॥ একটা ধাঁধা মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে, বলেই ফেলি। দেখুন, জল তো স্বভাবত নিম্নগামী, গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে যেতেই চায়। তাহলে প্রস্রবণের জল মাটির তলা থেকে ওপরে ওঠে কেমন করে ?

শ্যা. চ. ॥ খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। জল উঠে আসার তিনটে কারণ হতে পারে। প্রথমত জলের নিজস্ব চাপের জন্য, যাকে বলে hydrostatic pressure। ভেডোস-জলের ব্যাপারটা স্মরণ করুন। মাটির নীচে U-আকৃতির জলপথ থাকছে। এর দুটো খাড়া বাহুর মধ্যে যখনই জল-প্রবেশের স্তম্ভটা (descending) জলনিকাশের স্তম্ভের (ascending) চাইতে বেশি হয়, তখন দু-টির মধ্যে জলস্তরের তফাতের জন্য জলের অভ্যন্তরে চাপ সৃষ্টি হয়, সেই চাপে নিকাশী স্তম্ভ দিয়ে জল উঠে আসতে থাকে।

দ্বিতীয় কারণটা হলো জলীয় বাষ্পের ধাক্কা। Jouvenile বা নবীন জলের অধিকাংশই থাকে স্টিম বা বাষ্পের অবস্থায়। এই বাষ্পের ব্যাপক চাপ গরম জলকে ওপর দিকে ঠেলা দিয়ে তুলে দেয় ফোয়ারার মতো। এছাড়া অন্য আরেকটি কারণ—জলে দ্রবীভূত নানারকমের গ্যাস। জলে গুলে গিয়ে এসব গ্যাস প্রস্রবণের জলের density বা ঘনত্ব কমিয়ে দেয়। জল এতে হাল্কা হয় আর ওপরে উঠে আসে। মাটির অনেকটা নিচে লিথোস্ফিয়ার স্তরে দারুণ চাপের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস জলে দ্রবীভূত

হয়ে যায়। সেই জল স্তম্ভ বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠে এলে যখন চারপাশে চাপ কমে যায় তখন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আবার জল থেকে মুক্ত হয়ে আসে এবং সেই গ্যাসই তখন জলকে ঠেলে দেয় ওপর দিকে।

প্রশ্ন ।। বেশ। এবার তাহলে গোড়ার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। আমরা জানি ১৯৫৩-৫৪তে বিধান রায় বক্রেশ্বরে স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কথা ভেবেছিলেন, তখনই কুণ্ডের জলে তেজস্ক্রিয়তা মাপার জন্য আপনাদের পাঠানো হয়। কিন্তু চিকিৎসার সঙ্গে জলের তেজস্ক্রিয়তার সম্পর্ক কোথায়? এর তাৎপর্যটা একটু বলবেন।

শ্যা. চ. ।। তাৎপর্য রয়েছে অবশ্যই। অনেকদিন আগে, ১৮৯৮ সালে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী পিয়েরে কুরী, মাদাম কুরীর স্বামী, লক্ষ্য করেছিলেন যে, হট স্প্রিং-এর জল-মাত্রই রেডিও অ্যাকটিভ, মানে তেজস্ক্রিয়। তখন কোন কোন বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, উষ্ণজলের তেজস্ক্রিয়তার দরুন যে আলফা, বিটা, গামা রশ্মি অনবরত বেরোয় তার জন্যেই বোধহয় দুরূহ সব রোগের নিরাময় হয়।

প্রশ্ন ।। এই বিষয়টা আরেকটু বিস্তৃতভাবে বলবেন? অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ কোথা থেকে আসে, রোগীর শরীরে তারা কোন্ প্রক্রিয়ায়ই বা কাজ করে —এই ব্যাপারগুলো বিশদভাবে জানতে চাইছি।

শ্যা. চ. ।। ভূ-পৃষ্ঠের নিচে গ্র্যানাইট, কোয়ার্ট্জ, বেসল্ট ইত্যাদি যে-সব পাথর রয়েছে তাদের মধ্যে সাধারণত খুব সামান্য পরিমাণ রেডিয়াম থাকে। রেডিয়াম তো জানেনই—শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় পদার্থ; রেডিয়ামের বিকিরণ-রশ্মি দিয়ে ক্যানসার রোগের চিকিৎসার কথা অনেকেই জানেন আশা করি। রেডিয়াম থেকে অবিরাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরোচ্ছে তেজস্ক্রিয় রেডন (**Radon**) গ্যাস। উষ্ণ প্রস্রবণের গরম জল ওই পাথরগুলোর গা ঘেঁষে যাওয়ার সময় রেডন গ্যাস সংগ্রহ করে ওপরে নিয়ে আসে। রেডন গ্যাসের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা এমন যে, তৈরি হওয়ার ১২ দিন পরে এই গ্যাসের তেজস্ক্রিয়তা প্রায় লোপ পেয়ে যায়। কুণ্ডে স্নান করলে বা জলপান করলে রেডন গ্যাস গায়ের চামড়া, ফুসফুস আর পাকস্থলীর মধ্যে ঢুকে যায় এবং রক্ত প্রবাহের সঙ্গে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে রেডন পরমাণুর ভাঙন বা বিভাজন হয় আর আলফা কণার (α-কণা) সৃষ্টি হয়। এই আলফা কণিকারা দেহের কোষ, নিউক্লিয়াস, জিন (বা বংশাণু) ইত্যাদির সঙ্গে মিশে যায়—গিয়ে নানারকম জীব-বৈজ্ঞানিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে চলে। প্রস্রবণের জলের এই মৃদু তেজস্ক্রিয়

গ্যাস এবং অন্যান্য লবণ বা যৌগপদার্থ শরীরে গিয়ে দেহকণার মৌলিক স্তরে রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন ও রোগ নিরাময় ঘটায়—এরকম কিছু ধারণার কথা বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন। অবশ্য এ-ব্যাপারে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যারা যুক্ত তারাই ভালো বলতে পারবেন।*

কুণ্ডের জল স্থানীয় লোকদের বিক্রি করতে দেখেছি ক-বছর আগে—দশ পয়সা গ্লাস, বোতল এক টাকা। এখনকার খবর জানি না। শুনেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ওই কুণ্ডের জল পরিশোধন করে বোতলে ভরে কলকাতার বড় বড় হোটেলে সরবরাহ করে থাকেন।

প্রশ্ন ॥ সবশেষে হিলিয়াম প্রসঙ্গটা তুলছি। একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা নাকি সরকারি ঔদাসীন্য আর অবহেলায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে—আমরা শুনেছি। আপনি আমাদের বলবেন হিলিয়াম প্রকল্পকে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে? হিলিয়াম গ্যাসের এত মূল্য কিসে?

শ্যা. চ. ॥ হিলিয়াম একটি নিষ্ক্রিয় (inert) প্রাকৃতিক গ্যাস। সূর্যের জ্যোতির্মণ্ডলে এর প্রথম সন্ধান মেলে ১৮৬৮ সালে; আর পৃথিবীর বুকে তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হিলিয়াম নির্গমনের হদিশ পাওয়া যায় ১৮৯৩ সালে। এই পার্থিব হিলিয়াম পাওয়া যায় খুবই সামান্য পরিমাণে, তাই এর মূল্যও বেশি।

জানতে চাইছিলেন হিলিয়ামের গুরুত্ব কিসে, তাই তো? হাল্কা অদাহ্

[* প্রকৃতপক্ষে রেডন, রেডিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে চিকিৎসার ব্যাপারটি কয়েকদশক আগে যত কার্যকর, উন্নত ও সঠিক মনে করা হতো এখন আর ততটা আস্থা চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের নেই, বরং তেজস্ক্রিয়-চিকিৎসা নিয়ে বেশ কিছু বিরূপ চিন্তার বিকাশ ঘটছে। এছাড়া উষ্ণ প্রস্রবণের জলের ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড, ফ্লোরাইড, বাই-কার্বনেট প্রভৃতি অজৈব আয়নগুলিও মানবদেহের পক্ষে উপকারী বলে যে দৃঢ় ধারণা পূর্বে ছিল (অম্বল, জনডিস, বাত, চর্মরোগ, শ্লেষ্মা ইত্যাদি রোগে মহৌষধ বলে বিশ্বাস) সে-সম্পর্কেও বর্তমানে বিজ্ঞানীমহলে সংশয় দেখা দিয়েছে; উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এখন রোগশোকের কারণগুলিকে আরো বেশি সঠিকভাবে প্রকাশ করছে; আরোগ্যকারী ওষুধ বা ওষুধি গুণযুক্ত পদার্থের শরীরের ওপর ক্রিয়া ইত্যাদি নিয়েও নতুন নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে ক্রমশ। —স. ম.]

গ্যাস বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বেলুন বা ওইরকম বায়ুযানে হিলিয়াম ব্যবহার হতো। ১৯৪০ সালের পর জাহাজশিল্পে ওয়েল্ডিং-এর কাজে হিলিয়ামের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৫০-এর পর থেকে পারমাণবিক চুল্লিতে শীতক বা রেফ্রিজারেটরের কাজে হিলিয়াম অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ট্র্যানজিস্টার শিল্পেও এই গ্যাসের ব্যবহার বাড়তে থাকে।

শরীরের ওপরেও হিলিয়ামের অনুকূল প্রভাব দেখা গেছে। রকেটচালক, নভোচারী কিংবা ডুবুরীদের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে হয়। তাদের জন্য হিলিয়াম ও অক্সিজেন মেশানো শ্বাসবায়ু দরকার লাগে।

কাজেই সভ্য দুনিয়ায় হিলিয়ামের চাহিদা দ্রুত বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এদিকে হিলিয়ামের প্রাকৃতিক সংগ্রহ নেহাৎই অল্প—অতএব দামও বেড়ে যায় চক্রবৃদ্ধি হারে। এরকম অবস্থায় আমাদের মতো দরিদ্র দেশের কোন উষ্ণপ্রস্রবণ থেকে (অর্থাৎ ওই বক্রেশ্বরের কথা বলছি) অনর্গল হিলিয়াম নির্গমনের ঘটনাটি আবিষ্কৃত হলে কেমন লাগে !! অধ্যাপক সত্যেন বসু প্রচণ্ড উৎসাহে হিলিয়াম প্রকল্প চালু করে দিয়েছিলেন তখনই। কাজ এগিয়েও ছিল অনেকটা। তারপর, এই বছর কয়েক আগে, কেন্দ্রীয় সরকারের 'আণবিক শক্তি বিভাগ' প্রকল্পটি হাতে নিলেন। টাকা পয়সা বরাদ্দ হলো অনেক। কিন্তু কেন জানি না ধীরে ধীরে সব চুপচাপ হয়ে গেল। এমনকি বক্রেশ্বর থেকে কিছুটা দূরে তাঁতলোই গ্রামে খোলা নদীর স্রোতের মতো উষ্ণকুণ্ডের জল বইছে—হিলিয়ামের ধোঁয়া বেরোচ্ছে অকাতরে—আমরা সে-সব হদিশও দিয়েছিলাম। কিন্তু কই, কিছুই তো করা হচ্ছে না!

উপসংহার

ব্যাপারটা তা-ই। এই সাক্ষাৎকার নেওয়ার কিছুকাল আগে আমরা বক্রেশ্বর পর্যটনকেন্দ্র দেখে এসেছি। লোক সমাগম, পূজো-আর্চা, অর্থাগম সবই হচ্ছে যথারীতি, হচ্ছে না কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজটা। হিলিয়াম ল্যাবরেটরিতে দেখলাম তালা ঝুলছে, সে তালায় পুরু ঘন মাকড়শার জাল।

হিলিয়াম প্রকল্প নিয়ে সরকারি ঔদাসীন্যের অভিযোগ যদি সত্যিও হয় তাহলেও ব্যর্থতার মধ্যে অন্য একটি সাফল্যের দিক আমরা খুঁজে পাই। খোদ 'পুণ্যধাম' বক্রেশ্বরের বুকে বসে শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য গবেষকদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্থবিরত্বকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। বক্রেশ্বরের স্থান-মাহাত্ম্য যদি কিছু থাকে তবে তা

বাবা বক্রনাথের দৈবী প্রভাবের জন্য নয়, নিছক প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক কারণেই—

এই সত্যটি সাধারণ মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত হতে পেরেছে সেখানে বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের অনুপ্রবেশের ফলেই। এটি একটি বড় লাভ।

কৃতজ্ঞতস্বীকার: আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের বিজ্ঞান বিভাগ

সাক্ষাৎকার : **অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়**

এপ্রিল ১৯৮৩

বক্রেশ্বরের জলের গুণাগুণ বিচার

অনেকের ধারণা 'পুণ্যধাম' বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণের জল অম্বলের ব্যামো, জনডিস, বাত, চর্মরোগ আর বুকের শ্লেষ্মার রোগে 'ঐন্দ্রজালিক' ওষুধের মতো কাজ করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রতিবছর হাজার হাজার পুণ্যার্থী রোগী বাবা বক্রেশ্বরনাথের মন্দিরে প্রণতি জানিয়ে মন্দির সংলগ্ন কুণ্ডগুলিতে (উষ্ণ-প্রস্রবণ) স্নান করেন ও কুণ্ডের জল পান করে থাকেন বিভিন্ন রোগ মুক্তির আশায়—এতে করে তাদের 'রথদেখা ও কলাবেচা', দুটোই হয়ে থাকে। কি কারণে বক্রেশ্বরের জলে রোগমুক্ত হয় সেটা দেখা যাক।

বক্রেশ্বরের জল বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই তেজস্ক্রিয়তার উৎস হলো ভূগর্ভস্থ ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, প্রভৃতি ধাতু। বক্রেশ্বরের জলে প্রধানত তেজস্ক্রিয় রেডন গ্যাস পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা, এই তেজস্ক্রিয়তা হরেকরকম অসুখ সারায় এবং স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন অর্থাৎ শরীর ভালো করে। কিন্তু এই ধারণাটা অপবৈজ্ঞানিক। (পরে আলোচনা করা হয়েছে।) তেজস্ক্রিয়তা মানব তথা মানবেতর সব প্রাণীর দেহের কোষের ওপর কেবলমাত্র ক্ষতিকর (cytotoxic) প্রভাবই ফেলে—ক্ষতির পরিমাণ সাধারণভাবে মাত্রানুসারী (dose-related)। তেজস্ক্রিয়তা শরীরের উপকার করে বলে জানা নেই। সাময়িকভাবে ক্যান্সার রোগ 'সারাতে' তেজস্ক্রিয় রশ্মির যে ব্যবহার, সেখানেও উপকার হলো পরোক্ষ,

অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় রশ্মি-দুষ্ট ক্যান্সার কোষগুলোকে ধ্বংস করে স্বাভাবিক কোষগুলোকে রক্ষা করে। অম্বলের ব্যামো, জনডিস, ইত্যাদি রোগ সারাবার বা শরীর ভালো করার যে গুণ বক্রেশ্বরের জলে আছে নিশ্চয় করে বলা চলে, তা তেজস্ক্রিয় রেডন গ্যাসের জন্য হতে পারে না, কারণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি ঐ সব অসুখ ভালো করে বলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রমাণিত হয় নি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তেজস্ক্রিয়তা সম্বলিত বক্রেশ্বরের জল খাওয়া কতটা নিরাপদ। এটা বুঝতে আমাদের প্রয়োজনীয় কয়েকটা বিষয় জেনে নিতে হবে। তেজস্ক্রিয়তার উৎস যাই হোক না কেন, ক্ষতিকর প্রভাব একই হবে অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, গোল্ড, আয়ডিন ইত্যাদি থেকে তেজস্ক্রিয়তাজনিত ক্ষতি একই ধরনের হবে। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় কণা (আলফা, বিটা) বা রশ্মি (গামা) ইত্যাদির জন্য ক্ষতিও একই রকমের—কিন্তু যেহেতু তেজস্ক্রিয় কণা বা রশ্মির গতিবেগ বা দূরত্ব অতিক্রমণের শক্তি বিভিন্ন, সেইজন্য তাদের ক্ষতিকর প্রভাবও ভিন্ন। তেজস্ক্রিয়তাজনিত ক্ষতি সাধারণত মাত্রানুসারী (dose-related) অর্থাৎ কম মাত্রায় কম ক্ষতি এবং বেশি মাত্রায় বেশি ক্ষতি। তেজস্ক্রিয়তা মানুষের শরীরে মোটামুটি দু-ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে থাকে ; এক ধরনের ক্ষতি হয় সাধারণ কোষ কলার (যেমন চামড়া, রক্ত, হাড়, চোখ ইত্যাদি)। এ-ধরনের ক্ষতির দরুন লক্ষণগুলো (Radiation sickness) খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেখা দিতে পারে, আবার অনেক ক্ষেত্রে বহু বছর বাদে লক্ষণগুলো (যেমন ক্যান্সার) দেখা দিতে পারে। খুব অল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার দরুন ক্ষতি এত কম হয় যে, কোন লক্ষণ প্রকাশ নাও হতে পারে। তেজস্ক্রিয়তার একটা মাত্রা (Safe limit) অতিক্রম করলে পরেই ক্ষতিকর লক্ষণগুলো প্রকাশ পাবে। কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘদিন ধরে খুব কম পরিমাণ (below threshold dose) তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণ করতে থাকে, তবে তার কোষকলার (Somatic) কোন ক্ষতিকর লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমপরিমাণ (অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে নেওয়া মোট) তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণ করে তবে তা ভয়াবহ বা মারাত্মক হতে পারে।

তেজস্ক্রিয়তা অন্য যে ধরনের ক্ষতি করে সেটা লক্ষিত হয় জননকোষের (স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই) ওপর। জননকোষের ওপর তেজস্ক্রিয়তার দরুন ঘটে বংশানুগত পরিব্যক্তি (genetic mutation)। তেজস্ক্রিয়তার এই ক্ষতি যে ব্যক্তি তেজস্ক্রিয়তা দ্বারা আক্রান্ত হলো তার ওপর দেখা দেবে না। লক্ষণগুলো দেখা দেবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের ওপর। তেজস্ক্রিয়তাজনিত এই ধরনের ক্ষতির বিশেষত্ব

হলো যে, এটা খুব কম পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার (·01 rem) দরুনও হতে পারে। বলা যেতে পারে : 'Each dose of radiation, no matter how small, to which the reproductive cells of a future parent are exposed increases the chanses of passing on additional hereditary defects to the descendants' [যে কোন নরনারীর দেহে যদি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রবেশ করে, তা সে যত কম পরিমাণেই হোক না কেন, তাহলে প্রতি মাত্রা বা প্রতি ডোজ বিকিরণ ওই পিতামাতার পরবর্তী বংশধরের মধ্যে বংশানুগত বিকৃতি বা ক্ষতি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাকে এক ধাপ করে বাড়িয়ে দেয়।]

কোন্ মাত্রা পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তা কোন মানুষের পক্ষে নিরাপদ সেটা ঠিক করার জন্য একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা (ICRP) আছে। এই সংস্থা কয়েক বছর পর পর অধিবেশনে বসে এই 'নিরাপদ মাত্রা' সম্বন্ধে রায় দিয়ে থাকেন, যেটা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এইরকম পুস্তিকার ভূমিকাতেই উল্লেখ আছে যে, তেজস্ক্রিয়তার কোন চরম নিরাপদ মাত্রা বলে কিছু নেই (No dose of radioactivity is absolutely safe)। দ্বিতীয়ত, তথাকথিত এই নিরাপদ মাত্রাটি পরিবর্তনশীল। উদাহরণস্বরূপ, ICRP-র ১৯৫৪ এবং ১৯৬৫ সালের অনুমোদিত তেজস্ক্রিয়তার নিরাপদ মাত্রার সীমা (maximum permissible limit) নিচের সারণি থেকে দেখা যেতে পারে—ওপরের পরিমাণ (dose) যারা তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণের বেলায় এই পরিমাণ দাঁড়াবে ওপরের পরিমাণের ১/১০ ভাগ।

কোষকলার নাম	১৯৫৪	১৯৬৫
চামড়া	৬০০ মিঃ রেম*/সপ্তাহ	৩০ রেম/বৎসর
রক্ত-প্রস্তুতকারী কোষ কলা ও জননকোষ	৩০০ মিঃ রেম*/সপ্তাহ	৫ রেম/বৎসর

[*১০০০ মিঃ রেম = ১ রেম]

এই সারণি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দশ বছরের ব্যবধানে রক্ত প্রস্তুতকারী কোষকলা ও জনন কোষকলার ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তার নিরাপদ মাত্রা ৬৬ শতাংশ কমে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে—তেজস্ক্রিয়তার যে মাত্রাকে আজ নিরাপদ বলে ধরা হচ্ছে, দশ বছর পরে হয়ত সেটা আর নিরাপদ ভাবা হবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে তেজস্ক্রিয়তা সম্বলিত বক্রেশ্বরের

জল ব্যবহার করা (বিশেষ করে খাওয়া) কতটা নিরাপদ সেটা আলোচনা করা যেতে পারে। বক্রেশ্বরের জলে প্রধানত তেজস্ক্রিয় রেডন গ্যাস পাওয়া যায় যার থেকে তেজস্ক্রিয় আলফা কণা বিচ্ছুরিত হয়। আলফা কণা ভারি বলে এর গতিবেগ ও ভেদ করার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম (০·১ মি. মি.) সেজন্য আলফা কণা আমাদের চামড়া ভেদ করে শরীরে ঢুকতে পারে না। কিন্তু এই আলফা কণা বিচ্ছুরণকারী তেজস্ক্রিয় কোন দ্রব্য খেলে বা নিশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করলে শরীরে ঢুকে মাত্রানুসারী ক্ষতি করে থাকে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের কোন কোন জায়গার প্রস্রবণের জলে তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পাওয়া যায়। বক্রেশ্বরের জলের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি ঐ সব প্রস্রবণের জল খেয়েও অনেক লোকের বহু অসুখের উপশম হবার ঘটনা জানা যায়। তেজস্ক্রিয়তার অসীম ক্ষমতার কথা তার মাত্র কিছুকাল আগেই জানা গেছে। যেহেতু ঐ সব প্রস্রবণের জল তেজস্ক্রিয়তা সম্বলিত (প্রধানত রেডন) তাই মানুষ, এমনকি বেশ কিছু বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকও ধারণা করে নিলেন যে, ঐসব জলের 'রোগ সারাবার' জন্য দায়ী হল তেজস্ক্রিয় রেডন। বেশ কিছু কোম্পানি ঐ জল বিক্রি করে বেশ দু-পয়সা কামিয়ে নিল। এমনকি চিকিৎসা-শাস্ত্রের কিছু পত্রিকায় ঐ প্রস্রবণের জল ব্যবহারে 'রোগ নিরাময়ে'র (বিশেষ করে বাতের অসুখ) ঘটনা জানিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকল। এর পরের অধ্যায় আরও চমকপ্রদ। অনেক চিকিৎসকের মাথায় একটা নতুন চিন্তা খেলল। তারা ভাবলেন যে, রেডন গ্যাসের উৎপত্তি হয় তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম থেকে ; রেডন গ্যাসের স্থায়িত্ব খুব অল্প (অর্ধায়ু ৩·৮ দিন) অন্যদিকে রেডিয়ামের স্থায়িত্ব অনেক দীর্ঘ (অর্ধায়ু ১৬০০ বৎসর)। কাজেই তেজস্ক্রিয় রেডন গ্যাস মেশানো জলের পরিবর্তে যদি রেডিয়াম মেশানো জল খাওয়ানো যায়, তবে গুণ বেশ দীর্ঘস্থায়ী হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা রেডিয়াম মেশানো জল ব্যবহার করতে শুরু করলেন। রেডিয়াম জল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাদের পৃথিবীর প্রায় সবরকম অসুখেই (আজকাল যেমন টনিক ব্যবহার হয়) ব্যবহার হতে লাগলো। এর কয়েক বছর পরেই রেডিয়ামের মারাত্মক ক্ষতিকর লক্ষণগুলো বহু রেডিয়াম-জল-সেবীর ওপর দেখা দিতে শুরু করায়, ঐ রেডিয়াম টনিক জলের অপবৈজ্ঞানিক ব্যবহার আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় প্রত্যেক দেশেই নাগরিকদের তেজস্ক্রিয়তার বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য দেশের কোন সংস্থাকে ভার দেওয়া হয়ে থাকে। এই সংস্থার অন্যান্য কাজের মধ্যে একটা বিশেষ দায়িত্ব হলো দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয়তার উৎসগুলো (যেমন

পারমাণবিক চুল্লি, হাসপাতাল, ইত্যাদি) নিয়মিত পরীক্ষা করে সেখানকার তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের জানানো ও প্রয়োজনে সতর্ক করে দেওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। আমাদের দেশে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রকে (BARC)।

বক্রেশ্বরের জল শীঘ্রই বোতলে

বিশেষ সংবাদদাতা: বোতল-বন্ধ বক্রেশ্বরের খনিজ-জল শীঘ্রই কলকাতায় পাওয়া যাবে। শিল্প-দপ্তর থেকে টাকা পাওয়া গেলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খনি ও খনিজ-দপ্তর এই জল বোতলে ভরে বাজারে বিক্রি করার একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

বহু বছর ধরে বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণের জলের রোগ-নিরাময় ক্ষমতা সাধারণের কাছে পরিচিত। কতকগুলি বিশেষ রাসায়নিক উপাদান থাকার জন্য এই জল বিশেষভাবে অম্ল, পুরানো লিভারের রোগ, বাত, হজমের গোলমাল ইত্যাদি কিছু রোগের ক্ষেত্রে অনুমোদিত হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে বক্রেশ্বরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি আধা-স্বয়ংক্রিয় কারখানা স্থাপন করেছেন। একটি নির্দিষ্ট কুণ্ড থেকে সংগৃহীত এই জল বড় হোটেল, ওষুধের দোকান ও অন্যান্য নির্বাচিত কেন্দ্রে বিক্রির জন্য রাখা হবে।

বক্রেশ্বরের জল নিয়ে এই বাণিজ্যিক উদ্যোগ নতুন নয়, প্রকৃত-পক্ষে এটা শুরু হয় ১৯৭৭ সালে। তিন বছর পর, "বক্রেশ্বরের জলে 'রেডন' নামক একটি তেজস্ক্রিয় মৌল আছে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর"—এই রিপোর্টের ভিত্তিতে উদ্যোগের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছিল।

'ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে'র কাছে এই ব্যাপারে মতামত চেয়ে পাঠানো হয়। বিশ্লেষণের পর ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র জানিয়েছে যে জলে রেডনের উপস্থিতি নিরাপদ-সীমার (Permissible limit) মধ্যে।

☐ স্টেটসম্যান, ২৮.৪.৮৩

২৮.৪.৮৩ তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকায় বক্রেশ্বরের জল নিয়ে একটা খবর বেরিয়েছে। তাতে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খনি ও খনিজ পদার্থের কৃত্যকের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে, ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা করে জানানো হয়েছে যে, বক্রেশ্বরের জলে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা গ্রহণযোগ্য (permissible) সীমার মধ্যেই আছে। অতএব আমরা সাধারণভাবে ধরে নিতে পারি যে, বক্রেশ্বরের জল খেলে তেজস্ক্রিয়তাজনিত বিপদ নেই। কিন্তু আমাদের এই রকম ধারণার সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, আজকে তেজস্ক্রিয়তার যে মাত্রাকে গ্রহণযোগ্য বা নিরাপদ বলা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত সেটাই বিপজ্জনক বলে বিশেষজ্ঞ সংস্থা বিবেচনা করবেন। দ্বিতীয়ত, তেজস্ক্রিয়তার জন্য জেনেটিক পরিব্যক্তির বিপদের কথা আগে বলা হয়েছে, যেটা সীমানির্ভর নয়, সেই বিপদ কিন্তু থেকেই যাবে—যার প্রকাশ হবে ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে। আরেকটি বিষয়ও এর সাথে যুক্ত, সেটা হলো বিদেশে কোন সরকারি সংস্থা যদি কোন বিষয়ে মতামত দেয়, সেটা পরবর্তীকালে যাচাই করে দেখার জন্য বিকল্প সংস্থা বা ব্যবস্থা থাকে কিন্তু আমাদের দেশে এরকম ব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠে নি। কাজেই আমাদের দেশের অন্যান্য পাঁচটা সরকারি সংস্থার মতো ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের হিসেবে যদি কোন ভুলচুক হয়ও সেটা ধরার মতো বিকল্প কোন উপায় আমাদের দেশে নেই। কোন পরমাণু চুল্লি থেকে যদি বিপজ্জনক পরিমাণে তেজস্ক্রিয়তা বেরোতে থাকে বা কোন X-Ray টেকনিশিয়ান যদি গ্রহণযোগ্য পরিমাণের বেশি বিকিরণ নিতে বাধ্য হয়ও (কাজের খাতিরে) তবু সেটা আমরা বিকল্প কোন সংস্থার মাধ্যমে যাচাই করতে পারবো না।

বক্রেশ্বরের জলে বেশ কিছু খনিজ পদার্থ যেমন ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রণ প্রভৃতি ক্লোরাইড, ফ্লুরাইড, কারবোনেট, বাই-কারবোনেট সালফেট ইত্যাদির যৌগপদার্থ হিসেবে প্রচুর পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। তাছাড়া উষ্ণ প্রস্রবণগুলো থেকে হিলিয়াম, কার্বন-ডাই অক্সাইড, আরগন প্রভৃতি গ্যাস বের হয়। এইসব পদার্থকেও বিভিন্ন রোগ নিরাময়কারী বলে মনে করা হয়ে থাকে। রোগ সারাতে এইসব যৌগপদার্থের ভূমিকা আমরা তাহলে খতিয়ে দেখতে পারি।

অম্বলের ব্যামো ও হজমের গণ্ডগোল

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র-মতে এগুলো ঠিক কোন নির্দিষ্ট অসুখ নয়—এগুলো হলো অন্য (পেটের) রোগের লক্ষণ। এই লক্ষণগুলো উপশম করতে চিকিৎসকরা হামেশাই অ্যান্টাসিড ব্যবহার করে থাকেন। বক্রেশ্বরের জলে প্রচুর বাইকারবোনেট

ও কারবোনেট যৌগ থাকে যাদের অ্যান্টাসিড ওষুধ হিসেবে কার্যকারিতা বহুকাল ধরেই প্রমাণিত। এগুলো ব্যবহার করতে থাকলে অম্বল (Hyper acidity) ও হজমের গণ্ডগোল (dyspepsia, indigestion) বেশ কম থাকবে বলে আশা করা যায়। তবে আসল রোগটা (cause) না সারালে ওষুধ বা বক্রেশ্বরের জল ব্যবহার বন্ধ করলে উপসর্গগুলো আবার দেখা দেবে।

জনডিস

সাধারণত এটি এমন একটা (Infective hepatitis) অসুখের লক্ষণ যেটা কিছুদিনের মধ্যে সাধারণত নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায় (Self limiting disease)। এখানে ওষুধের ভূমিকা খুবই নগণ্য, যেটা প্রয়োজন তা হলো পর্যাপ্ত বিশ্রাম। জনডিস যদি সারবার হয়, তবে সেটা বক্রেশ্বরের জল খেলেও সারবে আবার কলের জল খেলেও সারবে।

বাত

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র-মতে এর চিকিৎসাগুলোর মধ্যে একটা হলো গরম (জলের) সেঁক। এই পরিপ্রেক্ষিতে বক্রেশ্বরের উষ্ণজলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্নান কয়েকদিন নিয়মিত করতে থাকলে উপকার অর্থাৎ বাতের ব্যথার উপশম (নিরাময় নয়) অবশ্যই আশা করা যেতে পারে।

চর্মরোগ

চর্মরোগের ধরন প্রচুর। অতি উৎসাহী ব্যক্তিও নিশ্চয়ই দাবি করবেন না যে, পৃথিবীর যাবতীয় চর্মরোগ বক্রেশ্বরের জলে সেরে যায়। ঐ জলে গন্ধক যৌগ থাকার ফলে ছত্রাকঘটিত—যেমন ছুলি ও দাদ জাতীয়, অসুখ কমতে পারে, যদি ঐ জলে স্নান করা হয় বেশ কিছুদিন ধরে।

বুকের শ্লেষ্মার অসুখ

অনেক কারণেই বুকে অত্যধিক পরিমাণে বা ঘন শ্লেষ্মার প্রকোপ হতে পারে। এই উপসর্গের সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা হলো উষ্ণ জলীয় বাতাস নাক-মুখ দিয়ে টেনে নেওয়া (Steam inhalation)। বক্রেশ্বরের উষ্ণ জলের কুণ্ডের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করলে উপকার নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে। উপরি পাওনা হিসেবে থাকছে হিলিয়াম গ্যাস। হিলিয়াম গ্যাস অক্সিজেনের সাথে গ্রহণ করলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ কম পরিশ্রমসাধ্য হয়, যেটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নির্ণয় করা গেছে এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, হাঁপানিতে এর ব্যবহার আছে।

বক্রেশ্বরের জল ব্যবহার করলে বেশ কিছু উপসর্গের বা লক্ষণের সাময়িক

উপশম (নিরাময় নয়) আশা করা যায়, যার কারণগুলো আমরা ওপরের আলোচনা থেকে দেখতে পেলাম। উপকারের কারণ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে, 'ইন্দ্রজাল' বা দৈব শক্তির আশ্রয় নেবার প্রয়োজন পড়ে না।

বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণের জলের বিভিন্ন রোগ উপশমের (নিরাময়ের নয়) যে ক্ষমতা তার জন্য দায়ী হলো বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ (যেগুলো ঐ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে), জলের উষ্ণতা এবং ঐ জায়গার বাতাসে হিলিয়াম গ্যাসের উপস্থিতি। এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন জলে বিভিন্ন পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে সবগুলো যৌগই উপকারী না-ও হতে পারে। যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা ফ্লুরাইড যৌগের কথা ধরতে পারি (বক্রেশ্বরের জলে যেটা আছে)। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, জলে সামান্য পরিমাণ ফ্লুরাইড যৌগের উপস্থিতি আমাদের দাঁতের সুস্থতার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় কিন্তু ফ্লুরাইড যৌগের পরিমাণ যদি বেশি হয় (নিরাপদ মাত্রা হল ১·৫ মিঃ গ্রাঃ/লিটার) তাহলে দীর্ঘদিন ধরে বেশি ফ্লুরাইড-মিশ্রিত জল খেলে উপকারের পরিবর্তে দাঁত ও শরীরের অন্যান্য ক্ষতি (**fluorosis**) হয়ে থাকে।

আমরা সাধারণত যে-সব জল খেয়ে থাকি (কল, নলকূপ, ইঁদারা, ঝরণা ইত্যাদি) তাতেও অনেক ধরনের যৌগিক পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। বক্রেশ্বরের জলেও বেশ কিছু ধরনের যৌগিক পদার্থ আছে। এই দু-ধরনের জলকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে, এদের মধ্যে যে তফাৎ সেটা হলো দ্রবীভূত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের পরিমাণের কম-বেশি। বক্রেশ্বরের জলে যে সব যৌগ বেশি আছে (যা বিভিন্ন রোগ উপশমের কারণ বলে ভাবা হয়) সেগুলো পরিমাণ মতো সাধারণ জলে মিশিয়ে নিয়ে পান করতে থাকলে একই উপকার হবে বলে আশা করা যায়। বক্রেশ্বরের জল ব্যবহার করার জন্য গাড়ি ভাড়া ও পরিশ্রম ব্যয় করতে হবে না। তথাকথিত 'ঐন্দ্রজালিক' জলের গুণ বাড়িতে বসেই পাওয়া সম্ভব।

এই আলোচনায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হয়ে কোন উৎসাহী ব্যক্তি বা ভক্ত হয়ত ভাবতে পারেন যে, বক্রেশ্বরের জল খেলে উপকার হয় কাজেই এতে দোষের কি থাকতে পারে। তাদের এই ধরনের যুক্তির বিরুদ্ধে বক্তব্য হলো প্রত্যেক মানুষের শরীরে খুব অল্প পরিমাণে হলেও পরিমাপযোগ্য পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব বর্তমান। এগুলো সাধারণত মানুষের শরীরে খাদ্য, পানীয়, বাতাস ইত্যাদির মাধ্যমে ঢোকে এবং সাধারণত হাড়ে জমা হয়। একে বলা হয়, স্বাভাবিক শরীরের ভিতরকার তেজস্ক্রিয় পরিবেশ (Natural internal radioactive background)। এর সাথে যুক্ত হয় মানুষের শরীরের বাইরের

তেজস্ক্রিয় পরিবেশ, যার উৎস হলো পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের দরুন তেজস্ক্রিয়, ভস্মপাত, মহাজাগতিক রশ্মির মাধ্যমে ধেয়ে আসা তেজস্ক্রিয়তা, আণবিক চুল্লির তেজস্ক্রিয়তা এবং চিকিৎসাজনিত (যেমন X-Ray) তেজস্ক্রিয়তা ; অর্থাৎ মানুষ সব সময়ই কম-বেশি একটা তেজস্ক্রিয় পরিবেশে (ভিতর ও বাইরের) বাস করে থাকে—বয়স যত বাড়তে থাকে, শরীরে এই তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণও বেড়ে যায়। পৃথিবীতে বাস করতে গেলে এই তেজস্ক্রিয় পরিবেশ থেকে, মুক্তি নেই। এইসব বিচার করেই বিশ্বের তেজস্ক্রিয়তাজনিত ক্ষতির বিরুদ্ধে অছি পরিষদের (I C R P) সাবধান-বাণী স্মরণ করা যেতে পারে : '......nevertheless in view of the unsatisfactory nature of the evidence on which our judgements must be based, coupled with the knowledge that certain radiation effects are irreversible and cumulative, it is strongly recommended that every effort be made to reduce exposures to all types of ionizing radiations to the lowest possible level.'...অর্থাৎ তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হলো—এরকম অবাঞ্ছিত পরিবেশে বাঁচতে হবে বলেই যে কোন প্রকার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। এর পরেও বোধহয় নানাবিধ দুরারোগ্য রোগ সারাতে বক্রেশ্বরের জল ব্যবহারের কথা না ভাবাই ভালো কারণ ঐ জলে শুধু দ্রবীভূত যৌগিক পদার্থই নেই, সাথে আছে তেজস্ক্রিয় রেডন, আরগন ইত্যাদি পদার্থ।

সূত্র :

১. অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় : ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার
২. Dr. Shyamadas Chatterji's Article in *Science & Culture,* 1972
৩. *A Short Text Book of Radiotherapy*: Walter. J., Miller. H. and Bomford C.K. (1979), Churchil Livingstone
৪. *Radiation—What it is and How it affects you* : Jack Schubert and Ralph E. Lapp
৫. *ICRP Publications*—Dec. 1, 1954 and Sept. 17, 1965
৬. বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান, উৎস মানুষ সংকলন, ১৯৮৩
৭. *AFPRO NEWS NOTE,* pp 2 & 3, April 1983

পীযূষকান্তি সরকার

জুলাই ১৯৮৩

মাদ্রাজে খরা

দুই দৃষ্টিভঙ্গী, দুই সমাধান

খরাগ্রস্ত মাদ্রাজের মানুষ আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে মিস্টার জেকভের দিকে তাকিয়ে আছে। জেকভ কেরালার লোক। মেট্রোপলিটান ওয়াটার বোর্ড তাকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন। তিনি নাকি বৃষ্টি নামাতে পারেন। এখন সবাই সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছেন—কখন জেকভ 'বরুণদেব'কে তুষ্ট করে তৃষ্ণার্ত মাদ্রাজের দুঃখ ঘুচাবেন।

না, বরুণদেবের আশীর্বাদ-ধন্য হবার চেষ্টা এই প্রথমবার নয়। এর আগে শহরে জল সরবরাহের প্রধান উৎস রেড হিলস্ লেক-এ আরো একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হয়। জল সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এস. রাঘবন, মাদ্রাজ মেট্রোপলিটান জল সরবরাহ এবং ময়লা-নিকাশি বোর্ডের চেয়ারম্যান আই. কে.এ. দেওয়ান মহম্মদ এবং তাদের স্ত্রীদের দুর্লভ উপস্থিতিতে কুন্নাকুদি বিশ্বানাথন তার বেহালায় অপূর্ব স্বরমূর্ছনার সৃষ্টি করেন বরুণদেবের সন্তুষ্টির জন্য। পনেরো দিন ধরে বেহালা বাজে। কিন্তু হায়, রেড হিলস্ লেক-এর জল এক ইঞ্চিও বাড়ে নি। বাধ্য হয়েই কর্তৃপক্ষ কেরালার স্টেট ব্যাঙ্ক অব ত্রিবাঙ্কুর-এর কর্মচারী মেট্রোপলিটান মি. জেকভকে আমন্ত্রণ করেন।

থুতনি পর্যন্ত ঝুলে পড়া বরফসাদা ঢেউ খেলানো জুলপিতে মি. জেকভকে আরো বেশি করে রহস্যময় লাগে। প্রথমবারে কুন্নাকুদির চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে সরকার ও মেট্রোপলিটান বোর্ডকে যথেষ্ট বিদ্রূপ সইতে হয়েছিল, তাই মি. জেকভের ব্যাপারটা প্রথম থেকেই গোপন রাখার চেষ্টা চলছিল। রিপোর্টারদের ফাঁকি দিতে এবং বৃষ্টি আনার কাজে মি. জেকভকে সাহায্যের জন্য বোর্ড প্রতিদিন তাদেরই গাড়ির ব্যবস্থা করেন।

মি. জেকভ ১৫ মার্চ '৮৩ থেকে এ-শহরে আছেন। তিনি এতদিন আকাশে বিভিন্ন বেতার তরঙ্গ পাঠাতেই ব্যস্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে শহরে ঝির ঝির করে এক পশলা বৃষ্টি হয়। তাতে কাজের কাজ এটাই হয়েছে যে, মি. জেকভের 'ওস্তাদি'-র প্রতি কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস আরো একটু গাঢ় হয়েছে। মি. জেকভ

দাবি করেন যে, তিনি সম্পূর্ণ 'বৈজ্ঞানিক' উপায়েই বৃষ্টি আনেন। এরজন্যে তার দরকার কেবল একটি টেলিফোন অথবা রেডিও ট্রান্সমিটার; এ দিয়ে তিনি আকাশে বেতার তরঙ্গ পাঠান এবং বৃষ্টি আনেন। তার স্কুল-শিক্ষিকা স্ত্রী বলেন যে, তার স্বামী শুধু যে প্রয়োজনে বৃষ্টিই নামাতে পারেন তা নয়, তিনি অত্যধিক বৃষ্টিকে প্রতিহত করে তার মাত্রা কমিয়ে দিতেও পারেন।

জেকভ তার যন্ত্রপাতি নিয়ে দীর্ঘ ৯৬ ঘণ্টা অনেক 'বৈজ্ঞানিক' কসরৎ চালিয়েও ৯৬ ফোঁটা বৃষ্টির জলও আনতে পারেন নি।

উর্ধ্বতন মেট্রোপলিটান অফিসার ও ইঞ্জিনিয়ারগণ মি. জেকভের পেছনে গত দশদিন ধরে সারা শহর টহল না দিয়ে যদি রেড হিলস্ লেক-এর মহামূল্যবান যে জলটুকু এখনো শুকিয়ে যায় নি, তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের ওপরে একটু নজর দিতেন, তবে তা অনেক ফলপ্রসূ হতো।

দেড় বর্গ কিলো মিটার জুড়ে রেড হিলস্ লেক বিস্তৃত। প্রতিদিন তার বুক থেকে এক থেকে দেড় কোটি লিটার জল বাষ্পাকারে উড়ে যাচ্ছে। তিন মাস আগে মাদ্রাজ আই আই টি পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করেছিল যে, জলের ওপরে অ্যাসিটাইল অ্যালকোহলের আস্তরণ দিলে জল আর বাষ্পীভূত হতে পারে না। যত জল বাষ্পীভূত হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার অর্ধেক পরিমাণ জল এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের টনক এতে নড়ে নি।

তামিলনাড়ুর এম. জি. রামচন্দ্রনের এ আই এ ডি এম-কে সরকার এই ভয়াবহ জল সংকটে জল সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য যে সব জরুরী ব্যবস্থা হাতে নেবার দরকার ছিল সেগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে, পূর্ণ আস্থা নিয়ে জাদু ও গুপ্ত-বিদ্যার চমকে পুলকিত হবার জন্য অপেক্ষা করছেন।

একটি শাসক রাজনৈতিক পার্টির বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের চেয়ে অলৌকিকের প্রতি আস্থা স্থাপনের পরিণাম একটাই—এবং তা হলো মাদ্রাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরেও জলসরবরাহে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার মতো ঘটনা। আর তামিলনাড়ুর অন্যান্য ছোট ছোট শহর ও গ্রামের অবস্থা তো সহজেই অনুমেয়।

অলৌকিকের গোলকধাঁধাঁয় ঘোরাঘুরি করে কর্তৃপক্ষ এখন এই তৃষিত শহরে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করার জন্য অনেক বেশি বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হচ্ছেন। রেল ওয়াগন, জাহাজ ও ট্যাঙ্কারে করে শহরে জল আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। রেলমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে, মাদ্রাজে জল সরবরাহের জন্য যেন অনেক বেশি রেল ওয়াগনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে রেড হিলস্ লেক-এ বর্তমানে আর মাত্র তিন ফুট জল আছে; তা দিয়ে আর কতদিন এই শহরে

জল সরবরাহ করা যাবে ?

দূর থেকে জল বয়ে আনা ছাড়াও কর্তৃপক্ষ ভূগর্ভ থেকে জল তোলার ব্যবস্থা নিয়েছেন। ঐ কর্তৃপক্ষ শহরের দক্ষিণাংশে তিরুভানময়ুর—মুট্টুকাড়ু অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জল আহরণের ব্যবস্থাও নিয়েছেন। এতে ব্যয় হবে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এবং প্রতিদিন ৫০ লক্ষ গ্যালন জল পাওয়া যাবে।

অলৌকিকের লাগভেল্কির পেছনে না ছুটে কৃষ্ণা নদীর জল নিয়ে মাদ্রাজের জল ঘাটতি পূরণের প্রকল্পের (এটা সাত বছর ধরে ধামা-চাপা পড়ে আছে) মত দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থার সঙ্গে ওপরে বর্ণিত আশু ব্যবস্থাগুলি যদি সময়মতো নেওয়া হতো তবে মাদ্রাজের নাগরিকদের এই অনাবশ্যক দুর্ভোগ অবশ্যই ভুগতে হতো না—এটা ঠিক।

সূত্র : *The Statesman* (27.3.83, 7.4.83)

জ্যোতির্ময় সমাজদার

জুন ১৯৮৩

'যোগের দ্বারাই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ সম্ভব' : যোগী সরকারপক্ষের এ অবৈজ্ঞানিক প্রয়াস নিন্দনীয়' : উপাচার্য নরসীমাইয়া

নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই গত ২৮ মে '৮৫ সকালে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। পৌঁছেই শুনতে পেলাম সেখানে অনেকদিন বৃষ্টি হচ্ছে না। শুধু আগের দিনই খানিকই বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তাই আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা ও মনোরম। ওখানকার ঐদিনের দৈনিক সংবাদপত্রের একটা খবরে বেশ মজা লাগল। খবরটা এরকম—"কর্ণাটক সরকারের জল সরবরাহ ও ময়লা-নিকাশি সংস্থার (Bangalore Water Supply and Sewerage Board) পক্ষ থেকে প্রখ্যাত শিববালযোগীকে শহর থেকে কিছু দূরে থিপাগাণ্ডানাহালি জলাধারে বৃষ্টি আনানোর 'বরুণজপ' করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।" এর আগেও, ১৯৭৯ এবং ১৯৮১ সালে, যোগীকে দু-বার এই কাজে ডাকা হয়েছিল।

প্রথমোক্ত ঘটনার প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে আগেই কিছুটা বলে নেওয়া দরকার। এই থিপাগাণ্ডানাহালি জলাধার থেকেই ব্যাঙ্গালোর শহরের প্রায় সমস্ত জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ বৃষ্টির অভাবে এটিতে সঞ্চিত জলের পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে কমে গিয়েছিল। সরকারি কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী যেটুকু জল রয়েছে তাতে ঠিক আর ১৫ দিন শহরে জল সরবরাহ করা যাবে। তাই এই জপই হলো তাদের এখন একমাত্র উপায়। সেইজন্য তারা লিখিতভাবে যোগীকে একাজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এর আগের দু-বারের সাধনার ফলাফল নাকি খুবই সফল বলে দাবি করা হয়েছিল। প্রায় সম্পূর্ণ শুষ্ক জলাধারটি যোগীর প্রার্থনার পরই নাকি কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। তাই খুবই আশান্বিত হয়ে কর্তৃপক্ষ এবারেও এই ব্যবস্থা নিয়েছেন।
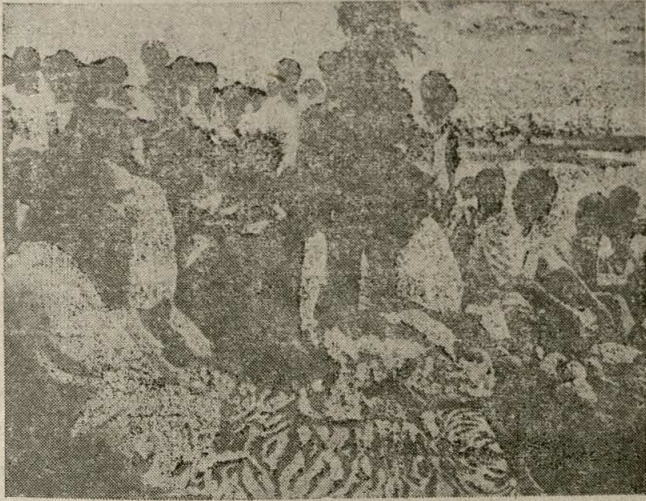
ধ্যানে বসেছেন শিববালযোগী

৩০ মে '৮৫ সকাল থেকেই সঙ্গীত-নৃত্য ও ভক্তবৃন্দের তীব্র চীৎকারের ঐকতানে নির্জন জলাধার অঞ্চলটি একটা অভূতপূর্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিণত হলো। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা পরিচালনা করেছে ব্যাঙ্গালোরের সরকারি জল সরবরাহ ও ময়লা-নিকাশি সংস্থা। অনুষ্ঠানের 'নায়ক' শিববালযোগী সাদা ধুতি পরিহিত হয়ে একটা লিমুজিন গাড়িতে চেপে নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। ভক্তবৃন্দ তুমুল হর্ষধ্বনি করে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। গাড়ি থেকে নেমেই সোজাসুজি একটি সামিয়ানার নিচে তার নির্দিষ্ট স্থানে

এলেন। পদ্মাসন হয়ে বসে চোখ বুজলেন এবং একটু পরেই গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। কৌতূহলী গ্রামবাসী ও শিশুরা, যোগীর ভক্তেরা এবং জল সরবরাহ সংস্থার একদল অফিসার ধ্যানমগ্ন যোগীর পেছনে বসে রইলেন। শরীরের মধ্য ভাগের একটু স্পন্দন ছাড়া যোগী সম্পূর্ণ নিশ্চল ছিলেন। কিছু সময় অন্তর একজন ভক্ত তার গায়ের ঘামটা শুধু মুছে দিচ্ছিলেন। শঙ্খধ্বনির সাথে সাথে ভজনের স্বর ক্রমশ তীব্র চড়া হতে লাগল। ভক্তেরা তখন উঠে দাঁড়িয়ে উন্মাদের মতো নৃত্য শুরু করল এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই নৃত্য চলতে লাগল।

ইতোমধ্যে যোগীর ভক্তেরা বিভিন্ন রকম অলৌকিক কীর্তিকলাপ দেখাতে শুরু করলেন। একজন মহিলা প্যাণ্ডেলে সাজানো গাছের সবুজ পাতা ছিঁড়ে নিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগলেন। কখনও একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। গ্রামবাসীরা নিঃশব্দে বসে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো দেখছিল। ভক্তেরা তাদের কপালে বুড়ো আঙ্গুল ছুঁইয়ে যেন নিজেদের ভাবাবেগ আর উচ্ছ্বাসের স্পর্শ দিচ্ছিল। কোন কোন ভক্ত আবার জলন্ত কর্পূর গিলে ফেলছিলেন।

সমস্ত ব্যাপারটা বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই চলছিল। হঠাৎ একদল যুবক কালো পতাকা নিয়ে এবং জল সরবরাহ সংস্থা এবং এই জাতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে দ্রুত সেইদিকে হেঁটে আসছিল। কিন্তু যোগীর ধ্যানের জায়গায় পৌছোবার আগেই স্থানীয় পুলিশ তাদের প্রায় ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দিল। এই যুবকেরা সোস্যালিস্ট স্টাডি সেণ্টার (কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, হেবাল)-এর সদস্য। নিজেদের সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে তারা ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। পুলিশ অবশ্য এর জন্য মোটামুটি প্রস্তুতই ছিল। কেন না তার আগের দিনই কাগজে ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ এইচ নরসীমাইয়া সরকারি তরফের এই অবৈজ্ঞানিক প্রয়াসের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।

এইভাবে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল। গ্রামবাসীদের কেউ কেউ খানিকটা ক্ষুধার্ত, কেউ বা কিছুটা অধৈর্য্য হয়ে চলে যেতে লাগল। সমবেত জনতার মধ্যে কয়েকজন অস্ট্রেলিয়ানও ছিল। তারা ব্যাঙ্গালোরে স্থায়িভাবে বসবাস করছে এবং জীবনের অর্থ ও সত্যের সন্ধানে এখানে এসেছে। তারা 'ভারতবর্ষ ও তার পবিত্র যোগী' বিষয়টি নিয়ে খুবই আলোচনায় ব্যস্ত।

স্বামীজীর চোখ খুলবার মুহূর্তটির জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষায় ছিল। রীতিমতো উত্তেজিত সবাই, চারদিক থেকে ক্যামেরার লেন্স তৈরি। অবশেষে বিকেল ২ টো ৪০ মিনিটে স্বামীজী তার ধ্যান ভঙ্গ করলেন। একটা ছোট

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর স্বামীজী 'বিভূতি' দিয়ে সমবেত সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। তাকে খানিকটা ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কর্তৃপক্ষের পদস্থ অফিসারেরা শ্রদ্ধায় স্বামীজীর সামনে অবনত হয়ে বসে রইলেন, ঠিক যেন বশ্যতা স্বীকার। স্বামীজী প্রদত্ত কিছু নারকেল তারা জলাধারে নিক্ষেপ করলেন। ওখানে যে সমস্ত ভি আই পি ভক্তেরা তার পাদস্পর্শ করলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন এয়ারফোর্স অফিসার, আকাশবাণীর অধিকর্তা, মিসেস লক্ষ্মীকানথাম্মা (অন্ধ্রের ভূতপূর্ব মন্ত্রী ও পার্লামেন্ট সদস্যা)। তিনি এই উপলক্ষে অন্ধ্র থেকে ব্যাঙ্গালোরে উড়ে এসেছিলেন।

অবশেষে এল সেই মুহূর্ত। স্বামীজী ঘোষণা করলেন, 'এক মাসের মধ্যে জলাধারটি কানায় কানায় ভরে যাবে।' ভক্তবৃন্দ এবং জল সরবরাহ দপ্তরের কর্তারা সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা নাড়লেন। তিনি আরও বললেন, 'আমি এই একমাস ধরে প্রতিদিন আমার আশ্রমে প্রার্থনা চালিয়ে যাব।' একটু পরে ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ নরসীমাইয়ার অভিযোগের প্রসঙ্গ সাংবাদিকরা তুললেন। শুনেই তিনি রাগে ফেটে পড়লেন—'আমি কি মানুষকে প্রতারণা করছি? এই তিন ঘণ্টা আমি কি কারও কোন অসুবিধের সৃষ্টি করেছি? আমার জীবন সাধারণের সেবাতেই নিয়োজিত। উপাচার্যের সংখ্যা ১০১ হতে পারে, কিন্তু যোগী একজনই হয়। তিনি আগে এই পর্যায়ে আসুন, তারপর যেন আমার সাথে প্রতিযোগিতায় নামেন।' উপাচার্য তাকে যে কোন সময় যে কোন জায়গায় বৃষ্টি আনবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে যোগীর বক্তব্য কি? উত্তরে যোগী বলেন, 'ডঃ নরসীমাইয়া আমার প্রভু নন যে, তার আদেশ অনুযায়ী আমি কাজ করতে বাধ্য। তাছাড়া এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি রাজি নই।' বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বিধ্বংসী সাইক্লোন সম্বন্ধে তিনি কেন পূর্বাভাস দেন নি?—এ প্রশ্নের উত্তরে যোগী জানালেন যে, এরকম কোন অনুরোধ তাকে আগে করা হয় নি। তার বক্তব্য হলো প্রার্থনা ও সাধনার মাধ্যমেই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং তার 'যোগ'-এর মাধ্যমেই তিনি সেটা প্রমাণ করতে পারেন। কেউ কেউ তাকে প্রশ্ন করেন, তার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি রাজ্যের দেউলিয়া অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করে দিতে পারেন কি না। তিনি বলেন, 'আমি নোট ছাপাই না। তাহলে তো হাতকড়া পড়বে। আমি একজন যোগী, রাজনীতি করাটা আমার কাজ নয়। আমি বৃষ্টি আনাতে পারি এবং ভালো শস্য উৎপাদন করিয়ে দিতে পারি। এতেই রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে।' ইতিমধ্যে কালো মেঘ ক্রমশ আকাশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সবাই যখন

ব্যাঙ্গালোর শহরে ফিরে এলেন ততক্ষণে বেশ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জল সরবরাহ কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট অনুযায়ী জলাধারে সেদিন নাকি ৫ মি.মি. বৃষ্টি হয়েছে।

শুরু করেছিলাম ২৮ মে '৮৫-র ব্যাঙ্গালোরের এক দৈনিক সংবাদপত্রে শিববালযোগীর 'বরুণজপ'-এর খবর উল্লেখ করে। ওদিনকার ঐ একই কাগজে ছিল আরেকটি খবর—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে কোচিনে (পশ্চিম উপকূলে) প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে এবং পূর্বদিকে সেটা এগিয়ে আসছে। অর্থাৎ ৫ জুনের মধ্যে ব্যাঙ্গালোর ও তার আশেপাশে প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। আবহাওয়া দপ্তরের খবরানুযায়ী যখন ব্যাঙ্গালোর ও তার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অবশ্যম্ভাবী, ঠিক তখনই ধ্যান বা যোগ বা কোন অলৌকিক উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানোর দাবি উঠলে যে কোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাতে সন্দেহ করবেন। ব্যাঙ্গালোরে যোগীর ঘটনায় তাই চালাকি ও অন্ধবিশ্বাসের যোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিববালযোগীকে গুজরাটের সাইক্লোন ও অন্যকিছু ঘটনা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ জানানো হলে তিনি কৌশলে তা এড়িয়ে যান। যখন সরকারি অফিসারদের প্রশ্ন করা হয়—'আপনারা কেন যোগীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন', তখন উত্তরে তারা নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য বলেন যে, জলাধারাটি একটি সংরক্ষিত এলাকা। সেখানে কেউ প্রবেশ করতে চাইলে সরকারি আদেশপত্র চাই। শুধু সেটাই দেওয়া হয়েছে, কোন আমন্ত্রণ যোগীকে জানানো হয় নি। অথচ তখনকার পত্র-পত্রিকার খবর থেকে কর্তাব্যক্তিদের এই কৈফিয়ৎ সত্য বলে প্রমাণ হয় না।

আবহাওয়া দপ্তর ও জল সরবরাহ সংস্থা উভয়েই রাজ্য সরকারের অন্তর্গত। সুতরাং আবহাওয়ার পূর্বাভাসের উপর (যেটা সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞানসম্মত) নির্ভর না করে, যোগ বা ধ্যানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া একটি সরকারি সংস্থার পক্ষে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবেরই পরিচয়। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এ-ধরনের ঘটনা নৈতিক অধঃপতনেরই পরিচয়।

সূত্র:

১. *Indian Express* : 28 to 31 June '85 issues

২. *Deccan Herald* : 29 to 31 June '85 issues

চন্দনা ভদ্র

সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

ট্রানসেনডেন্টাল মেডিটেশন : মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি

১৯৮২-তে আমেরিকার ফেয়ারফিল্ডে আইওয়া অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স এর এক সম্মেলনে 'মহাঋষি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়'-এর (MIU) পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ আর এ রবিনফ্ এবং তার কয়েকজন সহযোগী 'আবহাওয়ার উপর সুসঙ্গত ও সমষ্টিগত মনঃসংযোগের প্রভাব' (Effect of Coherent Collective Consciousness on the Weather) শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণাপত্রে কিছু তথ্য ও তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে 'ট্রানসেনডেন্টাল মেডিটেশান' (Transcendental Meditation)-এর দ্বারা আবহাওয়াকে প্রভাবিত করা যায় বলে দাবি করা হয়েছে। গবেষণার সূত্র প্রসঙ্গে বলা হয়,-MIU-তে ১৯৭৯-র ২৭ নভেম্বর থেকে ১৯৮০-র ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত, এই ৪৩ দিন, একটি বড় রকমের নির্মাণ কাজ চলছিল। শুধু ঢালাই-এর আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় শিষ্যদের ও অন্যান্য ভক্তদের নির্দেশ দেওয়া হতো যে তার যেন প্রাত্যহিক সান্ধ্য-ধ্যানের আসরে (TM) পরের দিনের জন্য উষ্ণ আবহাওয়া প্রার্থনা করেন, কারণ প্রবল শীতে, প্রায় হিমাঙ্কের কাছাকাছি তাপমাত্রায় এই ধরনের কাজ করা কষ্টসাধ্য। বাস্তবত সেই দিনগুলোতে উষ্ণ আবহাওয়াই পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং নির্মাণপ্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে 'টি এম'-এর দ্বারাই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে—এ কথা অস্বীকার করা যায় কি করে?

কিন্তু, ঐ অঞ্চলের একটি কলেজের গণিত ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্কলিন ডি ট্র্যাম্পির কাছে বিষয়টা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ট্র্যাম্পি আইওয়ার 'জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা' কর্তৃক ঘোষিত আবহাওয়ার পূর্বাভাসগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন MIU-তে ঐ ৪২ দিনের মধ্যে যে ৮ দিন কংক্রিট ঢালাই করা হয়েছিল তার ঠিক আগের দিনগুলোর আবহাওয়ার পূর্বাভাসে 'অনুকূল' বলা হয়েছিল। এরপর MIU-এর দিনলিপিও তিনি সংগ্রহ করেন। ট্র্যাম্পি পরিষ্কার লক্ষ্য করলেন, ওই আট দিন 'টি এম'-এ

অংশগ্রহণকারীদের উষ্ণ আবহাওয়া প্রার্থনার জন্য নির্দেশ দেবার আগেই ওখানকার আবহাওয়া সংস্থা বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিচ্ছিল যে, আবহাওয়ার উপর প্রভাবকারী প্রাকৃতিক কারণগুলি উষ্ণ আবহাওয়ার লক্ষণই প্রকাশ করছে। এই ঘটনা আবহাওয়ার উপর 'টি এম'-এর প্রভাব বিস্তারের দাবিকে নস্যাৎ করে দেয়।

আমেরিকাতে কংক্রিটের মালমশলা মিশ্রিত অবস্থায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে। একবার কংক্রিট যদি মেশানো হয়ে যায়, তবে তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলতে হবে। নতুবা সময় ও উষ্ণতার উপর নির্ভর করে কংক্রিট জমে শক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং অনুমান করা যায়, কংক্রিট মশলা সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকে আবহাওয়ার উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হয়। MIU কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কংক্রিট সরবরাহকারী সংস্থার নাম জানার পর ট্র্যাম্পি ঐ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার কিছু প্রশ্নের উত্তরে সংস্থা জানায়: ১. শীতকালে কংক্রিট ব্যবহার করবার আগে আমরা সাধারণত 'জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা'র উপর নির্ভর করে থাকি; ২. ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় (তাপমাত্রা ৩২° ফা. এর নিচে) আমরা গ্রাহকদের প্রস্তুতির জন্যে একদিনের নোটিশ দিই। অতএব এটা পরিষ্কার যে, MIU কর্তৃপক্ষ, অনুকূল আবহাওয়া ও সরবরাহকারী সংস্থার নোটিশের উপর ভিত্তি করে 'ট্রানসেনডেণ্টাল মেডিটেশন' শক্তি প্রয়োগ করতেন এবং বাস্তবে 'টি এম'-এর দ্বারাই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে মনে হতো। এভাবেই তারা জনসমক্ষে তাদের অলৌকিক ধ্যানের মহিমা তুলে ধরেন, আর রবিনফের মতো কিছু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি এর সপক্ষে প্রচার চালান।

[অলৌকিক, আধিদৈবিক, অতীন্দ্রিয় কোন শক্তি বা ঘটনার দাবিকে তখনই গ্রহণ করা চলে যখন তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিচারে সংশয়ের উর্দ্ধে ওঠে। অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী না হয়ে বিজ্ঞানের নিরিখে ঘটনাকে যাচাই করার প্রয়াস উৎস মানুষ-এর কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম।

অনুরূপ একটি পত্রিকার (ত্রৈমাসিক) পরিচয় পেয়েছি আমরা—The Skeptical Inquirer। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশ করেন, 'Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal' সংস্থা। অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতের পিছু ধাওয়া করে সত্য উদ্‌ঘাটন করা এদের ব্রত। প্রখ্যাত সমাজসচেতন বিজ্ঞানী পল কুরৎজ, জেমস র‍্যানডি, মার্টিন গার্ডনার, অ্যালকক, আসিমভ, কার্ল-সাগান এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। পত্রিকার ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় মহেশ যোগীর ধ্যানশক্তির রহস্য সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখেছেন এফ ডি ট্রাম্পি। এই রচনাটি তারই সারসংক্ষেপ। —স.ম.]

শ্যামল ভদ্র

সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

জল-সন্ধানী যাদুকর

[বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও জনপ্রিয়করণের অন্যতম প্রবক্তা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৯৪-এর ১ জানুয়ারি, মৃত্যু ১৯৭৪-এর ৪ ফেব্রুয়ারি। উদ্ধৃত রচনাটি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন' থেকে নেওয়া। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্বীপপুঞ্জ' পত্রিকায়। —স.ম.]

মাঝে মাঝে শোনা যায় অনেক পয়সা খরচ করে কূপ খনন করা হলো, বহুদূর পর্যন্ত মাটির নীচে নেমেও কপালের দোষে জলের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। তাই আগের কালে মানুষ নদীর ধারে বসতি করতে যেত—আজও সে পুষ্করিণী খুঁড়ে বর্ষার জল ধরে রাখে শুক্‌নো ডাঙ্গায়। এখন অবশ্য মাটির ভেতরে বহুদূর নল চালিয়ে জল তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। পয়সা খরচ করতে পারলে হাজার ফুটের তলা থেকেও বৈদ্যুতিক পাম্প চালিয়ে জল তোলা যায়। কলকাতার মধ্যেই সেরকম দু'তিনটি নলকূপের খবর পাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা আজ মনে হচ্ছে। আমার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু গল্প করছিলেন—তাঁর উপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভার পড়েছিল অন্তরীণ যুবকদের জন্য হিজলীতে জেল গড়ে তোলার। ঘরবাড়ি তৈরি হলো, জেলের বিরাট পাঁচিল উঠলো, কিন্তু সরকারের সামনে উঠলো এক নতুন সমস্যা। বহু পয়সা খরচ করেও মাটি খুঁড়ে সেখানে প্রথমবার জল পাওয়া গেল না। সেখানে তাই হয়ত মানুষে বসত করে নি—বিশাল ভূ-ভাগ জঙ্গল হয়েই ছিল। সরকার হয়ত সেইজন্যই ওখানেই জেল বানাতে চাচ্ছিলেন। স্বদেশী ছেলেরা যেন গ্রামের লোকের সংস্পর্শে না আসতে পায়—দেশপ্রেমের বিষ যেন চারিদিকে না ছড়ায়। হিজলী গ্রাম হয়ত সেই জন্যই নির্বাচিত হয়েছে। কাগজে পড়া যেত, এক শ্রেণীর যাদুকর নাকি আছে যারা কোথায় খুঁড়লে জল মিলবে ঠিক আন্দাজ করতে পারে। কেউ কেউ বলতো ও সব বুজরুকী—তবে সেই সময় কলকাতার বিলাতী এক কোম্পানী প্রচার করতো মোটা ফী পেলে তারা জল খুঁজে দেবার দায়িত্ব নিতে পারে। শেষ অবধি তাদেরই শরণ নিতে হলো। কোম্পানীর লোক জল খুঁজতে এল। দেখা গেল কর্মপদ্ধতি নূতন ধরনের, কিন্তু কোন দামী যন্ত্রের বালাই নেই।

কোন এক তাজা গাছের ডাল, যেখানে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে, সেই Y-অনুকরণের একটি অংশ গাছ থেকে কেটে নিয়ে দুই হাতের তালুর মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ঈষৎ চেপে সে এদিক-ওদিক ঘুরাতে লাগলো—অবশেষে এক জায়গায় দেখা গেল বারবার যাদুদণ্ডের সোজা অংশ ক্রমাগত একই স্থানে এসে ঝুঁকে পড়ছে। লোকটি বল্লে এইখানে কূপ খুঁড়লে নিশ্চয়ই জল মিলবে। সেবার ঘটলোও তাই। জেলখানার জলের বন্দোবস্ত সন্তোষজনকভাবে হয়ে গেলো।

আমি নতুন যুগের নবীন বিজ্ঞানী, অলৌকিক শক্তির খবরে মন সাড়া দেয় না। যদিও বন্ধু আরও অনেক নজীর দিয়ে আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে এমন অঘটন আজও ঘটছে—বিজ্ঞানীরা যা স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় পদার্থের সাধারণ গুণাবলীর আলোচনা আমাকেই করতে হতো। মহাকর্ষ বস্তুর সাধারণ গুন। নিউটন কবে গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখেছিলেন, সেই থেকেই পৃথিবীর চারিদিকে যে অদৃশ্য শক্তিক্ষেত্র রয়েছে—g-ক্ষেত্র—কৌতূহলী বিজ্ঞানীরা তার মর্ম ও ধর্ম নানাভাবে পরীক্ষা করে চলেছেন। হাঙ্গেরীর বিজ্ঞানী ব্যারন ইয়োটভোস (Eotvos) g-ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন দিকে তার আপেক্ষিক মানের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয় করবার এক সূক্ষ্ম তুলাযন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, তারই খবর দিতে হচ্ছিল ছাত্রদের।...ইয়োটভোসের মানদণ্ড ভূতত্ত্ববিদ্রা তাঁদের কাজে লাগাতেন ; মাটির অনেক নীচে তেলের নদী কোথায় বহমান, কোথায় বা ধাতুর আকর স্তরে স্তরে বিছান রয়েছে মাটির তলায়। ফলে g-শক্তিক্ষেত্রের যে অল্প বিকৃতি ঘটেছে তা হয়ত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। অনুসন্ধানীর মানদণ্ডে তার হ্রাসবৃদ্ধির নিশানা পাওয়া যাচ্ছে। এইভাবে এই সূক্ষ্মযন্ত্রের সাহায্যে অনেক আকর বা পেট্রোলিয়ম উৎস আবিষ্কৃত হয়েছে পৃথিবীর নানা জায়গায়। অষ্ট্রেলিয়ায় বা সাহারার মরুপ্রান্তরে তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এর কল্যাণে—বলে জনশ্রুতি। মনে হলো আমাদের দেশেও এই দামী যন্ত্রটির কোথাও থাকার কথা। তবে হয়ত সেটি অতিযত্নে কাঁচের আলমারীতে রক্ষিত থেকে সঞ্চয়ী বিজ্ঞানীর ভাণ্ডার পূর্ণ করছে। তাকে নিয়ে বনজঙ্গল ঘুরবার অসম সাহস এদেশী বিজ্ঞানীর তখনও হয় নি। যান্ত্রিক দণ্ড মাটির নীচে বহতা জলের খবর দিতে পারে, তবে এই সূক্ষ্ম তুলামাপকের সঙ্গে Y-যাদুদণ্ডের তো কোন সাদৃশ্যই নেই। তাই Y-যাদুদণ্ডে সহজেই মানুষ এত গভীর তলের খবর পায়—এ বিশ্বাস করতে মন চাইল না। সমস্যা রয়েই গেল।...

পরের খবর স্বাধীন ভারতের দিল্লী সহরের। তখন রাজ্যসভার সভ্য, গিয়ে শুনি রাজপুতানায় এক পানিওয়ালা মহারাজের আবির্ভাব হয়েছে। নানাস্থানে

উৎসের সন্ধান দিয়ে তিনি দেশের লোককে উপকৃত ও চমৎকৃত করেছেন। সরকার তাঁকে কোনভাবে বিপুল কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন কিনা তারই আলোচনা উঠেছিল সেবারে সে সভায়।

অতি প্রাচীনকালে রাজপুতানার পশ্চিম ভূ-ভাগের মধ্য দিয়ে এক খরস্রোতা নদী প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে মিশতো। দুই তীর আশ্রয় করে বহু লোকের বসতি ছিল সে সময় সে অঞ্চলে। তখন নগরকেন্দ্রিক যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার ধ্বংসাবশেষ উৎখননের ফলে মধ্যে মধ্যে আজও প্রকাশ পাচ্ছে। অভিজ্ঞরা মনে করেন বৈদিক যুগের আগে—আর্যরা এ দেশে আসার বহু পূর্ব থেকে যে সভ্যজাতি এখানে বাস করতো, তারা প্রাচীন মহেন্‌জদারো ও হারাপ্পার অধিবাসীদের নিকটজ্ঞাতি। চার হাজার বছরে এ প্রদেশের জলবায়ুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মরুপ্রান্তর অল্পে অল্পে এগিয়ে উর্বর ভূমিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে। নদী নিশ্চিহ্ন হয়ে বালুর মধ্যে লুকিয়েছে। কেউ কেউ বললেন পানিওয়ালা মহারাজের কৃপায় হারানো নদীখাতের পুনরুদ্ধার সম্ভব এবং তাহলে এই প্রদেশে ফিরে আসবে অধুনালুপ্ত পুরানো শ্রীসমৃদ্ধি। শেষ অবধি আশা ফলবতী হলো না। মাটির মধ্যে জলের সন্ধান পেলেও তাকে সুমিষ্ট জলের উৎসের খোঁজ বলে পরিগণিত করা হতো না। প্রচুর লবণজাতীয় বস্তু দ্রবীভূত হয়ে জল বিস্বাদ করে রেখেছে—সে জল চাষ-আবাদের অযোগ্য। কাজেই দিল্লীতে একসময় পানি-মহারাজের নাম দিকে দিকে বিঘোষিত হলেও আজ তাঁর কথা লোকে ভুলেছে।

১৯৬২ সালে একটি ছোট বই হাতে এলো। লিখেছেন বন্ধু প্রফেসর রোকার (**Rocard**)। দেখলাম এ বিষয়ে অনেক খবর আছে যা আমার অজানা ছিল। মধ্যযুগ বা তার অনেক আগে থেকেই যাদুকর-দণ্ডের সাহায্যে জল বা যখের ধনের খোঁজাখুঁজি চলতো। এখন অনেক সময় বিপথে চালিত হচ্ছে এই নিপুণতা। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষ অনেক সময় ভাবে এটি কুসংস্কার বিশেষ—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। তবুও এই নিয়ে প্রফেসর রোকার অনেকদিন ধরে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর অনেক ছাত্র তাঁকে সাহায্য করেছে। এদের মধ্যে কারোর কারোর হাতে যাদুদণ্ড সাড়া দেয় এবং জলসন্ধানে তাঁরা অনেক সফল হতেন। নানাভাবে পরীক্ষা করে রোকার সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মাটির মধ্যে জল যখন পরিশ্রুত হয় তখন উপল বন্ধুর স্থানের মধ্যে দিয়ে যেতে এক বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হতে পারে যা বিজ্ঞানী **Quincke** (কুইনকে) অনেকদিন লক্ষ্য করেছিলেন। এর ফলে এক বিশেষ রকমের চৌম্বক ক্ষেত্রও সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় যা কোন অজ্ঞাত উপায়ে মানুষের দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে

এবং মানুষ যদি নিজের মন ও দেহ সুস্থির করতে পারে তা হলে অসমবিস্তৃত এই চৌম্বক ক্ষেত্র গতিশীল মানুষকে এমন অবস্থায় আনতে পারে যার বহির্নির্দেশ হল এই যাদুদণ্ডের বিনমন। বিশেষভাবে নিজের মাংসপেশীকে স্তম্ভিত করতে শিখলে দেখা যায় প্রায় শতকরা পঞ্চাশের কাছাকাছি লোক এভাবে সাড়া দিতে পারেন। প্রফেসর রোকার যন্ত্র তৈরী করে মৃদু চৌম্বকক্ষেত্রের শক্তি নিরূপণ করেছেন যার থেকে শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে ন্যূনতম কি পরিমাণ শক্তিমাত্রার প্রয়োজন তার একটা মাপ করার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র কোন অজ্ঞাত উপায়ে মানুষের শরীরের উপর প্রভাব চালায় যার ফলে এই যাদুকরী বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

সহরের ছেলেমেয়েরা তো বন জঙ্গলে Y-দণ্ড নিয়ে অনুসন্ধান করতে পারবে না—তবে তাদের শরীরে এইভাবের কোন অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সুপ্ত আছে কিনা দেখতে প্রফেসর একটি পরীক্ষার উল্লেখ করেছেন যেটি সব সহরেই সহজেই হবে। তিনি দেখেছেন যে, বিশেষ ধরনের মোটর গাড়ির যন্ত্র থেকে যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র বিকীর্ণ হয় তা অল্প দূর থেকে যাদুদণ্ডের সাহায্যে মানুষে অনুভব করতে পারে। এর জন্যে দণ্ডটি ধরবার একটি বিশেষ কায়দা আছে যেটি কয়েকবার চেষ্টা করে সকলেই আয়ত্ত করতে পারে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮১

জল-যাত্নকর : সন্দেহের ছায়াপাত

জল-সন্ধানী যাত্নকরদের কথা মাঝে-মাঝেই এদিক-ওদিক থেকে শোনা যায়। প্রয়াত বিজ্ঞানী ও সমাজসেবী সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের আশ্রম বাঁকুড়ার খরা-অধ্যুষিত এলাকায় গোগড়া গ্রামে। সেখানে গিয়ে একটি কুয়ো মতো খাদ দেখেছিলাম। শুনলাম, সতীশবাবু গোগড়ায় আশ্রম করার পর জলের অভাব মেটানোর জন্য এক জল-যাত্নকরকে ডেকেছিলেন। ঐ যাত্নকরের কথামতোই কুয়োটি খোঁড়া হয়েছিল। এবং জলও নাকি পাওয়া গিয়েছিল। এখন অবশ্য ওটায় আর জল নেই। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে উঁকি মারে জল-যাত্নকরদের কীর্তির কথা। বিদেশেও এদের সংখ্যা কম নয়। এরা যেভাবে মাটির নিচে জলের খোঁজ করে ইংরাজিতে তাকে বলে water-witching। এছাড়া 'ডাউজিং' (Dowsing) কথাটিও চালু আছে। Dowsing-এ (ডাউজিং) শুধু জলই নয়, মাটির তলায় খনিজ পদার্থ, তেল ইত্যাদি নানা ধরনের জিনিসেরও সন্ধান পাওয়া যায় বলে বলা হয়। এর জন্য যাত্নকর ('যাত্নকর' কথাটিই প্রথম থেকে ব্যবহার করছি, যদিও অন্য কোন কথা ব্যবহার করতে পারলে ভালো হতো) ইংরাজি 'Y' অক্ষরের মতো একটি গাছের ডাল বা বিশেষভাবে তৈরি কাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। 'Y'-এর ত্ন-টি শাখা তার ত্নই হাতে ধরা থাকে। যেখানে এসে কাঠির নিচের অংশটা মাটির দিকে নেমে যেতে চাইবে সেখানেই থাকবে উদ্দিষ্ট বস্তু—এই হলো দাবি। অনেক সময় একটা 'Y'-আকৃতির কাঠির বদলে ধরা থাকে ত্নটো 'L'-আকৃতির কাঠি। অথবা ওসব কিছুই নয়, খালি একটা ওলন-দড়ি দিয়েই কাজ চালায় যাত্নকর।

এখন প্রশ্ন হলো, ব্যাপারটা আসলে কি ? জল-সন্ধানীদের কি সত্যিই এরকম কোন ক্ষমতা আছে, না কেবল আন্দাজের ওপর ভিত্তি করে যতটা বলা যায় তার চাইতে বেশি সঠিক হয় না তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ? অধ্যাপক সত্যেন বস্থর লেখায় ['জল সন্ধানী যাত্নকর', সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ, বর্তমান সংকলন, পৃ. ১৪৩] রোকা (Rocard)-র মতের উল্লেখ আছে। রোকার মত হলো, মাটির নিচে জল থাকলে মাটির উপরকার চৌম্বক ক্ষেত্রে সামান্য হেরফের হবে। কোন এক অজ্ঞাত উপায়ে যাত্নকরের হাতে-ধরা কাঠিতে ধরা পড়ে এই সূক্ষ্ম হেরফের। যাত্নকরের হাতের কনুইয়ের কাছে ছোট ছোট ত্ন-টি চুম্বক খণ্ড আটকে দিয়ে পরীক্ষা

করে রোকা নাকি দেখেছিলেন যে যাদুকরের সন্ধান ক্ষমতা লোপ পায়। এ থেকে তিনি হাজির করেছিলেন তার মত।

এ-বিষয়ে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা পড়েছিলাম 'নেচার' পত্রিকায় (**R. A. Foulkes : 'Dowsing Experiments',** ***Nature 229*****, pp 163-168, 1971**)।

ব্রিটেনের মিলিটারি এনজিনিয়ারিং এক্সপেরিমেন্টাল এসটাবলিশমেন্ট (**MEXE**) ও রয়্যাল স্কুল অব মিলিটারি এনজিনিয়ারিং (**RSME**) থেকে আয়োজন করা হয়েছিল পরীক্ষাগুলির। উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। ডাউজিং-এর যাদুকররা যদি মাটির নিচেকার জিনিসপত্রের হদিশ সত্যিই দিতে পারে তবে তাদের সাহায্যে মাটির তলায় পোঁতা মাইন (যুদ্ধে ব্যবহার হয়) ইত্যাদির খোঁজ পাওয়া যাবে। সুতরাং পরখ করে দেখা যাক তাদের ক্ষমতা। জড়ো করা হলো বিশেষজ্ঞ যাদুকরদের। মাটির নিচেকার জিনিসপত্র সন্ধানের ব্যাপারে এইসব যাদুকরদের একটা অবিশ্বাস্য দাবি রয়েছে। ব্যাপারটা এইরকম : মনে করা যাক কোথাও মাটির নিচে একটা মাইন পোঁতা আছে। এখন, যাদুকরকে যদি ঐ মাইনটির মতো আরেকটা মাইন দেওয়া যায়, আর ঐ জায়গার একটা ম্যাপ দেওয়া যায়, তবে যাদুকর নাকি ঘরে বসেই শুধু ঐ ম্যাপের ওপর ডাউজিং করে বলে দেবে কোথায় পোঁতা আছে মাইন। শুনতে যতই গাঁজাখুরি বলে মনে হোক, অনেক 'বিশেষজ্ঞ' যাদুকরই জোরের সঙ্গে এই দাবি করেন। **MEXE** থেকে এই দাবির সত্যতাও পরখ করা হয়েছিল। পাঁচজন যাদুকর রাজি হলেন ম্যাপের ওপর ডাউজিং করতে। একটা নির্দিষ্ট এলাকায় মাটির তলায় পোঁতা হলো কয়েকটি মাইন। এলাকাটির ম্যাপ যাদুকরদের প্রত্যেককে দিয়ে বলা হলো ক-টি মাইন আছে আর কোথায় কোথায় পোঁতা আছে জানাতে। এর পাশাপাশি কয়েকজন সাধারণ লোককে (অর্থাৎ যারা যাদুকর নয়) বলা হলো শুধুমাত্র আন্দাজের ওপর ভিত্তি করে ম্যাপের ওপর তাদের ধারণা অনুযায়ী মাইনগুলির অবস্থান চিহ্নিত করতে। সম্ভাব্যতা তত্ত্বের সূত্র অনুসারে বিশ্লেষণ করা হলো দুই দলের প্রত্যেকের 'সিদ্ধান্ত'কে। দেখা গেল, যাদুকরদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরগুলি শুধুমাত্র আন্দাজে বলা কথার চাইতে বিন্দুমাত্র বেশি সঠিক নয়।

এরপর ম্যাপ বাদ দিয়ে আসল জায়গায় গিয়ে ডাউজিং করতে বলা হলো যাদুকরদের। ২২ জন সন্ধানী এবার অংশ নিলেন পরীক্ষায়। একটা নির্দিষ্ট এলাকা বেছে নিয়ে ২০ফুট × ২০ ফুট মাপের ৪০০টি প্লটে ভাগ করা হলো এলাকা-টিকে। ৮০টি প্লটে মাটির নিচে পোঁতা হলো ধাতব মাইন, ৮০টিতে প্লাস্টিক মাইন,

৮০টিতে ঐ মাইনগুলির মতোই আকৃতি বিশিষ্ট কাঠের ব্লক, ৮০টিতে কংক্রিটের ব্লক, আর ৮০টি প্লট রাখা হলো খালি। কোথায় কি পোঁতা হলো জানলেন না সন্ধানীরা। কাঠের আর কংক্রিটের ব্লকের কথা আদৌ জানানো হলো না তাদের। এবার প্রত্যেককে বলা হল ডাউজিং করে বলতে, কোন্ প্লটের তলায় ধাতব মাইন আছে, কোথায় আছে প্লাষ্টিক মাইন, আর কোন্‌টায় কিছুই নেই। কাঠের আর কংক্রিটের ব্লক রাখার উদ্দেশ্য—যে জিনিসটি খুঁজছেন সন্ধানী, তার মতো একই আকৃতির অন্য কোন জিনিস থেকে সেটার পার্থক্য করতে তিনি পারছেন কিনা দেখা।

সম্ভাব্যতা তত্ত্ব (Probability Theory) অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হলো সকলের উত্তর। এবারও ফল পাওয়া গেল আগের মতোই। অর্থাৎ যাদুকরদের বিশেষ কোন ক্ষমতার অস্তিত্ব নেই।

রোকা-র মত যাচাই করার জন্য পরীক্ষা করা হলো—ছোট্ট তড়িৎ-চুম্বকের সাহায্যে উৎপন্ন অতি ক্ষীণ চৌম্বক-ক্ষেত্রের উপস্থিতি বুঝতে পারেন কিনা ডাউজিং-এর বিশেষজ্ঞরা। চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি ছিল ৬·৭ মিলিগাউস (রোকা-র মতে, ৩ থেকে ১০ মিলিগাউস পরিমাণ হেরফের ধরা পড়ে যাদুকরদের হাতে)। পরীক্ষার ফল—'নেগেটিভ'। অর্থাৎ রোকা-র মত সমর্থিত হলো না।

জল সন্ধানের ক্ষমতা পরখ করা হয়েছিল RSME-তে কয়েকটি পরীক্ষা দিয়ে। এগুলির মধ্যে একটি পরীক্ষায় মাটির নিচে পলিথিনের পাইপে জল পাঠিয়ে কলের সাহায্যে জলের প্রবাহ একবার খোলা আর একবার বন্ধ করা হচ্ছিল। জল-সন্ধানীকে বলা হয়েছিল তাঁর যাদুদণ্ডের সাহায্য নিয়ে বলতে কখন জলের প্রবাহ খোলা, আর কখন বন্ধ। এইটির, এবং এই ধরনের অন্য পরীক্ষাগুলির ফলাফল সেই একই, 'নেগেটিভ'। সুতরাং এবারেও যাদুকরের ক্ষমতা প্রমাণিত হলো না। তাহলে কি আমরা ধরে নিতে পারি জলসন্ধানী যাদুকরদের ক্ষমতার ব্যাপারটা অলীক ? MEXE ও RSME-র পরীক্ষার ফলাফলই শেষ কথা—এটা অবশ্য ধরে নেওয়ার কারণ নেই (দৃষ্টান্তস্বরূপ : *Nature 233* 1971, পৃ. ৫০১ ও ৫০২-এ দু-টি মন্তব্য)। তবে, এতগুলি রটনা, ধারণা আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা জানবার পর এই জল-সন্ধানী যাদুকরদের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাসের চাইতে আপাতত অবিশ্বাসের পাল্লাই ভারি হয়ে যাচ্ছে।

অভিজিৎ লাহিড়ী

জলসন্ধানী যাদুকর প্রসঙ্গে

মাটির নিচে groundwater বা ভূজলের অবস্থিতি সম্বন্ধে মানুষ অবহিত আছে প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল থেকেই। বিভিন্ন প্রাচীন কাব্যে গাথায় বা কাহিনীতে ইঁদারা বা কূপের উল্লেখ আছে। মহাভারতে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের বাণ-বিদ্ধ ভূমি থেকে উৎসারিত জল দিয়ে তৃষ্ণা মেটানোর মধ্যে ভূজল আহরণের প্রতীক রয়েছে। খ্রীস্টজন্মের বহু আগেই উত্তর আফ্রিকায় আর্টেজীয় কূপের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এছাড়া পারস্য দেশে 'কানাত' (Kanaat) অর্থাৎ ভূগর্ভে কূপের তলদেশ সমান্তরাল গ্যালারীর দ্বারা বর্দ্ধিত জল আহরণের উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা জানা গেছে।

বিভিন্ন দেশে নানা জনপদে ঘনবসতির বিস্তারের সঙ্গে ভূজল আহরণের মাত্রা বৃদ্ধির একটা গাণিতিক বা আনুপাতিক সম্পর্ক আছে। আবহগত কারণে দৃশ্য বা দৃষ্ট জলধারা বা জলাধারে জলের অভাব হলেই ভূজলের দিকে নজর যায়। এই জল প্রধানত কৃষিকাজ ও পানীয় জলের জন্য প্রয়োজন। এই শতাব্দীতে এর ব্যবহার শিল্পেও হচ্ছে। কিন্তু ভূজল আহরণের সঙ্গে ভূজল অনুসন্ধানের একটা মূল প্রশ্ন জড়িত আছে। মাটির ওপর দাঁড়িয়ে যত্রতত্র নিজের সুবিধা বা চাহিদা অনুযায়ী ভূজল পাওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন জলবাহী স্তরে, বিভিন্ন গভীরতায় ভূজলের সংস্থান কয়েকটি ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক বিধিনিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়। সঙ্গত কারণেই এইসব নিয়মতত্ত্বগুলি সম্পূর্ণ অনুধাবন করা বা আয়ত্ত করা মানুষের পক্ষে এখনও সম্ভব নয়। বিশেষ করে ভূগর্ভে নানা পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়াকাণ্ডে অনেক অনির্দিষ্ট পরিবর্তনশীল ব্যাপার-স্যাপার—যাকে ইংরাজীতে বলা হয় unknown variables—রয়ে গেছে। এই অনির্দেশ্যতার আহ্বানকে মোকাবিলা করার জন্যই এই শতকে এক নতুন ফলিতশাস্ত্রের জন্ম ও লালন হয়েছে, যাকে বলা হয় Geophysics বা ভূপদার্থবিদ্যা। প্রধানত Petroleum বা খনিজ তেল অনুসন্ধানে এর চমকপ্রদ অগ্রগতি হয়েছে। এই সঙ্গে ভূজল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এর বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগে ইদানীং প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

ভূজল অনুসন্ধান সম্বন্ধে এই সংকলন গ্রন্থে দুটি প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ বা আলোচনা

ঠিক এর আগেই করা হয়েছে। তারমধ্যে শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি পূর্ব-প্রকাশিত রচনাকে পুনরুদ্ধৃত করা হয়েছে এবং পরের রচনায় অভিজিৎ লাহিড়ী, অধ্যাপক বসুর মূল বক্তব্যগুলিকে সম্পূর্ণ না হলেও মোটামুটি খণ্ডন করেছেন ও জল যাদুকরের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহের ছায়াপাত করেছেন। সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষ জুড়ে খরার দুর্দশার সুযোগে বহু অঞ্চলে বৃষ্টিস্রষ্টা, জলসন্ধানী অপবিজ্ঞানী এবং যজ্ঞযোগীর আবির্ভাব ঘটেছে ও ঘটছে। সমাজের সাধারণ বোধি, বুদ্ধি ও স্বার্থের জন্য এইসব অপচেষ্টার প্রতিরোধে ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনার প্রয়োজন।

অধ্যাপক বসুর রচনায় ইয়োটভোস (Yotvos) ও রোকা-র (Rocard) পরীক্ষা-নিরীক্ষার উল্লেখ আছে এবং এই সূত্রেই তিনি জল সন্ধানে একটা বৈজ্ঞানিকা ধারা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন—যা কুসংস্কারের বিরুদ্ধগামী। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে জলসন্ধানী যাদুকরের ক্রিয়াকাণ্ড বা ক্ষমতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হলেও উনি কিছু বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছেন এবং সঙ্গতভাবেই নিজের প্রতীতি বা প্রত্যয় অনুযায়ী কুসংস্কার বা অপবিজ্ঞানকে এড়াতে চেয়েছেন। অধ্যাপক বসুর রচনার সময়কাল জানি না। তবে Yotvos, Rocard ও অন্যান্যদের নানা গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে ভূপদার্থ বিদ্যা অর্থাৎ Geophysics-এর নানা শাখা (বিশেষ করে Gravity, Geoelectric ও Geomagnetic Survey) চল্লিশের দশক থেকেই প্রসার লাভ করেছে এবং তেল অনুসন্ধান, খনিজ অনুসন্ধান ও ভূজল সমীক্ষার কাজে লাগানো হয়েছে। ভারতবর্ষেও হয়েছে পঞ্চাশের দশক থেকেই। আধুনিককালে এই শাস্ত্রের বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে। এই ফলিত শাস্ত্রের দ্রুত প্রসার ও অগ্রগতি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী অধ্যাপক বসু শেষ জীবনে হয়তো সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন না। সেকারণেই অভিজিৎ লাহিড়ীর নিবন্ধে জল-যাদুকর সম্বন্ধে সন্দেহের ছায়াপাত অনেক তথ্যাশ্রয়ী ও বিজ্ঞান অনুসারী। অবশ্য উনিও শেষ বক্তব্য রাখার সময় পূর্ণ প্রত্যয়ের সিদ্ধান্ত না দিয়ে বলেছেন, 'MEXE ও RSME-র পরীক্ষার ফলাফলই শেষ কথা—এটা অবশ্য ধরে নেওয়ার কারণ নেই।' আর পরোক্ষে বলেছেন, 'জলসন্ধানী যাদুকরদের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাসের চাইতে আপাতত অবিশ্বাসের পাল্লাই ভারি হয়ে যাচ্ছে।'

কিন্তু এই শতকের এই দশকে ভূজল অনুসন্ধান ও আহরণ সম্বন্ধে কয়েকটি উপলব্ধ বৈজ্ঞানিক সূত্র সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। তাহলেই জলসন্ধানী যাদুকর, অপবিজ্ঞানী বা miracleman-দের সম্বন্ধে আমাদের

সামাজিক প্রত্যয় বা প্রতিক্রিয়া সুনির্দিষ্ট হবে। আগের রচনা দু-টিতে ভূতাত্ত্বিক সূত্রগুলির সম্যক অনুধাবন বা উল্লেখ নেই। জলসন্ধানী যাদুকর (water divining বা dowsing water witching, কথাটি সহজ প্রচলিত নয়) সরল পন্থায় বিশেষ ক্ষমতাবলে Y-দণ্ড দিয়ে ভূজল ভাণ্ডারের স্থান নির্ণয় করেন। মূল প্রত্যয় হচ্ছে মাটির নিচে ভূজলধারার গতি-প্রকৃতি, ভূপৃষ্ঠের নদীনালার মতোই—উপলবন্ধুর উচ্ছলিত পথ বেয়ে (আমাদের কল্পনায় ভোগবতী বা পাগল নদী)। কিন্তু এই ধারণাই ভুল। মাটির নিচে ভূজলের সঞ্চয় ও প্রবাহ অত্যন্ত ধীরে ও ভিন্ন পদ্ধতিতে ঘটে থাকে। এই জল মৃত্তিকা নুড়ি বা বালিকণার মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে বিশেষ স্তরে জমে যায় এবং ক্ষীণ ঢাল বেয়ে খুব ধীরে জলবাহী স্তরের মধ্যে একজায়গা থেকে অন্যত্র সঞ্চারিত হয়। এই জন্যই ভূজলের সঞ্চয়ে আবহগত প্রভাব দ্রুত পড়তে পারে না এবং এর সঞ্চয়ও ভূতাত্ত্বিক কালের মানদণ্ডে ভূপৃষ্ঠের জলসঞ্চয়ের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু তবু ভূজল আহরণে যাদুকরের ডাক পড়ে কেন এবং অন্তত কিছু ক্ষেত্রে এদের আপাত সাফল্যের ভিত্তি কি?

এর উত্তরে দু-টি মূল কথা বলা যায়। আগেই বলেছি ভূগর্ভে নানা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অনেক unknown variables আছে, যার সম্যক নীতি অনুধাবনে আরও সময় লাগবে। তবে ভূজলের সংস্থানে কয়েকটি সাধারণ ভূতাত্ত্বিক সূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার থেকে বহুলাংশে নিশ্চয়তা মিলবে। এ সত্ত্বেও যাদুকরের ডাক পড়ে আমাদের এই জ্যোতিষ ও তন্ত্র-নির্ভর রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সামাজিক অজ্ঞতার জন্য। দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপাত সাফল্যের চাবিকাঠিও ভূতাত্ত্বিক সূত্রেই নিহিত। অনেকেই আদিগন্ত শুষ্ক মরুভূমির মধ্যেও মরুদ্যান (Oasis) -এর কথা জানেন। বিশেষ ভূপ্রাকৃতিক গঠনের সুবাদে Geomorphic slope এবং বিশেষ পাথর বা পলির জলবাহী ক্ষমতার সঙ্গে মণিকাঞ্চন যোগ হয় বিভিন্ন বছর বা ঋতুতে বৃষ্টিপাতের এক অংশের—যা ভূজল রূপে আবহমানকাল সঞ্চিত হয় এবং পরে ঊর্ধ্বগামী কৈশিক চাপে (Capillary rise) মাটির কাছাকাছি আসে ও অগভীর জলের রসাশ্রয়ী উদ্ভিদ (Phreatophytes) ও লতাগুল্মের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে। এভাবেই মরুদ্যানের সৃষ্টি। যদি মরুভূমিতেই এটা সম্ভব হয় তবে বৃষ্টিধন্য অন্য এলাকায় নানা ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে ভূজল আহরণের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এই আহরণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক জমির ঢাল বিশ্লেষণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিভিন্ন ঢালের সংযোগ ক্ষেত্রেই জলসঞ্চয়ের সম্ভাবনা বেশি। এরপর আসে মাটির ওপরে বা নানা খানা-খন্দে নদী-নালার পাড় বরাবর পলি বা পাথরের গুণাগুণ ও জলবহন ক্ষমতার নিরীখ স্থির করা এবং

Phreatophytes-এর অবস্থান, নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে বা বিশেষ দিকে এদের প্রসার ও বিস্তার নিরূপণ করা। এটা যেমন ভূবিজ্ঞানীরা এখন করতে পারেন, তেমন নিশ্চয়ই বহু বৎসরের অনুসন্ধিৎসু ও অভিজ্ঞ সাধারণ মানুষও পারবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অফ্রিকায় আর্টেজীয় কূপ বা পারস্যের কানাত সাধারণ মানুষই আবিষ্কার করেছিল, কোনো সংগঠিত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা নয়। যাই হোক আমার ধারণা, এই জলসন্ধানী যাদুকর বা diviner-রা বস্তুতপক্ষে অত্যন্ত প্রখর পর্যবেক্ষণশক্তিসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ অপরিশীলিত ভূবিজ্ঞানী, যারা ভূজল সংস্থানের মূল সূত্র কয়েকটি আয়ত্ত করেছেন—বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা না জেনেই। Y-দণ্ডটা শুধু আপাত-অলৌকিক প্রচেষ্টার একটা চতুর চমক।

রাজস্থান গুজরাটের অবশুষ্ক ও মরু অঞ্চলে ভূজল অনুসন্ধানে পানিওয়ালা মহারাজ নামধেয় এক ব্যক্তির কিছু সাফল্য সম্বন্ধে দু-তিন দশক আগে নানা কাহিনী শোনা গেছে। যার উল্লেখ অধ্যাপক বসুর রচনায় আছে। উনিও কাঠের Y-দণ্ড দিয়ে জল-অন্বেষণ করতেন বলে শোনা গেছে। এছাড়া রাজস্থানে 'ভোপা' নামে এক সম্প্রদায়ের কথা শোনা যায়, যারা বংশানুক্রমে এই ভূজল অনুসন্ধানের ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু কার্যত এদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করে মোটামুটি দেখা গেছে, ওরা কূপের স্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে ওপরে উল্লিখিত ভূবিজ্ঞানের সূত্রগুলি বেশ অভিজ্ঞতা ও নিশ্চয়তার সঙ্গে ব্যবহার করেন, যদিও অত্যন্ত স্থূল প্রচেষ্টার দ্বারা। বহু ক্ষেত্রেই এরা সফল হন, এবং এদের এই সাফল্য অলৌকিক নয়।

পরিশেষে বলি, অধ্যাপক বসু যে-সব পথিকৃৎ বিজ্ঞানীদের কথা দিয়ে জল সন্ধানের ব্যাপারটা উপস্থাপিত করেছেন—তাদের তত্ত্বের ওপরই আজকের ভূপদার্থবিদ্যা বা Geophysics বিবর্তিত এবং জল অনুসন্ধানের কাজেও ব্যবহৃত। শ্রীলাহিড়ীও এই বিজ্ঞান নির্ভর, কিছু তথ্য পরিবেশন করে যাদুকর সম্বন্ধে মোহ অপসারিত করতে চেয়েছেন। আমি বলতে চাইছি যে, এই জল সন্ধানের ব্যাপারে কোনো অলৌকিক যাদুদণ্ডের কোনো ভূমিকা নেই, থাকা সম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টে সম্ভব মনে হলেও, গভীরতর বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক সূত্র ও ব্যাখ্যা ধরা পড়তে বাধ্য।

সুরজিৎ কুমার গুহ

অগাস্ট ১৯৮৩

ঝড়-টর্নেডো-গাইঘাটা

চব্বিশ পরগণার গাইঘাটায় গত ১২ এপ্রিল '৮৩-র সন্ধ্যেবেলা যে ক্ষণস্থায়ী প্রলয়ঙ্কর ঝড় হয়েছিল তার প্রকৃতিটা বোধহয় এতদিনে আর কারুর অজানা নেই। ঝড়ের এই বিশেষ রূপটির নাম টর্নেডো (Tornado)—স্প্যানিশ শব্দ tronada থেকে এর উৎপত্তি। শব্দটির অর্থ বজ্রঝটিকা (thunderstorm)। এই বজ্রঝটিকা কুড়িটি গ্রামের ঘরবাড়ি তছনছ করেছে, ২৩ জনের মৃত্যু ঘটিয়েছে, ১৯৭ জনকে গুরুতরভাবে আহত করেছে, চারটি রিভার লিফট পাম্প খুবলে তুলে নিয়েছে, পাট্টাবুকায় পঞ্চায়েতের পাকাবাড়ি, ইলেকট্রিক কোম্পানির পাকাবাড়ি ভেঙেছে,—কিন্তু কি আশ্চর্য কলাসীমার বাজারের কাছে যে কালীমন্দির আছে তার গায়ে আঁচড়টিও লাগে নি—মা-কালীর গলার মালাটিও না-কি দুলে ওঠে নি। ভক্তিতে মনটা জবজবে হয়ে উঠেছিল প্রায়! কিন্তু কালীমন্দিরে প্রণামী দিতে যাবার আগে টর্নেডোর রীতি-প্রকৃতি জানবার জন্য প্রত্যক্ষ বিবরণে ভরা বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকাগুলো একটু ঘেঁটে দেখতে উৎসুক হলাম। জানলাম অনেক কিছু। তার কিছু কিছু বলি।

যমদূতের মতো কালো মিশমিশে যে-মেঘ ঈশান কোণে এপ্রিল-মে মাসে (অর্থাৎ কালবৈশাখীর দিনে) উদয় হয়—টর্নেডোর উৎপত্তিস্থল ওগুলোই। প্রবলশক্তিসম্পন্ন এইসব মেঘের সঙ্গে স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন সঞ্চালনসঞ্জাত মেঘের একটু তফাৎ আছে। শেষেরটি হলো Cumulus (পুঞ্জমেঘ) আর প্রথমটি Cumulonimbus (বজ্রগর্ভ ঝটিকা মেঘ)। দুজনেই বৃষ্টি ঝরায়, কিন্তু শেষেরটি আবার শিলাবৃষ্টি, টর্নেডো এইসবের আকর। গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরভারত জুড়ে চলে আবহাওয়ার পালাবদল। শুকনো, ঠাণ্ডা, ভারি উত্তুরে বাতাসের সঙ্গে এইসময় দক্ষিণ থেকে আগত গরম, আর্দ্র, হাল্কা বাতাসের রোজই প্রায় দেখা হয় রৌদ্র-তপ্ত ছোটনাগপুর অঞ্চল বরাবর। যেন দুই বিপক্ষ সৈন্য-বাহিনী। জলীয় বাষ্পের গোলাবারুদ ভর্তি গরম-আর্দ্র বাতাসের পুরু স্তর (moist tongue—'ময়েস্ট টাং') ঠাণ্ডা বাতাসের পুরু স্তরের পিঠে চেপে ওপরে উঠে গিয়ে যে বিশাল বিশাল শ্রেণীবদ্ধ মেঘের সাঁজোয়াবাহিনী তৈরি করে

সেগুলোই 'ঈশানের বাধাবন্ধনহারা' ঝটিকা মেঘ,—টর্নেডোর জনক। এইসব সুবিশাল মেঘের মাথাগুলো কামারশালার নেহাই-এর মতো ছড়ানো। এদের ভেতরের জলীয় বাষ্পভরা বাতাস অত্যন্ত আবর্তসঙ্কুল। প্রবল ঘূর্ণিতে দুরন্ত। এদের তলাটা থাকে মাটি থেকে হাজার দুয়েক ফুট উঁচুতে আর মাথাটা থাকে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে (Stratosphere)—প্রায় চল্লিশ হাজার ফুট উঁচুতে। আপাতস্থির, পাহাড়ের মতো এই মেঘগুলো শুধু সামনেই ছুটছে না আবার ঘুরছেও কয়েক লক্ষ টন জলসম্ভার নিয়ে। সর্বসমেত এদের আভ্যন্তরীণ আলোড়ন এতই বেশি যে বিমান চালকেরা সভয়ে এদের এড়িয়ে চলেন। বাতাসের ওঠা-নামার স্রোতে পড়লে প্লেন দু-টুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এই ঝটিকা-মেঘের মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জল-বিন্দুগুলোর অবিরত ঘর্ষণের ফলে এগুলি হয়ে ওঠে বিশাল তড়িৎ-শক্তির আধার—অর্থাৎ বজ্রগর্ভ। মেঘের চূড়োর কাছে ছোট-ছোট জলকণাগুলো জমে গিয়ে হয় বরফকুচি। ছোট-ছোট বরফকণাগুলো হাওয়ার দাপটে একবার নামছে আবার উঠছে। ফলে ওগুলোর গায়ে পরতে-পরতে জমা হচ্ছে বরফের
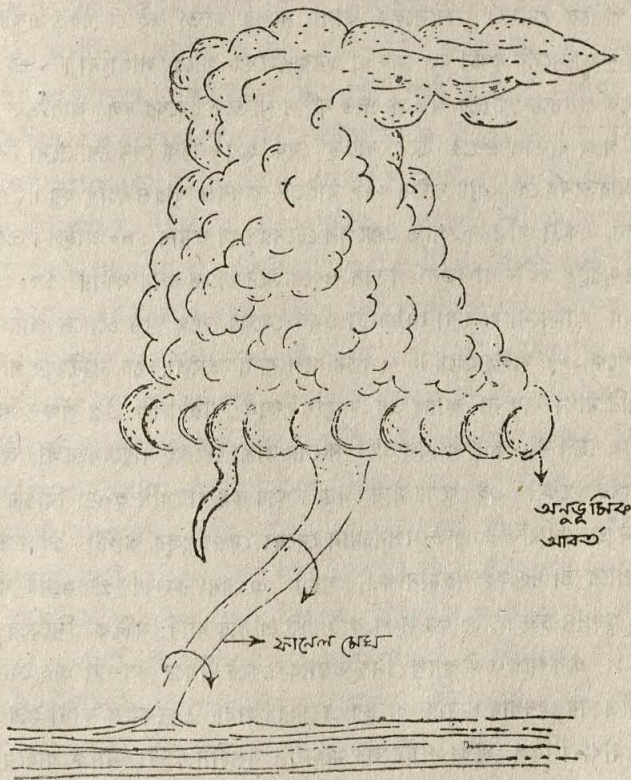
স্তর—পেঁয়াজের খোসার মতো। এগুলোই একসময় বাতাসে ভেসে থাকতে না পেরে সবেগে নেমে আসে নিচে। শুরু হয় শিলাবৃষ্টি। এই অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে হয়তো বোঝা যাবে না—ভাবতেও কষ্ট হবে যে, এই শক্তিধর মেঘগুলোর অন্তর্নিহিত ভাঙনের শক্তি হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু সেটাই সত্যি। এই ধরনের ঝটিকা মেঘের তলার দিকে কখনও কখনও অবস্থাবিশেষে আলোড়ন এত প্রচণ্ড হয়ে ওঠে যে অনুভূমিক একসারি পাকানো-পাকানো রিঙয়ের মতো আবর্ত বা ঘূর্ণি দেখা দেয়। এই শ্রেণীবদ্ধ অনুভূমিক vortex বা আবর্তগুলো থেকেই নেমে আসে একটা পাকানো দড়ি বা হাতির শুঁড়ের মতো প্রলম্বিত মেঘ। ওপরের ছবিটা দেখলে খানিকটা মালুম হতে পারে ব্যাপারটা। কখনো এই দ্রুত আবর্তিত মেঘের শুঁড়টি মাটি পর্যন্ত নেমে আসে, কখনো সেটা আকাশে ঝুলতে-ঝুলতে দুলতে-দুলতে চলে। কখনও একটা, কখনও অনেক। এই প্রলম্বিত মেঘের নাম ফানেল-মেঘ (Funnel cloud), টিউবা (Tuba) বা টুইস্টার (Twister)। এদের নামগুলোর মধ্যেই লম্বমান মেঘগুলোর কিছু পরিচয় মেলে। ফানেলের ফাঁপা নলের মতো এই মেঘেরও একটা নল আছে—ফানেলের মুখটা মূল মেঘ বা জনক-মেঘের গায়ে লাগানো। এই ফাঁপা নলটিকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে অত্যন্ত দ্রুত সর্পিল গতিতে মেঘের দল আবর্তিত হচ্ছে, আর্দ্র গরম বাতাস ওপরে উঠে যাচ্ছে মেঘ হয়ে—ঠিক যেন ঘোরানো সিঁড়ি। এই আবর্তনের বেগ প্রায় ঘণ্টায় ৩০০ মাইল—কখনও আরও বেশি হয়। (খেয়াল করবেন, একটা অতি-দ্রুতগতি এক্সপ্রেস ট্রেনের বেগ ঘণ্টায় ১৬০ মাইল। এইভাবে ঘুরতে-ঘুরতে জলীয় বাষ্পভরা বাতাস ওপরে উঠে যাচ্ছে প্রায় ঘণ্টায় ১৫০ মাইল বেগে। পাকানো দড়ি বা tuba-টা জনক-মেঘের সঙ্গে ছুটে চলেছে প্রায় ঘণ্টায় ৮০ থেকে ১০০ মাইল বেগে। এখানে বলে রাখা ভালো, যে টর্নেডোর গতিবেগ সরাসরি মাপা যায় না কারণ এর সামনে কোন পরিমাপক যন্ত্র অক্ষত অবস্থায় থাকতে পারে না, তাই পরোক্ষভাবে ধ্বংসের মাত্রা থেকেই বায়ুবেগগুলো আন্দাজ করা হয়ে থাকে। এই বেগের মান ক্ষেত্রবিশেষে কম বা বেশি হওয়া বিচিত্র নয়। এ-হেন দ্রুত-আবর্তিত দ্রুত-অগ্রসরমান মেঘের দেওয়ালের ঝাপ্টা যে কতখানি হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ যেন কৃষ্ণবর্ণ প্রভঞ্জনের করধৃত একটি সুদর্শন চক্র। যে বস্তু লক্ষ্য করে এটি এগিয়ে যাবে সেটিকে নিমেষে খতম করবে। একেবারে এককোপে নিখুঁতভাবে কেটে নিয়ে যাওয়া এর বৈশিষ্ট্য। পত্র-পত্রিকায় দেখলাম খামার বাড়ির মোষের মাথা এককোপে কাটা হয়েছে—কারণ মাথাটা ছিল মেঘের পাঁচিলের মধ্যে। মুণ্ডহীন ধড়টা নাকি বাইরে পড়ে

আছে অবিকৃত—কারণ ওটা ঝড়ের দেওয়ালের বাইরে ছিল। পাতলা কাঠকে মোটা গাছের গুঁড়ির মধ্যে সবেগে বিঁধিয়ে দিয়েছে। এই ধরনের অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা গাইঘাটার ঝড়েও ঘটেছে বলে প্রচারিত হয়েছে—উঁচুগাছের ডালগুলো এখানেও নাকি এককোপে কাটা হয়েছে—টর্নেডোর চলন-পথের গাছগুলো নিষ্পত্র হয়েছে। গল্প শুনলাম—একটা কুলো গিয়ে তালগাছে বিঁধেছিল দীঘাগ্রামে। দেখি নি। বাঁশঝাড় শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে বহুদূরে ফেলে দেওয়ার কথা বলেছে অনেকে।

একটা কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে একাধিক শুঁড় বা টিউবা নেমে আসতে পারে আগেই বলেছি। প্রত্যেকটাই এক-একটা ছোটখাটো সাইক্লোন। সাইক্লোনের যেমন কেন্দ্রস্থল বা 'Eye' শান্ত, নিম্নচাপযুক্ত—এখানেও তেমনি 'Cavity' বা নলটাতে বাতাস শান্ত, বায়ুচাপ অত্যন্ত কম—বাইরের চাপ থেকে প্রায় ৬০/৭০ মিলিবার (বাতাসের চাপ মাপার একক) কমে যায়। সামুদ্রিক ঝড় বা সাইক্লোন কয়েকশো মাইল জুড়ে বিস্তৃত থাকে তাই তার ক্ষয়ক্ষতিটা ছড়িয়ে পড়ে অনেকখানি জায়গা নিয়ে। টর্নেডোর বেলায় ধ্বংসলীলাটা সীমিত থাকে ঐ আবর্তিত হাতির শুঁড়ের মধ্যে—মাত্র কয়েক ফুট থেকে কয়েকশো গজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গাইঘাটার ওই ঝড়টির ক্ষেত্রে মনে হয়, ফানেল মেঘের নলটা ছিল প্রায় দুশো গজ চওড়া। সাইক্লোনের মতো বিস্তীর্ণ হয় না বটে কিন্তু এর ধ্বংস করার ক্ষমতা বড় মারাত্মক। উত্তর আমেরিকায় ওহিও-ইলিনয় অঞ্চলে ৩৭টা টিউবাসমন্বিত টর্নেডো ১৯৬৫ সালের ১১ এপ্রিল পিষে দলে দিয়েছিল একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে কয়েক মিনিটের মধ্যে। ১৯৩১ সালের একটি টর্নেডো মিনেসোটায় ৭৫ টন ভারি একটা রেলের কামরাকে ১১৭ জন যাত্রী সহ উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এমনই ক্ষমতা এই পাকানো শুঁড় বা টুইস্টারগুলোর।

বাতাসের যে-কোন ঘূর্ণিপাক, সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, চৈত্রের দুপুরের শুকনো-পাতা-উড়িয়ে নেওয়া ঘূর্ণিপাকই হোক আর সাইক্লোন-টর্নেডোই হোক—ঘুরতে থাকে একটা নিম্নচাপ অঞ্চলকে ঘিরে। ফানেল মেঘের নলটা নিম্নচাপযুক্ত, আগেই বলেছি। যদি কোন চারদিক বন্ধ বাড়ির ওপরে এই নিম্নচাপযুক্ত নলটি এসে পড়ে তবে ঘরের ভেতরের চাপ বাইরের চাপের চেয়ে বেশি হয়ে যাবার ফলে ঘরের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটবে—দেওয়ালগুলি ছিটকে পড়বে চতুর্দিকে—ছাদটি ঘূর্ণিনলের শোষণের টান বা suction effect-এর জন্যে ওপরে উঠে গিয়ে tuba-র সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে এগোবে। টিউবার নিচের দিকে আবর্তন-বেগ বেশি—ওপর দিকে কমে গিয়েছে। ফলে একসময় ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত ভারি বস্তুটি

আর ভেসে থাকতে না পেরে ছিটকে পড়বে। গাইঘাটার বিমল ব্যাপারীকেও টিউবার নল টুক্ করে তুলে নিয়েছিল। ব্যাপারী মশাই কাদার ওপরে এসে পড়েছিলেন তাই সর্বরক্ষা। পাট্টাবুকার পঞ্চায়েত বাড়ি, দীঘার দোতালা বাড়ি এইভাবেই ভেঙেছে টর্নেডো। উত্তর আমেরিকায় মিসিসিপি-টেক্সাস অঞ্চলে যেখানে বছরে গড়ে ১০০ টর্নেডোর উপদ্রব সহ্য করতে হয়, সেখানে বাড়ির তলায় বিশেষ আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয় এবং নিরাপত্তার অপর উপায় হিসেবে টর্নেডো যেদিক থেকে আসছে তার উল্টোদিকের জানলা দরজা খুলে রাখতে বলা হয় যাতে বাড়ির ভেতরে এবং বাইরে চাপের সমতা আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে শুধু উত্তর ভারতেই এই টর্নেডো দেখা যায় বছরে গড়ে ২/৩টে—দক্ষিণে টর্নেডোর অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয় না।

এই যে হাতির শুঁড় দুলতে-দুলতে আকাশপথে চলে এর একটা বৈজ্ঞানিক কারণ অবশ্যই আছে, বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা যায়—hydro-dynamical কারণ রয়েছে। চলনটা বোঝবার জন্য একটা উদাহরণ দিই। এক বিরাট চৌবাচ্চা বা জলাধার ভর্তি জল যখন মেঝের একটা নল বা প্লাগ-হোল দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যেতে চায় তখন বিভিন্নমুখী স্রোতোধারা গর্তের মুখটিতে একটা গভীর ঘূর্ণি বা আবর্তের সৃষ্টি করে—এটা হয়তো দেখে থাকবেন অনেকেই। এই গভীর আবর্তটির মাঝখানে থাকে ফানেল-মেঘের নলের মতোই একটা লম্বা শূন্যস্থান—এই শূন্যস্থানটি ধীরে ধীরে চৌবাচ্চার ওই ছিদ্র বা plug-hole-টিকে বেষ্টন করে দুলে-দুলে ঘোরে। জলের যে গতি প্রকৃতি বাতাসেরও তাই। তাই টর্নেডোর শুঁড় বা টিউবা দুলে-দুলে যাওয়াটা আজব কাণ্ড নয়। টিউবার এই দুল্‌কি চালের প্রত্যক্ষদর্শী এদেশেও আছে। ১৯৭৭ সালের ৭ এপ্রিল নদীয়ার ঘোলাপাড়া ও ফকিরডাঙ্গা এবং ঐ বছরের ১৫ এপ্রিল মেদিনীপুরের কণ্টাইতে যে দুটো টর্নেডো হয়েছিল সেগুলোর প্রত্যক্ষদর্শীরা বিবরণ দিয়েছিলেন যে, সন্ধ্যেবেলা কালো মেঘে ছাওয়া আকাশ দিয়ে একটা হাতি যেন শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে চলে গেল। শুঁড়টা কখনো পেণ্ডুলামের মতো অনেক উঁচুতে দুলছিল—কখনো লম্বা হয়ে মাটির দিকে নেমে এসে বাড়ি, গাছ গুঁড়িয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিল—কখনো আবার একেবারেই মেঘের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিল। কোথাও কোথাও দেখা গেছে টিউবাগুলো ভাঙ্‌চুর করেছে ব্যাঙ্‌ লাফানোর রীতিতে—অর্থাৎ খানিকটা জায়গায় ভাঙ্‌চুর করে ওপরে উঠে গেছে, আবার নেমে এসেছে খানিক পরে। এই খামখেয়ালিপনাই টর্নেডো ঝড়ের একটা বৈশিষ্ট্য। এ-নিয়ে বহু পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণজাত তথ্য নিয়ে গবেষণা চলছে

এখনো। এরকম খামখেয়ালিপনার কিছু উদাহরণ দিই তাহলে হয়তো বোঝা যাবে গাইঘাটার কালীবাড়িটি অক্ষত রয়েছে কেন।

১৯৬৬ সালের ৩ মার্চ মিসিসিপি আবহাওয়া অফিসের আধমাইল উত্তর দিয়ে দুটো টিউবা নামিয়ে দিয়ে একটি টর্নেডো চলে যায়—যেন দু-পা-ওয়ালা একটা দৈত্য। ৫৪ জন নিহত এবং ৪৯৭ জন আহত হয়েছিল, বহু বাড়ি-ঘর ভেঙে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে টর্নেডোটি তার একটা পা তুলে নিয়ে লাফিয়ে চলছিল। অর্থাৎ যেখানে যেখানে তার পদচিহ্ন পড়ে নি সেখানে কাক-পক্ষীও টের পায় নি আশপাশে কি ঘটে গেছে। ধ্বংসের চিহ্নমাত্র সে-সব জায়গায় ছিল না।

১৯৬৫ সালের ১৭ মে টেক্সাসে একটা ছোটখাট প্যাঁচালো মেঘ বা twister এক সাংবাদিকের মাথার ১০/১২ ফুট ওপরে ঝুলছিল। বলা বাহুল্য, সাংবাদিক ভদ্রলোক ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠেছিলেন। কিন্তু টিউবাটি তার কেশাগ্রও স্পর্শ না করে কিছু দূরের ৫০ ফুট উঁচু একটি এল্‌ম্ গাছ মুচড়ে ভেঙে নিয়ে চলে যায়। এল্‌ম্ গাছের পাশে একটু নিচু একটা ম্যাগনোলিয়া ফুলের গাছ ছিল—সেটি কিন্তু অক্ষত রইল। সাংবাদিকের বর্ণনায় জানা যায় যে, ঝড়ো টিউবাটি 'U' আকারের ছিল। অর্থাৎ ঝোলানো দিকটি মেঘের মধ্যে গোঁজা ছিল। ১৯১৩ সালের ৯ অক্টোবর উত্তর আমেরিকার ক্যানসাসে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। এক গোয়ালিনী গরু দুইছিল। হঠাৎ টর্নেডোর ঝড়ে তার গরু-টরু উড়ে বেরিয়ে গেল। হতবাক্ গোপাঙ্গনা দুধের বালতি নিয়ে নিচু টুলে বসে গরুর উড়ে যাওয়া দেখলো। তার কিছু হয় নি। বুঝুন কাণ্ড! গরু আর মেয়েটির মধ্যে কতটুকু আর তফাৎ ছিল? কত সীমিত জায়গার মধ্যে টর্নেডো তার খেল্ দেখায়।

এই ঝড়েই ঘরে ফেরা এক কৃষকের ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া দুটো উড়ে গেল—কৃষক হতভম্ব হয়ে ভাঙা গাড়িতে বসে রইল অন্ধকার মাঠে। ঘূর্ণ্যমান মেঘের পাঁচিলটাই টর্নেডোর টিউবার সক্রিয় অংশ—ভাঙ্‌চুরের দণ্ড। এ সবই সত্য ঘটনা।

এখন ফিরে আসা যাক কলাসীমার পাট্টাবুকা গ্রামে। পঞ্চায়েত অফিসের ছাদ উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছে ১০০-১২৫ ফুট দূরে পথের ওপরে। বাড়িটার গায়ে হাত চারেক উঁচু একটি গাছের ডালপালাগুলি নিষ্পত্র হয়েছে। দাওয়া সমান উঁচু যে গাছটি আছে সেটি অক্ষত। পঞ্চায়েত আর ইলেকট্রিসিটি অফিস, দুটো বাড়িরই জানলা-দরজা-সিঁড়ি এবং মাঝের দেওয়াল খাড়া আছে। টর্নেডোর

শুঁড় বা টিউবাটি তাহলে মাটি পর্যন্ত নামে নি—নামলে বাড়ি দুটোকে খুব্‌লে উঠিয়ে নিয়ে যেত, জানলা-দরজা কিছু আর খাড়া থাকতো না। এই গ্রামে বেশি চোটটা গেছে এই দুটো বাড়ির ওপর দিয়েই। কলাসীমা বাজারের উল্টোদিকে যশোর রোডের ধারে একটি বাড়ির উঠোনময় ছড়ানো দোমড়ানো-মোচড়ানো টিন দেখলাম। শোনা গেল—ঝড়ে এগুলো উড়ে গিয়ে বহুদূরে ধান-ক্ষেতে পড়েছিল—কুড়িয়ে আনা হয়েছে। বাড়িটার চালের কাঠের কাঠামোটি ঠিক আছে ; অথচ ভাঙে নি কোন দরজা, জানলা, বারান্দার নিচু থাম। বাড়ির পাশের কলাগাছগুলো খাড়া দাঁড়িয়ে। বুঝুন! ঝোড়ো বাতাসে কলাগাছের তো আগে শুয়ে পড়ার কথা। বেশ তো পাতা দোলাচ্ছে—পাতাগুলো একটু চেরা। অর্থাৎ ঝড়ের দাপট এখানে ছিল কম—হয়তো টিউবাটা অনেক ওপরে ছিল। যাই হোক, হাত বিশেক দূরে বাড়ির ইঁটের তৈরি নিচু বাথরুম ঘরটিও অক্ষত। টর্নেডো এটাকেও রেহাই দিয়েছে। কালিবাড়ির কাছে একটা টিনের চালের বাড়ির টিনগুলো উড়ে গেছে। চালের কাঠামো ও নিম্নাংশ কিন্তু ঠিক আছে। মনে হয়, এসব জায়গায় ফানেল মেঘ বেশ ওপর দিয়ে গিয়েছে। বিশেষ ক্ষতি করে নি। এরই পাশে কালীবাড়ি। কালীবাড়িটি এইসব বাড়িগুলোর থেকে নিচু। পুজো হচ্ছিল, অতএব দরজা-জানালা খোলাই ছিল ধরতে হবে। আশপাশের ক্ষয়ক্ষতি দেখে মনে হয় এটা টিউবার চলনপথে পড়ে নি। বাইরে ছিল। অল্পের জন্য বেঁচেছে। এই ধরনের অল্পে বাঁচার একটা অদ্ভুত উদাহরণ দেখলাম ঐ গ্রামের একটা ছোট কারখানায়। কারখানার ইলেকট্রিক post-টা দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে আছে। মোচড়ানো পোস্ট আর টিনগুলোর কাছেই একটা সুপুরি ও একটা খেঁজুর গাছ কবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে! দু-হাত দূরে আরো একটা খেঁজুর গাছ আর নরম-সরম একটা পেঁপে গাছের কিচ্ছু হয় নি।

সুতরাং নিচু বাথরুম, কলাগাছ, পেঁপে গাছ এরা যদি বেঁচে যেতে পারে তবে নিচু কালীমন্দির যে স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে রক্ষা পাবে সেটা খুব কি আশ্চর্যের? দেবী-মাহাত্ম্য নয়—টর্নেডোর খামখেয়ালিপনাই কালীমন্দিরটিকে বাঁচিয়েছে।

পরিশেষে বলি, গাইঘাটায় অনেকেই ঝড়ের আগে 'আগুনের গোলা' প্রত্যক্ষ করেছেন। এটি কোন্ দিকে দেখা গিয়েছিল, এর প্রকৃত গঠন কি ছিল, কি ধরনের ছিল এর উজ্জ্বলতা—এ-সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ অবশ্য বিশেষ একটা মেলে নি। তবে এটা যে মোটেই 'দৃষ্টিবিভ্রম' নয় তা টর্নেডো সম্বন্ধীয় বিবরণগুলো পড়ে বুঝতে পেরেছি। ১৯৭৭ সালে নদীয়ায় এবং ১৯৭৮ সালে দিল্লীতে যে টর্নেডো দেখা যায়—দু-টি ক্ষেত্রেই এধরনের 'আগুনের গোলা' দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

টর্নেডো সৃষ্টির কারণগুলোকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বাতাসের নিচের স্তর থেকে ওপরের স্তরে বাতাসের গতি হঠাৎ খুব বেড়ে যায় (কখনও কখনও শব্দের চেয়েও উচ্চগতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে)—আর মেঘের নিচ থেকেই একটা সীমিত জায়গার মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড আবর্ত। এই আবর্তের টানে মাটির ওপরের ধুলোবালি, জলকণা, কাঠকুটো প্রবলভাবে ঘুরতে ঘুরতে ফানেল-মেঘের শুঁড় বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, বাতাসের এই আকস্মিক গতিবৃদ্ধি ও আবর্ত সৃষ্টির ফলে ঘূর্ণায়মান ধূলিকণাগুলোর পারস্পরিক ঘর্ষণে ফানেল-মেঘের শুঁড়ে প্রচুর পরিমাণ ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে এত উচ্চবিভবসম্পন্ন হয় যে সাধারণভাবে দৃষ্ট বিদ্যুৎ-ঝলকের চেয়ে এদের একটু বিশেষ আকৃতি ও উজ্জ্বলতা পরিলক্ষিত হয়। এই উচ্চবিভবসম্পন্ন বিদ্যুৎ-গোলক (Ball Lightning) নিয়ে এখনও অনুসন্ধান ও গবেষণা চলছে।

ক্রমাগত বিদ্যুৎ ঝলকানির জন্য কখনও কখনও টর্নেডোর ফানেল মেঘের উপরদিকটা একটা ঘুরন্ত আগুনের স্তম্ভ বলে মনে হয়। ১৪.৪.৮৩ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণটি এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। অগ্নিগোলক না বলে এই বিবরণে বলা হয়েছে 'whirling column of fire'। ১৯৬৫ সালের ১১ এপ্রিল উত্তর আমেরিকার ওহিওতে এই ধরনের অগ্নিগোলক দেখা গিয়েছে এবং ঐ বছরেরই টেক্সাসে একটি টর্নেডোতে অগ্নিস্তম্ভও দেখা গিয়েছে। এই ধরনের বিদ্যুৎ গোলকের রঙ সবসময়েই যে আগুনের মতো হবে তা নয়—ঈষৎ নীলাভ, উজ্জ্বল হলুদ, ইট-রঙ বা পিঙ্ক রঙও দেখা গেছে। ১৯৫৫ সালের ২৫ মে উত্তর আমেরিকার ব্ল্যাকওয়েল টর্নেডোতে মৃদু-নীলাভ রংয়ের একটি গোল বল দেখা যায়।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায় যে, মরুভূমিতে যে-সব ধূলির ঘূর্ণাবর্ত দেখা গেছে তাতেও এই ধরনের বিদ্যুৎ গোলক দেখা গিয়েছে। বালুকণার পারস্পরিক ঘর্ষণে বা অন্যবস্তুর সঙ্গে বালির ঘর্ষণে এই স্থির-তড়িতের জন্ম। ১৯১২-১৩ খ্রীস্টাব্দে *Monthly Weather Review*-তে আবহাওয়া বিজ্ঞানী S. D. Flora এ-জাতীয় একটি মজার ঘটনা বিবৃত করেছেন। একপাল গরু এক ধূলিঝড়ের মধ্যে দিয়ে ফিরছিল—দেখা গেল প্রতিটি গরুর শিঙের ওপর ছোট-ছোট অগ্নি গোলক জ্বলছে। বলা বাহুল্য, অগ্নি-গোলকগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল বালুকণা আর শিঙের ঘর্ষণে সুতরাং গাইঘাটায় কোন কোন ব্যক্তির গা পুড়ে যাওয়া, অগ্নি-গোলক-দর্শন এ-নিয়ে আরও ব্যাপক অনুসন্ধান দরকার।

টর্নেডো মেঘের মধ্যে বাতাস চলছে জেটগতিতে—তাই প্রচণ্ড শব্দে এর আগমন ঘোষিত হয়। টর্নেডোর দোসর হিসেবে সর্বত্রই থাকে শিলাবৃষ্টি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই শিলাগুলোর আয়তন হয় বিরাট—যেমন ক্যানসাসে (উত্তর আমেরিকা) এই ধরনের এক টর্নেডোর শিলাবৃষ্টিতে ১৯ সে.মি. ব্যাসের শিলা পড়েছিল বিধ্বস্ত জনপদের ওপর।

যে-সব পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে টর্নেডো সম্বন্ধে তথ্যগুলো পাওয়া গেছে তার মধ্যে কয়েকটির নিচে উল্লেখ করছি :

১. *Monthly Weather Review* : Vol 40, 1912 ; Vol 41, 1913 ; Vol 83, 1955 ; Vol 85, 1957 ; Vol 90, 1962 ; Vol 87, 1959 ; Vol 93, 1965 ; Vol 94, 1966

২. *Weatherwise* : Vol 10, No 3, 1957 ; Vol 15, No 1, 1962 ; Vol 16, No 1, 1963 ; Vol 17, No 1, 1964 ; Vol 18, No 1 & 2, 1965 ; Vol 19, No 1, 1966

৩. *Bulletin of American Meteorological Society* : Vol 40, 1959

৪. *Quarterly Journal of Meteorological Society* : Vol 63, 1937

৫. *Meteorological Magazine* : 1973

৬. *The Nature of Violent Storms* : L. J. Battan

৭. *The Encyclopaedia of Atmospheric Sciences and Astrogeology*

৮. *Hurricanes, Storms and Tornadoes* : D. V. Nalivkin

পূরব রায়

জুন ১৯৮৩

গাইঘাটার ঝড়ে মন্দির ভাঙে নি কেন

সরেজমিন তদন্তের রিপোর্ট

'ডাঃ কোটনিশ স্মৃতিরক্ষা কমিটি', হরিণঘাটা শাখার পক্ষ থেকে দুজনের একটি টিম, গাইঘাটার দুর্গত এলাকায় গিয়েছিলাম। বহু-প্রচারিত অক্ষত কালীমন্দির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্যে।

সোজা যশোর রোড বরাবর গিয়ে নটগ্রাম। নটগ্রামের আরেক নাম কলাসীমা। কলাসীমা বাজার থেকে খোয়াভাঙা রাস্তা ধরে লোকজন এগোচ্ছে। তাদের পিছু পিছু মিনিট তিনেক হাঁটতে সেই কাঙ্খিত মন্দির এলো। দূর থেকেই মন্দিরের চারপাশের ধ্বংসকাণ্ড চোখে পড়ল। পঞ্চায়েত অফিসের ছাদ পড়েছে রাস্তায় ; ইলেকট্রিক অফিস ও টালিখোলার অফিসের ছাদ গিয়ে পড়েছে ৬০/৭০ ফুট দূরে একটি জলশূন্য পুকুরে। মন্দিরের ঠিক উল্টোদিকের (খোয়াভাঙা রাস্তার অপর পাশের) টালির ঘরের টালি সব তছনছ। মোটকথা মন্দিরের চারপাশেই ঝড়ের তাণ্ডবের চিহ্ন আছে কিন্তু মন্দির সত্যিই অক্ষত।

মন্দিরের গড়ন বেশ মজবুত—চোখে দেখে মনে হলো। জানলাম, স্থাপিত হয়েছে ১৩৮৯ সনের ১২ বৈশাখ, অর্থাৎ এই '৮৩-তে বয়স মাত্র বছর খানেক।··· রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিনিট দশেক ধরে এসব দেখছিলাম, এর মধ্যে প্রতি মিনিটে গড়ে কমপক্ষে একবার করে কানে আসছিল পথচারীদের মন্তব্য—'এই অটুট মন্দির প্রমাণ করে দিয়েছে ভগবান আছে কি নাই! অবিশ্বাসীদের আর বলার কি থাকতে পারে?' ইত্যাদি ইত্যাদি। নামাবলী গায়ে মন্দিরের পূজারী মানিক গঙ্গোপাধ্যায় রীতিমতো গর্ব এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন—'মা কালীর পুজো করছিলাম। ঝড় কোন্ দিক দিয়ে গিয়েছে টেরই পাই নি।'

এরপর ফেরার পালা। যশোর রোডের ওপরই মধুবাবুর চায়ের দোকান। ঢুকে বসলাম। ৬/৭ জন স্থানীয় লোক দোকানে বসা। একটু-আধটু আলাপের পর পাশে বসা প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী ৭০ বছর বয়সী ভুপেনবাবুকে বললাম, 'আচ্ছা, এই মন্দিরটা যে ঝড়ে ভাঙলো না, এ-বিষয়ে আপনার কি মত?' তিনি একটু ভেবে বললেন :

'দেখুন, আমাদের এই চায়ের দোকানের ঠিক উল্টোদিকে দেখুন। শাল গাছে বড় পেরেক দিয়ে সাঁটা ভাঙা সাইনবোর্ডটা দেখছেন তো। কাগজ-ছেঁড়ার মতো একটা দিক খুলে নিয়েছে ঝড়ে। মাটি থেকে কত উঁচুতে হবে ওটা ? ফুট ১৫ মতন। অথচ পাশে দেখুন, ওই সাইনবোর্ডের নিচে, ৭/৮ ফুট উচ্চতার চালাঘরের কোন ক্ষতি হয় নি। এমনকি মধুবাবুর এই চায়ের দোকানটার কিছু হয় নি। কাজেই বোঝা যাচ্ছে কোনো কোনো জায়গায় ঝড়টা প্রায় ১৪/১৫ ফুট ওপর দিয়ে এসেছে। মন্দিরটা এক কোঠা ঘরের মত ৯ থেকে ১০ ফুট উঁচু হবে। তাছাড়া ঝড়টা এসেছিল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে ; মন্দিরের একটা কোণাও ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী। তাই মনে হয়, মন্দিরের অবস্থান নিচু ও কোণাকুণি থাকার জন্য তার গায়ে বিধ্বংসী হাওয়া অল্পই লেগেছিল এবং যা লেগেছিল তা-ও কোণাতে লেগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। আশপাশের চালাঘর-গুলিরও তো কিছু হয় নি কম উচ্চতার জন্যই।...পাকা ঘরের মধ্যে থেকে যদি ভগবান নিজেকে রক্ষা করেন তো কেরামতি কিসের, তার থেকে বেশি কেরামতি আমাদের, যারা নড়বড়ে চালাঘরে থেকেও অক্ষত রয়ে গেছি।' থামলেন ভূপেনবাবু। আমরা পরিতৃপ্ত মন নিয়ে উঠে এলাম।

নিরঞ্জন বিশ্বাস

জুন ১৯৮৩

গাইঘাটায় টর্নেডো এবং অক্ষত কালীমন্দির

প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন

গ্রামের নাম কলাসীমা। গ্রাম বললেও পাকা বাড়ি পাকা রাস্তার আলিঙ্গনে শহরতলীর মতোই। ঘটনার পর থেকেই জনস্রোত, অগুনতি মানুষের ভিড়, অঞ্চলটাকে খ্যাতি এনে দিয়েছে।

ঘটনাটা '৮৩-র ১২ এপ্রিলের। দেড় মিনিটের (গ্রামবাসীদের কথা অনুযায়ী) ঝড়ের পর কিংবদন্তীর বিষয়বস্তু হয়ে গেল এক কালীমন্দির। গ্রামবাসীদের উপলব্ধিতে এ-ঝড়ের গতিপথ, এ-ঝড়ের নিশানা এক অদ্ভুত বিস্ময়। আশ্চর্যজনক সব ঘটনার কথা শুনলাম, দেখলাম—নিজের দৃষ্টি সম্পর্কে সংশয় জাগে যেন। যেমন দীঘাগ্রামে একটা টেপা কলের পুরো ওপরের অংশটি ঝড়ের চোটে লোপাট। চড়ুইগাছি গ্রামে একটা ভাঙ্গা কুলোর নিচের অংশ একটা বড় নারকেল গাছের কাণ্ডের মধ্যে ফুটো করে ঢুকে যায়। কলাসীমার রাস্তার ধারে একটা একতলা পাকা স্কুলবাড়ির ঢালাই করা তিন-চার ইঞ্চি পুরু ছাদ-এর পুরোটাই উড়ে গেছে। চারদিকে ভাঙাচোরা ঘর-বাড়ির মাঝে এক-দেড়তলা উচ্চতা নিয়ে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে, দর্পিত ভঙ্গিতে, অক্ষত কালীমন্দির।

প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে যেতে হয়। কি করে সম্ভব? ধীরে ধীরে যুক্তিবোধ আসে ঊষার আলো ফোটার মতো। দেবতার মাহাত্মে বিমোহিত যারা তাদের প্রধান বক্তব্য ছিল—স্কুলবাড়ির পুরো ছাদ যে ঝড় ওড়ায় সে ঝড়ের প্রকোপে মন্দিরের কিছু হলো না, এ দেবীর লীলা ছাড়া আর কি? আমরা সাবধানে পাল্টা প্রশ্ন রেখেছিলাম—কিন্তু ওই ঝড়েরই প্রকোপে পড়ে গাঁয়ের পুরনো কমজোরী দালান-বাড়ির কেবলমাত্র টালি উড়েছে, দেয়ালের কিছু হয় নি—সে কথা কেউ বলছে না কেন? শুধু মন্দিরেরই এত প্রচার কেন? উত্তর মেলে নি। আমরাও আর কথা বাড়াই নি নিরাপত্তার কথা ভেবে।

মন্দির থেকে একটা সরলরেখা টানলে রাস্তার অপর পারের দুটো বেড়ার দোকানের মধ্যে দিয়ে যায়। সে দুটো বেড়ার দোকানও আশ্চর্যজনকভাবে অক্ষত। ঝড়ের গতিপথের বিচ্যুতির কারণেই ঘটেছে মনে হয়, সে-কথা কেউ বলছে না।

ফেরার পথে গাঁয়ের এক যুক্তিবাদী মানুষকে সঙ্গী হিসেবে পেলাম। কথায় কথায় তাকে বললাম—যে-সব ঘরবাড়ি ঝড়ের দাপটে ভেঙেছে তার মধ্যে বহু বাড়িতেই তো দেখা গেছে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মূর্তি, ছবি ইত্যাদি ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, অক্ষত থাকে নি ; দেবতার মহিমার কথা প্রচার করতে গিয়ে এ-পরিণতির কোন্ ব্যাখ্যা দেওয়া হবে ? উনি আমার কথার সুরটি বুঝে হেসে বললেন—এসব আমাদের মজ্জাগত, এ-সংস্কার কাটবে কি কোনদিন ?

গৌতম আচার্য

জুন ১৯৮৩

বজ্রপাত, অন্ধের দৃষ্টি, বিজ্ঞান ব্যাখ্যা

[কয়েক বছর আগে কলকাতার প্রায় সবকটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এক চমকপ্রদ সংবাদ। উত্তর কলকাতার বরানগর অঞ্চলের প্রায় শতবর্ষীয় বৃদ্ধ উপেন্দ্রনাথ রাহা ছিলেন সে সংবাদের নায়ক। উপেনবাবু সম্পূর্ণ অন্ধ, দুটো চোখেই আলো হারিয়েছেন। অথচ সেই ১৯৮০ সালের ৭ জুন রাত্রে আচমকা এক বিকট বজ্রপাতের পর ফিরে এলো তার দৃষ্টি, নিজের চোখের আলোকেই তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ইংরাজী দৈনিক *The Statesman*-এ খবর ছাপলো ২১ জুন 'A Gift of God' (ভগবানের দান) শিরোনামে।

কিন্তু সত্যিই কি ব্যাপারটা অলৌকিক ? ব্যাখ্যার অতীত কোন অতিপ্রাকৃত বিস্ময় ? মাথা ঘামিয়েছেন তখন অনেকেই, অনেক চিকিৎসক, চক্ষু বিশেষজ্ঞ, জীববিজ্ঞানী। নানারকম ভাসা-ভাসা মতামত শোনা যাচ্ছিল। শেষ অবধি বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পর নির্দিষ্ট একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলেন ডাঃ জ্যোতির্ময় বসু, যিনি কলকাতার প্রসিদ্ধ গবেষণা ও সমীক্ষা কেন্দ্র ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউট-এর (ISI) সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। একটি পর্যবেক্ষক দল সহ ডাঃ বসু যে-অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন তারই ফলশ্রুতি এই রচনাটি। —স. ম.]

একদিন বজ্র 'বিদ্যুৎলতা'র রূপ-বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা পেয়েছিলাম। 'দেখা না দেখায় মেশা / হে বিদ্যুৎলতা / কাঁপাও ঝড়ের বুকে / এ কি চঞ্চলতা / গগনে সে ঘুরে ঘুরে / খোঁজে কাছে খোঁজে দূরে / সহসা কি হাসি হাস / নাহি কহ কথা।' কিন্তু বিদ্যুৎলতার কণ্ঠস্বর বা বজ্র নির্ঘোষ সম্বন্ধে তিনি আর কিছু বলেন নি। বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু কট্টর বস্তুগ্রাহ্য শ্রেণীবিভাগের পক্ষপাতী। বজ্র বা বাজের আকৃতি ও প্রকৃতি নানা ধরনের: ১. মেঘ থেকে মাটিতে নেমে আসা (লীডার) ও উঠে যাওয়া (রিটার্ণ স্ট্রোক); ২. বাতাসেই বা শূন্যেই শেষ হয়ে যাওয়া; ৩. মেঘের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি। এছাড়া একটি অদ্ভুত ধরনের বজ্র বা বাজ আছে যার নাম তীব্র-স্বর বা শিষ দেওয়া বাজ (**Whistler**)। বাজ সম্পর্কে এতগুলি কথা বলার প্রাসঙ্গিকতায় এবার আসা যাক।

আমাদের এই কাহিনীর ঘটনাস্থল বরানগর। এর নায়ক প্রায় শতায়ু অবসর-প্রাপ্ত পুলিশ অফিসার, উপেন্দ্রনাথ রাহা। স্ত্রী বর্তমান। বড়ছেলে অনিলবাবু ষাট অতিক্রম করেছেন। তিনি, তার ভাই ও বাড়ির অন্যান্যরা একান্নবর্তী বাঙ্গালী পরিবারের কাঠামো ধরে রেখেছেন। এদের বাড়িটি বরানগরে মহারাজ নন্দকুমার রোডে। উপেন্দ্রনাথ একতলার একটি ঘরে থাকেন। উপেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ একশো পনেরো বছরে, পিতামহ একশো বছরে ও পিতা একশো সাত বছর বয়সে মারা যান। 'বজ্রপাতে দৃষ্টি পাওয়া'র ঘটনা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালের ২৬ জুলাই যখন প্রথম আমরা ওর কাছে যাই, তখন দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই তিনি বিছানায় কাটাতেন। অসম্ভব রকমের ভালো শুনতেন; বাড়ির গাছ থেকে পেয়ারা পড়লে বা ঘরের বাইরে কেউ ফিস ফিস করে কথা বললেও তিনি শুনে ফেলতেন।

এই ঘটনার নানা দিক অনুসন্ধানের জন্য বেশ কয়েকদিন ওর কাছে আমাদের যেতে হয়, যথা ২৬ ও ৩১ জুলাই, ১৬ ও ২৩ অগাস্ট এবং ৪ অক্টোবর, ১৯৮০। উনি এই বয়সেও মাতৃভাষায় ও ইংরেজীতে খুব সুন্দরভাবে নিজের কথা বলতে পারতেন ও ওর সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এই অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হতো না। দেখা গেল ওর মাথায় ও ভ্রূতে চুল কমে এসেছে। মুখে কয়েকটি কালো জড়ুল ((**Freckles**)। ঘটনার দিনের আগের চার বছর তিনি চোখে একেবারেই দেখতে পেতেন না। চার বছর আগে বাঁ চোখে কিছুটা দেখতে পেতেন, বইও পড়তেন। এ চোখে তার ছানি পড়ার আগে গ্লকোমা হয় এবং বার তিনেক অপারেশন করা হয়, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে, ১৯৬২ সালে। অধ্যাপক নীহারকুমার মুন্সী এই অপারেশন করেন ও তিনি তখনই

তাকে ছ-মাসের মধ্যে ডান চোখের ছানি কাটিয়ে নিতে বলেন। জানি না কেন তিনি ঐ উপদেশ পালন করেন নি। ১৯৭৬ সালের প্রথমদিক থেকেই ওর দৃষ্টি একেবারে চলে যায়।
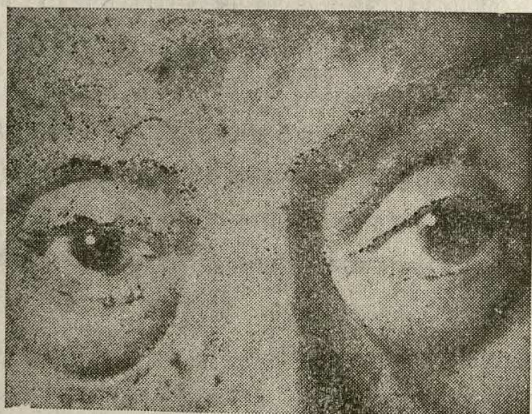
প্রথম দিনেই এই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে আমার অত্যন্ত সপ্রতিভ ও উৎসাহে ভরা বলে মনে হয়েছিল। বালিসে ঠেসান দিয়ে তিনি বিছানায় বসেছিলেন, ঐ অবস্থাতেই তাকে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। বার্ধক্যের জন্য ওর ছেলেরা ওকে বাড়ির বাইরে যেতে দিতেন না। সেজন্য অডিওগ্রাম ও ছবি তোলা (যা আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল) সবই ওর ঘরে আমাদের সম্পন্ন করতে হয়। [ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউটের (**ISI**) তদানীন্তন ডিরেকটার ডঃ বি পি অধিকারী; অডিওমেট্রিস্ট তপন ঘোষ, যিনি আমাদের অডিওগ্রাম করে দিয়েই হার্টের অসুখে মারা যান অগাস্ট ১৯৮০ তে; ফটোগ্রাফী ও রিপ্রোগ্রাফী ডিপার্টমেন্টের জন ভারগিজ, রঞ্জিত কুমার ঘোষ, লিংগুইস্টিকস, ডিপার্টমেন্টের শ্রীমতী অলকানন্দা মিত্র; আর্থ-সায়েন্স বিভাগের অজয় বসু; ডিনস অফিসের ছবিনাথ ঠাকুর ও মেডিক্যাল ওয়েলফেয়ার ইউনিটের রঞ্জিত সরকার ও সুভাষ মালাকার এবং ট্রান্সপোর্ট বিভাগের সারথিবৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমরা পেয়েছিলাম।

উপেনবাবুর বর্ণনা মতো, ৭ জুন ১৯৮০তে রাত্রি ৯টার সময় তিনি একটি অতি তীব্র ও কানের পীড়াদায়ক বাজের আওয়াজ শোনেন। বাজটির শব্দ

একটু দীর্ঘস্থায়ী এবং সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এসেছিল। এরপর তিনি প্রায় একঘন্টা ধরে মাথার মধ্যে গমগমে আওয়াজ ও যন্ত্রণা টের পান; তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

পরের দিন ৮ জুন সকালে উঠে তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তার মনে হলো তিনি বিছানার চাদরের, পাশের বাড়ির দেওয়ালের রঙ দেখছেন ও চিনতে পারছেন। এরপর তার স্ত্রী কাছে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার চুলগুলো কবে সাদা হয়ে গেল?' স্ত্রী তো অবাক। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ির অন্যান্য সকলকে ডাকলেন। তারাও অবাক। কেউ আঙ্গুল দেখালেন, কেউ পেনসিল, কেউ বা দেওয়ালের ছবি। পরীক্ষাতে উপেনবাবু সসম্মানে পাশ করলেন। এরপর স্থানীয় চক্ষু চিকিৎসক ডঃ এ কে সিংহ মহাশয় এসে উপেনবাবুকে দু-টি চশমা দিলেন—একটি দূরের আরেকটি কাছের জন্য। চশমা দু-টি হলো সেই ধরনের, যে-ধরনের চশমা ছানি কাটা রোগীরা ব্যবহার করেন (দূরেরটি +৯.০০ ডায়োপটার ও কাছেরটি +১২.০০ ডায়োপটার)।

লেখক পরীক্ষা করছেন উপেনবাবুকে

আমি যেদিন ওকে পরীক্ষা করলাম সেদিন দেখলাম ডান চোখে ওর অতি পাকা ছানিটি চোখের পিছনের কুঠরীতে খুলে পড়ে আছে এবং ডান চোখের তারাটিও ঐ বয়সের বাদামী রঙ-এর জায়গায় কুচ্‌কুচে কালো। দূরের দৃষ্টি ৬।৯,

কাছের এন. ৫ (১৪ ইঞ্চিতে) অর্থাৎ খুবই ভালো। চক্ষু গোলকের সামনের কুঠরীটিকে গভীর দেখাচ্ছে এবং মণি বা তারার ব্যাস প্রায় তিন মিলিমিটার।

উপেনবাবুর বাঁ চোখে গ্লকোমার অপারেশন হয়েছিল। সেই অপারেশনের স্কার বা দাগ থাকলেও ফিলটারিং প্লেম বা জল বেরোবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। এ চোখেরও অ্যান্টিরিয়র চেম্বার বা সামনের কুঠরী গভীর। তারাটি সম্পূর্ণ গোল নয় এবং ব্যাস প্রায় ছয় মিলিমিটার। দর্শনেন্দ্রিয় আর শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংযোগ সূত্র নিয়ে আমরা আগ্রহী ছিলাম। বৃদ্ধ উপেনবাবুর কানের অডিওগ্রাম করে দেখা গেল নিচু ফ্রিকোয়েনসিতে অর্থাৎ খুব নিচু খাদের আওয়াজে উপেনবাবুর সচেতনতা অত্যন্ত প্রখর। বিশেষজ্ঞ (প্রয়াত) তপন ঘোষের মতে আমাদের যন্ত্রের সীমাবদ্ধতা না থাকলে উনি ১০-১৫ ডেসিবেল অবধি শুনতে পেতেন। এই ধরনের কানেই নাকি বাজের আওয়াজের প্রভাব বেশি পড়ে।

এটা অনেকটা জানা যে, পাকা ছানি বা অতি পাকা ছানি যেমন অপারেশন করে সূক্ষ্ম ছুরিতে বাদ দেওয়া যায়, তেমনি আবার সেটি হঠাৎ কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাতে স্খলিত হয়ে চোখের সামনের বা পিছনের কুঠরীতে পড়ে যেতে পারে। পরোক্ষ আঘাতের মধ্যে রোগীর নিজের জোরদার হাঁচি বা কাশিকে ধরা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৭ জুন ১৯৮০-র রাত্রিতে বাজের আওয়াজের জন্যই ছানিটি ওর চোখের ভিতরে পড়ে গেছে তাতে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পেরেছি। তবে শব্দের প্রভাব ঠিক কিভাবে কাজ করেছে তা জোর করে বলা শক্ত। বাজটি কি ধরনের ক্র্যাকল (কড়্ কড়্ আওয়াজের) না শিষ দেওয়া (হুইসলার) ? ওদের বর্ণনা শুনে মনে হয়—এটির স্থিতিকাল ছিল বেশ কিছুক্ষণ। সুতরাং বোধহয় ক্র্যাকল ও শিষ দুই-ই একত্রে ছিল, কিম্বা শুধু ক্র্যাকল ছিল—কারণ শিষ দেওয়া বাজের স্থিতিকাল এক সেকেণ্ড।
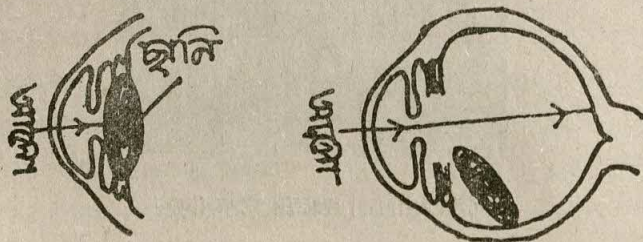
এরপরে আসে বাজের প্রতিক্রিয়া—কানে ও শরীরে। তীব্র রেজোন্যান্ট ভাইব্রেশন বা সমবেদী কম্পনের জন্য অতি পাকা ছানির সূক্ষ্ম ভঙ্গুর বন্ধন

স্থত্রগুলির (সাসপেনসারী লিগামেন্ট) ছিঁড়ে যাওয়া খুবই সম্ভব। তাছাড়া বাজের আওয়াজের জন্য মাথার মধ্যে যে গমগমে (বা গুনগুনে—উপেনবাবু 'humming'
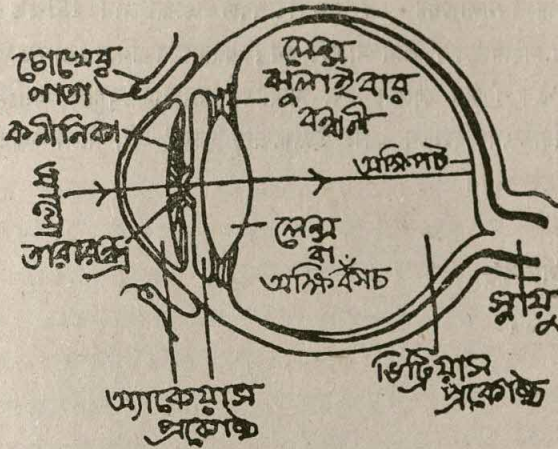
ছানি

আমাদের চোখে লেন্স (Lens) রয়েছে। আলো মণির (Pupil) ভেতর দিয়ে লেন্স-এ এসে পড়ে সেখান থেকে প্রতিসরিত হয়ে রেটিনায় পড়ে—এ প্রক্রিয়ায় আমরা দেখতে পাই। এই লেন্সটি একটি স্বচ্ছ পদার্থ (প্রোটিন)-এর আকার axis—4mm × transverse diameter—9/10 mm। সাধারণভাবে ছানি পড়া আমরা তাকেই বলি যখন লেন্স-এর স্বচ্ছতা কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায়। এটি অস্বচ্ছ হয়ে গেলে আলো আর এর ভেতর দিয়ে যেতে পারে না—আর এ-ব্যাপারটা খুব ধীর গতিতে ঘটার ফলে আস্তে আস্তে দৃষ্টি চলে যায়। যখন এটি পুরো অস্বচ্ছ হয়ে যায় তখন তাকে ছানি পাকা হয়েছে বলে থাকি। ছানি পাকা হলেই তখন অপারেশন করা হয়। অপারেশনটা আর কিছুই নয়, এই লেন্সটি চোখের সংযোগস্থত্রগুলি থেকে (Suspensory Legament) খুলে বের করে নেওয়া হয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো পাকা ছানি অপারেশন না করলে পরবর্তীকালে অনেক ক্ষতিকারক ব্যাপার ঘটতে পারে।

শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন) আওয়াজের স্থষ্টি হয়েছিল এবং যার স্থিতিকাল প্রায় ঘণ্টা খানেক ছিল তার ঘনীভূত বা লঘু যে কোন অংশেরই প্রভাব বন্ধনস্থত্রগুলির ওপর হয়েছিল। শরীরের কাঁপুনিও এক ধরনের পরোক্ষ আঘাত যা পাকা ছানি

খুলে দিতেও পারে—কাজেই এটিকে মিরাকল বলে চিহ্নিত করা যায় না, বলা উচিত বিরল এক শারীর-বৈজ্ঞানিক ঘটনা।

আমাদের পরীক্ষা-কাজ চলার সময়েই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র এক প্রকল্প নিয়ে ফিন্‌ল্যাণ্ডের এক চক্ষু বিশেষজ্ঞ এসেছিলেন ISI-তে। তিনি উপেন্দ্রনাথ রাহার 'কেস' শুনে আগ্রহী হন ; বরানগরে গিয়ে তিনিও তথাকথিত 'বিস্ময়বৃদ্ধ'-কে খুঁটিয়ে দেখেন এবং আমাদের ব্যাখ্যায় সম্মতি জানিয়ে মন্তব্য করেন—চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি উল্লেখযোগ্য 'ঘটনা' এটি, অলৌকিকতার কোন ব্যাপার এতে নেই।

জ্যোতির্ময় বসু

জানুয়ারি ১৯৮৪

জ্যান্ত কবর—অলৌকিক নয়

অনেক ঘটনাই মাঝে মাঝে শুনি, যেগুলো শুনেই প্রথম ধাক্কায় মনে হয়, 'হতেই পারে না, নিশ্চয়ই এর ভিতর কোনো বুজরুকি আছে'। সত্যিই অনেক-রকম লোক ঠকানো ব্যাপার থাকেও এগুলোতে। মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যায়, কাগজে-পত্রে খবর বেরোয়, লোকের মুখে মুখে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে বুজরুকির খবর। আবার বেশিরভাগ সময় ধরা পড়েও না—অবিশ্বাস্য ধরনের ঘটনা দেখিয়ে বা দেখে কিছু মতলববাজ লোক আর কিছু সরল-বিশ্বাসী মানুষ অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, দৈব-শক্তির অস্তিত্ব ধরে নিয়ে 'ব্যাখ্যা' খাড়া করে, —যার ভিতর না থাকে যুক্তি, না থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাইয়ের চেষ্টা। জীবনযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট দুর্বল মানসিকতার মানুষ, সনাতনী ঐতিহ্যের কাছে আত্মসমর্পণকারী মানুষ, আর অর্থশালী ক্ষমতাবান কিন্তু অপ্রকাশ্য অপরাধবোধে পীড়িত মানুষেরা নির্বিচারে মেনে নেয় এইসব ব্যাখ্যা।

বিজ্ঞান-পড়া মন স্বভাবতই মানতে চায় না এইসব ব্যাখ্যা। ফলে প্রথম ধাক্কাতেই প্রতিক্রিয়া হয়, 'সবই নিশ্চয়ই লোক-ঠকানো বুজরুকি'। বুজরুকির যেসব খবর ছড়ায় মাঝে মাঝে তাতে আরো জোর পায় এই মনোভাব। ফলে অনেকসময়ই ঘটনাগুলোকে ঠিকমতো যাচাই করে দেখার মানসিকতাটা চাপা পড়ে

যায়। সত্যি সত্যি এগুলোর ভিতর নতুন ধরনের কোনো ব্যাপার আছে কি-না তদন্ত করে দেখার বদলে চোখ বুজে থাকার এক নির্বিচার, অবৈজ্ঞানিক ঝোঁক চলে আসে। শেষ পর্যন্ত যখন দেখা যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্তত ঘটনাগুলো পুরোপুরি অস্বীকার করার মতো নয়, বিজ্ঞান-পড়া মনের প্রতিক্রিয়ার ভিতর তখনো কিন্তু নির্বিচার ভাব একটা থেকেই যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রতি-ক্রিয়া মানুষকে নিয়ে গিয়ে ফেলে একেবারে উল্টো অবস্থানে, কুসংস্কারের গাড্ডায়। 'বিজ্ঞান তো সব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারছে না', তাই অলৌকিক 'কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে'—এই আশ্বাসের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলতে চায় অনেক ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ার-ডক্টরেট, সাঁইবাবা-মহেশযোগীদের সেবাদাস হয়ে বিজ্ঞানের কেতাবী বুলিকে কাজে লাগায় অলৌকিকের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে। সব দেখেশুনে আরো বেশি ভক্তি আর বিশ্বাসে গদগদ হয় সাধারণ মানুষ। কার্যত সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কষ্টকর কাজটাকে এড়িয়ে যায় বেশিরভাগ বিজ্ঞান-জানা মানুষ। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান কিছু লোক খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করে ব্যাপারগুলোকে। দেখা যায় সামান্য ঘটনারই ঠিকমতো ব্যাখ্যা দিতে গেলে দরকার হয়ে পড়ছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গভীর কিছু তত্ত্ব ও তথ্য। অনেকসময় নতুন কোনো দৃষ্টিকোণও বেরিয়ে আসতে পারে এই ধরনের অনুসন্ধান থেকে। সব মিলিয়ে, সমৃদ্ধতর হয় মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার। কুসংস্কারের অচলায়তনে সত্যিকারের আঘাত দিতে হলে কিন্তু এই ধরনের অনুসন্ধানই দরকার। একটা নির্বিচার গোঁড়া মানসিকতাকে অন্য আরেক ধরনের নির্বিচার মানসিকতা দিয়ে কখনো নির্মূল করা যায় না।

শুরু করেছিলাম আপাত-অলৌকিক অদ্ভুত কিছু ঘটনার প্রসঙ্গ দিয়ে। এ-রকম একটা হলো 'জ্যান্ত কবর'। একজন লোক সশরীরে মাটির নিচে আবদ্ধ গর্তে গিয়ে ঢুকছে কিংবা গর্তে মাথা ডুবিয়ে থাকছে বহুক্ষণ।

এই জ্যান্ত কবরের ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো। যে দুই-একটা আলোচনা পড়লাম (দ্রষ্টব্য : 'উৎস মানুষ', জুন '৮১ ; সায়েন্স টু-ডে, ডিসেম্বর '৮১), তাতে ঘটনাটাই আদৌ সত্যি কি না সে ব্যাপারেই সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। রাস্তা-ঘাটে পয়সার জন্য যারা মাথা মাটির নিচে পুঁতে ভেল্কি দেখায় তাদের ভিতর অনেকেই (সকলেই ?) যে কৌশলের আশ্রয় নেয় তাতে সন্দেহ নেই। নানান কায়দায় দর্শকদের বুঝতে না দিয়ে হাওয়া চলাচলের রাস্তা রেখে দেওয়ার কথা জনান্তিকে স্বীকারও করেছে ভেল্কিবাজদেরই কয়েকজন। কিন্তু বেশ আঁটঘাট বেঁধে পরখ করেও কোনো কৌশল ধরতে পারা যায় নি অথচ যোগী বা যাদুকর বহুক্ষণ ধরে

মাটির নিচে বা বন্ধ কুঠুরীতে কাটিয়েছে এমন বেশ কয়েকটা রিপোর্টও পাওয়া যাচ্ছে। এগুলির ভিতরও কি খুব সূক্ষ্ম কোনো কৌশল ছিল যা ধরতে পারে নি পরখকারীরা? যদি তাই-ই হয় তবে তো আর কোনো কথাই নেই, যদিও অবশ্য শুধু সংশয় প্রকাশ না করে পাকাপাকিভাবে ব্যাপারটাকে ফাঁকিবাজি বলে প্রমাণ করার দায়িত্ব রয়েই যায়। সেরকম কোনো নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট পাই নি এখনো। ঘটনার সাক্ষ্য যা, তাতে জ্যান্ত কবরের সব দাবিকেই ফাঁকিবাজি বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন না অনেকেই। গোলমাল একটা রয়ে যাচ্ছে এখানেই। যারা জ্যান্ত কবরের ঘটনার সত্যতা স্বীকার করছে তারা ব্যাপারটাকে অলৌকিক বলে মানতে রাজি নয় সঠিকভাবেই, কিন্তু আলগা দুই-একটা ইঙ্গিত ছাড়া ঘটনাটির বিশদে ব্যাখ্যার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না কোথাও। এই ইঙ্গিতগুলির মধ্যে একটি মনে হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধ জায়গায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অনুপাত বেড়ে যায়, এবং শরীরের কোষগুলির ভিতর কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে গেলে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাতেই শরীরের বিপাকীয় ও অন্যান্য ধরনের সক্রিয়তা খুব কমে যায়। জ্যান্ত কবরের ব্যাখ্যা এই ঘটনার ভিতর খুঁজে পাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু শুধু এটুকু বললে বস্তুত কিছুই জানা হয় না। কোন্ অনুপাতে কার্বন ডাই-অক্সাইডযুক্ত বাতাস কতক্ষণ ধরে নিলে শরীরে কি প্রতিক্রিয়া হয়, ঠিক কোন্ কোন্ শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় কোন্ ধরনের পরিবর্তন ঘটে, কেন ঘটে, জ্যান্ত কবরের পিছনে বিশেষ ধরনের অভ্যাস (যোগাভ্যাস?)-এর ভূমিকা ঠিক কি, এই অভ্যাসের ফলে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি কিভাবে ও কেন পরিবর্তিত হয়—এইসব অনুসন্ধান ছাড়া কিন্তু জ্যান্ত কবর তার অলৌকিকত্ব থেকে মুক্তি পেলেও রহস্যময়তার মোড়ক থেকেই যাবে।

জ্যান্ত কবরের বিষয়টা নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা-তদন্ত করছেন, শারীরবৃত্ত ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে যাদের অনুসন্ধান চালানোর সুযোগ রয়েছে, কুসংস্কার ও অতিপ্রাকৃতবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম চাইছেন, তাদের কাছ থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর চাই। না হলে রহস্যবাদীরা ('মিষ্টিক') যখন জ্যান্ত কবরের ঘটনাকে সামনে রেখে যোগাভ্যাসকে অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের উপায় বলে প্রচার করবেন তখন আমরা তার উপযুক্ত জবাব আর দিতে পারবো না।

অভিজিৎ লাহিড়ী

সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

মাটির নিচে মাথা—হরেক ছলা কলা

একটি লোক, মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে অথবা শীর্ষাসনের ভঙ্গিতে পা আকাশের দিকে তোলা, হাত দুটো দু-পাশে ছড়ানো, পা-শরীর টানটান, মাথা নেই। 'মাথা নেই' বলতে—গোটা মাথা বা 'মুণ্ডু'টা মাটির মধ্যে ঢোকানো। সামনে বিছানো একটা গামছা বা ন্যাকড়া—তাতে সিকি-আধুলি-টাকা ছড়ানো —প্রণামী কিংবা বকশিস।

এ রকম দৃশ্য দেখে থাকবেন অনেকেই—রাস্তার ধারে, কোর্ট-কাছারির সামনে, হাটে-বাজারে বা বিভিন্ন মেলায়। চোখে দেখলে সত্যি শিহরণ হয়। ও রকম মারাত্মক অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকে কি বাঁচে? হ্যাঁ, ওই বিদ্ঘুটে প্রদর্শনীর নায়করা বাঁচে তো বটেই বরং বাঁচার জন্যই তাদের ও-রকম 'জ্যান্ত কবরে'র খেলা। অর্থ উপার্জনের এই বিচিত্র কায়দার অন্তরালে রয়েছে নানারকম কৌশল। তার মধ্যে তিনটে কৌশলের কথা আমরা জানতে পেরেছি :
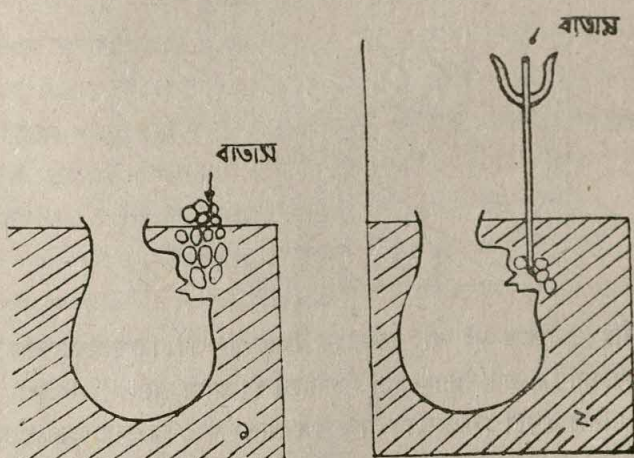
১. গর্তে মাথা ঢোকানোর পর (মাথা আর মুখমণ্ডল একটা গামছা বা পাত্‌লা কাপড়ে জড়িয়ে নেওয়া হয় সাধারণত) মাটি দিয়ে গর্ত বোজানোর সময় চতুরতার সঙ্গে নাকের কাছটায় কিছু বড় মাপের ঢিল পাটকেল রাখা হয়, তার

ওপর ঝুরো মাটি আলগা করে দিয়ে গর্ত ভরাট করা হয়। কখনোই মাটি চেপে ঠেসে দেওয়া হয় না। এতে বেশ কিছু বাতাসের খুপরি (air-pocket) আর বাতাস চলাচলের রাস্তা (passage) থেকে যায় ; লোকটা মৃদু তালে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে পারে অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। (চিত্র ১)

২. এই দ্বিতীয় কৌশলটি অবলম্বন করে সাধারণত তথাকথিত ত্রিশূলধারী সাধু বা যোগী খেলুড়েরা। বিশেষ একটা ত্রিশূল, যার ডগা থেকে নিচ অবধি সরু প্রায়-অদৃশ্য ছিদ্র থাকে, সেটা প্রথমে গর্তের মধ্যে বসানো হয়। এরপর মাথা ডুবিয়ে নাকটা ঠিক ওই ত্রিশূল-দণ্ডের নিম্নপ্রান্তের সামনে রাখা হয় আর ঢিল-পাটকেল-ঝুরো মাটি দিয়ে যথারীতি গর্ত ভরাট করা হয়। মাটির ওপরে খাড়া ত্রিশূলের ওপর প্রান্তের ছিদ্র দিয়ে বাতাস ঢুকে দিব্যি লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখে, দর্শক শিহরিত হয় 'অলৌকিকতার অকাট্য নিদর্শন' প্রত্যক্ষ করছে ভেবে। (চিত্র ২)
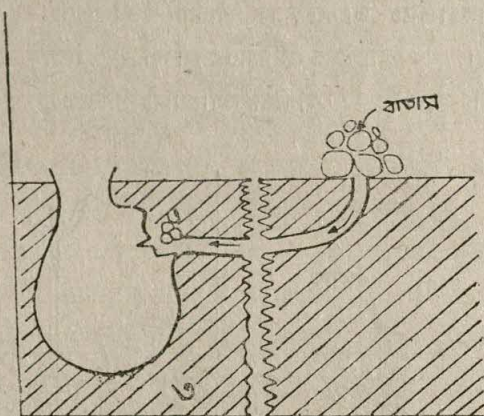
৩. তৃতীয় পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক লোকের একটা দলকে সক্রিয় থাকতে হয়, রীতিমতো। প্ল্যান-প্রস্তুতি চালাতে হয় আগে থেকে।

মাটির নিচে একটা ১০-১২ হাত বা তারও বেশি সরু সুড়ঙ্গ আগেভাগ খুঁড়ে রাখে খেলুড়ের দল। এর একটা মুখ থাকে মাথা ডোবানোর গর্তটার নিচের দিকে যাতে প্রদর্শক লোকটি মাথা ঢোকালে তার নাক বরাবর থাকে সুড়ঙ্গ-মুখ। সুড়ঙ্গের অন্য মুখটা শেষ হয় দূরে, মাটির ওপরেই ; কিন্তু ঢিল-পাটকেল ইত্যাদি দিয়ে সরু মুখটা এমনভাবে বোজানো থাকে (আলগা করে অবশ্যই কেন না হাওয়া

চলাচলের সুযোগ তো রাখতেই হবে) যে, কোনমতেই সাধারণ লোকের চোখে অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়ে না। মূল প্রদর্শকের সহকারি সুড়ঙ্গের এই লুকোন মুখটাকে নজরে রাখে কিংবা কোন চিহ্ন দিয়ে রাখে খেলা শুরুর আগে থেকে। (চিত্র ৩)

ওপরের এই তিনটে পদ্ধতিতেই খেলুড়ে খুব মৃদু মাত্রায় শ্বাস নেয়। অতি সন্তর্পণে খুঁটিয়ে নজর করলেই দেখা যায় সেই 'মুণ্ডুহীন' শায়িত দেহটার বুক পেট খুব ধীরে ওঠানামা করছে।

জ্যান্ত কবর ও শারীর বিজ্ঞান

স্বামী সত্য মূর্থি মাটির নিচে ঢুকেছিলেন (১৯৮১ সালের নভেম্বর মাসে) বোম্বাই-এর জনৈক চিত্রতারকার বাড়ির উঠোনে—নির্বাচিত দর্শকদের উপস্থিতিতে। তিনি নাকি ৬ দিনের বেশি ওই গর্তে ছিলেন খাদ্য বা পানীয় ছাড়াই। এ-জাতীয় প্রদর্শনীতে অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করা হলেও শারীর বিজ্ঞানীরা তা মানতে চান না, তারা এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন।

উল্লেখযোগ্য পরীক্ষাগুলির মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের রামানন্দ যোগীর ওপর পরীক্ষার কথা বলা যায়। অল ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস, নিউ দিল্লী —এই সংস্থার বিজ্ঞানী বি কে আনন্দ ও তার সহযোগীরা ধাতু ও কাচের তৈরি একটি বায়ুরুদ্ধ বাক্সের মধ্যে রামানন্দ যোগীকে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ঢুকিয়ে রেখে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। যোগীর দৈহিক পরিবর্তন এবং বাক্সের ভেতরকার অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে মাপা হয়। তারা লক্ষ্য করেন, বদ্ধ বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা যত বাড়তে থাকে ততই নিশ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন কমতে থাকে, অর্থাৎ তখন আরো কম অক্সিজেনেই দৈহিক প্রক্রিয়াগুলি চালানো যায়।

সাধারণত আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে ২·৫% কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে যায়। চারপাশের বাতাসে যদি ৫% কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে তাহলে দেহযন্ত্রের ওপর চাপ পড়তে থাকে। অধিক মাত্রার কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রুত মিশতে থাকে রক্ত আর দেহকোষে ; স্নায়ুকেন্দ্র আক্রান্ত হয়—দেহযন্ত্রাংশ নিষ্ক্রিয় হতে শুরু করে। ক্রমে দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকেজো হতে থাকে, শরীর ঠাণ্ডা হয়, হৃদ-স্পন্দন কমে আসে, দেহকোষগুলির অক্সিজেনের চাহিদা কমে যায়—শরীরের জৈবিক বিপাকীয় প্রক্রিয়া (metabolism) রীতিমতো স্তিমিত হয়ে পড়ে।

মাটির নিচের গর্তে বা কোন আবদ্ধ স্থানে যে-কেউ, কোন রকম প্র্যাকটিশ ছাড়াই, কয়েকঘণ্টা এভাবে কাটিয়ে দিতে পারে। বোম্বের কাছে লোনাভালা যোগাশ্রমের পি করম্বেলকার আর তার দুই সঙ্গী এ-রকম পরীক্ষা করেছেন (কোন যোগাভ্যাস ছাড়াই) সাফল্যের সঙ্গে; তারা কংক্রিটের বায়ুরুদ্ধ বাক্সে ঢুকে ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাটিয়েছেন।

তবে দীর্ঘক্ষণ (কয়েকদিন ধরে) জল-খাবার ছাড়া ভূগর্ভে কাটাতে হলে উপযুক্ত ব্যায়াম, যোগাসন চর্চা ও শ্বাস নিয়ন্ত্রণের পূর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন। এ-রকম প্র্যাকটিশের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রতি সহনশীলতা বাড়তে দেখা গেছে। ওস্তাদ যোগ-প্রদর্শক প্রায় ৭·৭৩% কার্বন ডাই-অক্সাইড পর্যন্ত সহ্য করতে পারেন। নিয়মমাফিক ব্যায়াম বা যোগাসন থেকে শরীরের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ওপর, জৈবিক প্রক্রিয়ার ওপর, নিয়ন্ত্রণ বাড়ে। কেবল শ্বাস নিয়ন্ত্রণ নয়, 'যোগী'রা যে নানারকম দৈহিক কসরৎ দেখায় বিভিন্ন প্রদর্শনীতে সেটা ওই বহুদিনের দেহচর্চারই ফল—অলৌকিক ক্ষমতার কোন ভূমিকা নেই সেখানে।

সূত্র : শঙ্কর রাও-এর নিবন্ধ ; সাইন্স টু-ডে, ডিসেম্বর ১৯৮১

স্কেচ : রিক্তা সামন্ত

সৌজন্য : শৈলেন মণ্ডল

সংগ্রাহক

সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

বুড়ির বাড়ি—পেটের গাছ

টাকী রোডে যে সমস্ত বাস চলে, আপনি যদি সেই বাসের কোন একটির যাত্রী হন তবে, গাড়ি বেড়াচাঁপা বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ালেই শুনতে পাবেন ভ্যান-ওয়ালাদের চিৎকার : বুড়ির বাড়ি, বুড়ির বাড়ি, বুড়ির বাড়ি যাবেন।

বেড়াচাঁপা আমাদের বাড়ির কাছে। দশ কিলোমিটার। তাই নিজস্ব বা পারিবারিক প্রয়োজনে বেড়াচাঁপায় যেতে হয় কখনো কখনো। আগে ভ্রূক্ষেপ করতাম না। কিন্তু একদিন কৌতূহল মেটাতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কি ব্যাপার ভাই, বুড়ির বাড়ি কি হয়?'

—আরে জানেন না, পেটের থেকে ওষুধ তুলে দেয়, গাছ তুলে দেয়।

পেটের ভিতর গাছ? ব্যাপারটা যে নিছক ভাঁওতা সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। কিন্তু কি বিরাট জনপ্রিয়তা এর! বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, বাবা-মা যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি, সবাই বলেছে, 'হ্যাঁ, সত্যি ব্যাপার, বুড়ি খুব সাধক মানুষ। এইতো সেদিন অমুক পেটের গাছ তুলে এসেছে। ওর পেটের ব্যথা সেরে গেছে।'

হ্যাঁ, এক বুড়ি নাকি এই পেটের গাছ তোলে। বন্ধুদের কাছ থেকে জেনেছিলাম, যে গাছ বা ওষুধ তুলতে যাবে বুড়ি তার হাতে একটি ঘটি দিয়ে, বলবে, 'যাও সামনের ঐ টিউবওয়েল থেকে এক ঘটি পানি আন।'

তারপর বুড়ি আপনাকে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়তে বলবে। আপনি বিশ্বাসে গদগদ হয়ে শুয়ে পড়বেন। বুড়ি ঘটি শুদ্ধু জল আপনার পেটে বসিয়ে দেবে। ব্যাস্, তারপর পেটের গাছ ঘটির ভিতরে এসে পৌঁছবে। বেশ মজা, গাছ পেটের চামড়া ফুঁড়ে, তারপর কাঁসার ঘটি ফুঁড়ে, একেবারে ঘটির ভিতরে এসে হাজির!

বস্তুত অনেকদিন থেকেই আমার ইচ্ছা যে, একবার ঐ রহস্যজনক অলৌকিক (?) ব্যাপারটা গিয়ে দেখে আসি। বুড়ির নাকি ওটা স্বপ্নে পাওয়া জিনিস। শেষে, গত ২ জুন '৮৪ বন্ধু আশরাফের সাথে বেরিয়ে পড়লাম।

বেড়াচাঁপা থেকে জীবনপুর রোড বরাবর প্রায় তিন কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে তবে বুড়ির বাড়ি। গ্রাম কুঁচেমোড়া।

শুনেছিলাম সকাল থেকেই নাকি লোকে লোকারণ্য। কিন্তু গিয়েই অবাক আমি। কোন লোক নেই। একজন আধাবয়সী লোক উঠোনে বসে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটাই কি বুড়ির বাড়ি?'

—হ্যাঁ, এই—বলে ভদ্রলোক সামনের বাড়িটি দেখিয়ে দিলেন!

উঠোনের একপাশে একটা দরগা গোছের আছে। আমি সেদিকে চোখ ফেলতেই ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন, 'ঐ বুড়ির কবর। দেয়ালের গায়ে সব লেখা আছে, পড়ুন।'

বুঝলাম বুড়ি আর বেঁচে নেই। আমরা এগিয়ে গেলাম। পড়লাম—

"বুড়ি মায়ের "দরগা" / মৃত্যু—১৩৮৬ সাল / শিষ্য—আতিয়ার রহমান ও রমিছা বিবি / "কুঁচেমোড়া"

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে এখন এই শিষ্যরাই গাছ তোলে?'

'হ্যাঁ'—গলার স্বরটা যেন অন্য লোকের! পিছন ফিরলাম, সত্যি সত্যিই অন্য লোক।

'আপনি কি…' আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই আতিয়ার রহমান। পেটের গাছ তুলি।'

ভদ্রলোকের পরনে দামী লুঙ্গি। গায়ে এক জায়গায় ছেঁড়া একটা গেঞ্জি। তার ওপর হালকা সবুজ রঙের একটা তোয়ালে ধরনের। গেঞ্জির নিচ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা ভুঁড়ি। মুখে একমুখ দাড়ি। গোঁফ ছোট ছোট করে ছাঁটা।

'উঠুন, ঘরে বসুন'—ভদ্রলোক বললেন।

আমরা ঘরে উঠছিলাম। ফের প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কি গাছ তুলবেন?' এই প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কারণ আমি প্রথম থেকে ভেবে রেখেছিলাম যে, ভিড় যখন হয় তখন পাশ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করব। কিন্তু আমরা মাত্র দু-জন। বেশ অনেকক্ষণ না দেখলে হয়তো কিছুই ধরতে পারব না। যদি বলি তুলব, উনি গাছ কায়দা মাফিক তুলে দেবেন। আমি কিছুই ধরতে পারব না।

বললাম, 'দেখুন, আমার এক বন্ধুর এখানে আসার কথা আছে। সে আসুক। সেও গাছ তুলবে। আমরা একটু অপেক্ষা করি।' ভদ্রলোকের কথামতো আমরা একটা চৌকিতে বসলাম, আমাদের পাশে দু-খানা মাদুর পাতা। একটা করে বালিশও আছে। বুঝলাম এই বিছানায় শুয়ে গাছ তুলতে হয়। একটা কলসি ও একটা কাঁসার ঘটি (বোধহয় এই সেই গাছ তোলার ঘটি) আছে একধারে। ভদ্রলোক আমাদের সামনে আসনে বসলেন। তার একপাশে বেশ কিছুটা গাছের

পুরানো শিকড়। চার-পাঁচটা কৌটো রয়েছে একধারে। জিজ্ঞাসা করতে বললেন, 'ওতে রোগীদের জন্য আমার তৈরি বড়ি আছে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'আজকে এত ভিড় কম কেন?'

'আজ পয়লা রোজা, হয়তো তাই। একটু বস তোমরা, কত রোগী আসবে দেখো।'

'আচ্ছা, রমিছা বিবি কে?'—আমার প্রশ্ন।

'এইতো ইনি'—ফিরে দেখলাম একজন বুড়ি। ময়লা সাদা একটি কাপড় পরা। হাতে কিছু গাছের শিকড়। অন্য হাতে একটা বেড-কভার মনে হয়। রঙিন সুতো দিয়ে সেটা সেলাই করতে বসলেন একটু দূরে।

আমি ভদ্রলোককে নিয়ে পড়লাম। সরাসরি প্রশ্ন করলাম, 'গাছ তোলার নিয়ম কি?'

'নিয়ম আর কি। সকালবেলা খালি পেটে আসতে হয়। গাছ তোলা হয়ে গেলে পঞ্চাশ গ্রাম সন্দেশ খেতে হয়। আর গাছ তোলার জন্য আট্টা টাকা লাগে।'—কাঁচি দিয়ে গাছের ছাল কেটে পুরিয়া মতো করতে করতে উনি বললেন। ভদ্রলোকের কাছ থেকে জানলাম যে, তিনি ও রমিছা বিবি বুড়িকে ওস্তাদ ধরে গাছ তোলা শিখেছেন। বুড়ি ১৩৫০ সালে এক রাত্রে এটা স্বপ্নে পেয়েছিলেন। অর্থাৎ এত বছর ধরে বেশ জম-জমাটভাবে এই অলৌকিক (?) ব্যাপারটা ঘটে আসছে।

'আচ্ছা বাস থেকে নামলে বেড়াচাঁপায় যে সব ভ্যানওয়ালারা...।'

আমার মুখে ভ্যানওয়ালাদের কথা শুনে আমাকে শেষ করতে না দিয়েই উনি বললেন, 'ডুব্‌লিকেট, ডুব্‌লিকেট। ওদের সব ডুব্‌লিকেট। উই একটু আগে আর একজনা গাছ তোলে। ভ্যানওয়ালাদের সঙ্গে যুক্তি করে রেখেছে। যা টাকা হবে অর্ধেক ওরা নেবে আর অর্ধেক সে নেবে। ভ্যানওয়ালারা রোগীদের ওখানে নিয়ে যায়। তা নিয়ে যাগ গে বাপুরা। রুজির মালিক আল্লাহ্‌। আমার রোগী ঠিক হয়।'

'আপনি তো বললেন ওদের সব ডুপ্‌লিকেট, ওরা কি ঘটির মধ্যে বাইরে থেকে গাছ দিয়ে দেয়?'—সুযোগ পেয়ে আমি চেপে ধরলাম।

'তার আমি কি জানি বাপু? আমি কি ওখানে গিয়েছি যে বলতে পারব? তোমরা যাও দেখতে পাবে।'

তারপর তিনি আমার একটা হাত টেনে নিয়ে দু-আঙুলের ফাঁকে সেই শিকড়মোড়া একটা পুরিয়া দিয়ে, মুখে মন্ত্র-পড়ার ভান করে আমার হাতে একটা

ফুঁ দিয়ে বললেন, 'হাত ওপরে ওঠ।' আমার হাত উঠল না।

আশরাফের হাতেও একটা দিলেন। উঠল না। শেষে একটা কৌটো খুলে আমার হাতের ওপর কিছুটা দলা পাকানো চুল (সম্ভবত মেয়েদের চুল) দিয়ে একবার শেষ ফুঁ দিলেন বেশ জোরে। এই চুল নাকি কামরূপ-কামাখ্যার চুল। উনি ওস্তাদের কাছ থেকে পেয়েছেন।

দুষ্টু বুদ্ধি চাপল আমার মাথায়। মাটিতে রাখা আমার হাতটা সামান্য কাঁপাতে লাগলাম। উনি আরও ফুঁ দিতে লাগলেন। বুঝলাম, মৌলবী সাহেব কিছুই বুঝতে পারেন নি।

ঠিক এই সময় দু-জন বউ এল। রোগী। মাথায় লাল সিঁদুর। মৌলবী সাহেব নিজের জায়গায় ঠিক হয়ে বসলেন। একটা বৌয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'কি, তোমার আবার কি খবর?'

'বোনকে নিয়ে এলাম।'—বুঝলাম উনি আগে গাছ তুলে গেছেন। এবার বোনকে এনেছেন।

যা হোক, বোনের হাতের নাড়ি টিপে (ডাক্তারী ঢঙে) মৌলবী সাহেব বললেন, 'এর পেটে "ওষুধ" হয়েছে, গাছ তুলতে হবে, অম্বলের দোষ, ধাতুর দোষ, পেটে আলসার আর উপরি দোষ।'

মনে মনে ভাবলাম বেশ কিছু টাকা এর কাছ থেকে আদায় করবে।

বোনটি ঘটি করে টিউবওয়েল থেকে জল আনল। মৌলবী সাহেব উঠে গেলেন এক জায়গায় থুতু ফেলতে। আমার সতর্ক চোখ তার হাতের দিকে। দেখলাম, বেড়ার গা থেকে কি যেন একটা নিলেন। আমার মনে খটকা লাগল।

মেয়েটি জল এনে তার হাতে দিল। যথারীতি মেয়েটি চিত হয়ে শুল। তার নাভির কাছে ঘটিটা বসিয়ে দিলেন। তারপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে ঘটিটা চেপে ধরতে বললেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর মৌলবী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'নাভির কাছে দপাস্ দপাস্ করছে?'

'হ্যাঁ'—মেয়েটি বলল।

এবারে মৌলবী সাহেব আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ঐ, গাছ উঠছে।'

তারপর মেয়েটির পেটের ওপর থেকে ঘটি নামিয়ে জল ফেলে দিয়ে একটা কাগজের ওপর ঘটিটা উপুড় করলেন। বেরিয়ে এল গাছ।

আমি তো অবাক। তবে সেটা গাছ নয়। গমের আটা লেই করলে যেরকম হয় ঠিক সেই রকম। আর তার গায়ে দু-তিনটে শিকড় লাগানো।

কিন্তু ওটাতে আমাদের হাত দিতে দিলেন না।

মৌলবী সাহেব আমার দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমরা তো আজকালকার ছেলে, এসব বিশ্বাস কর না। এবার নিজি চোখে দেখলে তো?'

তারপর যথারীতি রোগের ওষুধ হিসেবে বেশিরভাগ লোকের মতো এদেরও মাদুলি দিলেন। তবে এ মাদুলি তাবিজ নয়। দিচ্ছেন কিছু শিকড়-চাঁছি, সেই কামরূপ-কামাখ্যা-খ্যাত (?) চুলের একটুখানি, একমুখ পোড়া বাঁশের চটার একটুখানি—ইত্যাদি। আশ্চর্যের বিষয় এতেই অনেক লোকের ব্যাধি সেরে যাচ্ছে। আসলে মৌলবী সাহেব ওষুধ হিসেবে কিছু সালসা ও বড়ি (ওনার নিজের তৈরি) দেন। এবং এতেই হয়তো কিছুটা কাজ হয়।

'ছেলের নজর লাগা' ইত্যাদি নানান সমস্যার জন্য গোটা তিনেক মাদুলি নিয়ে ছাব্বিশ টাকা মৌলবী সাহেবকে দিয়ে বউ দু-টি বিদায় হলো।

তারপর আরো দু-তিনজন রোগী এল। তবে তারা গাছ তুললো না। মাদুলি নিয়ে চলে গেল। আমাদের চোখের সামনে মৌলবী সাহেব ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পঞ্চাশ টাকা আয় করলেন।

তারপর আমার পেটে ব্যথা করে বলে (আমার পেটে কোন ব্যথা নেই) আমি গাছ তুলতে প্রস্তুত হলাম। বিছানায় শুয়ে আমি কড়া নজর রাখলাম মৌলবী সাহেবের হাতের ওপর। তিনি আবার থুতু ফেলতে গেলেন সেই একই জায়গায়। সেই একই ভঙ্গিমায় হাতে যেন কি নিলেন।

আশরাফ জলপূর্ণ ঘটি যখন তার হাতে দিতে যাবে অমনি আমি বললাম, 'আচ্ছা, এবার বুড়িমা (রমিছা বিবি) তুলুক।'

মৌলবী সাহেব যেন ঘাবড়ে গেলেন। তারপর চকিতে বললেন, 'বেশ তোমার যা ইচ্ছা।'

তারপর বুড়িকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি তোল।' কিন্তু বুড়ি আমার কাছে ঘরের সামনে দিয়ে না এসে পিছন দিকে গেলেন। মৌলবী সাহেবও এধার দিয়ে দেওয়ালের আড়াল হলেন।

আমার চোখের ইশারায় আশরাফ উঁকি দিয়ে দেখল যে, মৌলবী সাহেব বুড়ির হাতে কি যেন দিয়ে দিলেন।

তারপর বুড়ি এল। আশরাফের হাত থেকে ঘটি নিয়ে আমার নাভির কাছে বসাবার আগে গাছ নামের ঐ লেই জাতীয় জিনিস ঘটিতে ফেললেন। আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু কিছু বললাম না কারণ আমি এসেছি রহস্যের কিনারা করতে, ঝগড়া করতে নয়।

বস্তুত বুড়ি রমিছা বিবি এখনো মৌলবী সাহেবের মতো হাত সাফাইয়ে সিদ্ধহস্ত নন। ফলে আমার বেশ সুবিধা হলো।

তারপর নাভিতে জোর চাপ দিয়ে ঘটিটা বুড়ি আমার পেটে বসিয়ে দিলেন। পেটের ওপর ছড়িয়ে থাকা শিরা-ধমনীতে রক্ত চলাচলের জন্য যে স্পন্দন তা ঐ নাভির কাছে চাপ থাকায় বেশ প্রকট হয়ে উঠল। এবং ঐটাই বোধহয় গাছ ওঠার 'দপাস্ দপাস্'। আর, সব থেকে মজার ব্যাপার হলো যে, আমি ভালোমানুষ, তবুও আমার পেট থেকেও গাছ তুলে দেওয়া হল।

আমার উদ্দেশ্য সফল। মৌলবী সাহেবকে পাঁচটা টাকা দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য, আর এক জায়গায় কোথায় গাছ তোলা হয় সেখানে যাব।

মিনিট পাঁচেক সাইকেল চালানোর পর সেখানে পৌঁছুলাম। তবে এখানকার গাছতোলা লোকটি ছোকরা বয়েসের। বয়স বোধহয় পঁচিশ-এর বেশি নয়। পরনে প্যান্ট-শার্ট। নাম সাহেব আলি।

আমি, মৌলবী সাহেব ওনার বিরুদ্ধে যা যা বলেছিলেন (ভ্যানওয়ালাদের সঙ্গে চুক্তির ব্যাপার) সব বললাম। তারপর মৌলবী সাহেবের গাছ তোলার রহস্য বললাম।

সব শুনে সাহেব আলি আমাকে বললেন, 'দেখুন, আমার কাছে কেন, ওনার কাছেও (মৌলবী সাহেবের কাছেও) যত লোক আসবে সবার-ই পেটের মধ্যে থেকে গাছ তোলা হয়।'

আমি চেপে ধরলাম, বললাম, 'তার মানে সব ভাঁওতা ?'

'হ্যাঁ'—সাহেব আলি নির্দ্বিধায় স্বীকার করলেন।

'তবে এসব করেন কেন ?'

'পেটের জ্বালায় করি। তাছাড়া আমরা সবাই একটু-আধটু কবিরাজি করি। ফলে কারো সারে কারো সারে না। আমি কবিরাজি বিদ্যা কিছুটা জানি। ওরা তাও জানে না।'

সাহেব আলির কথায় জানলাম যে, সুবল নামে একটি লোকও নাকি এই ব্যবসা করে। এবং সুবল-ই একদিন বসিরহাটের ও রামনাথপুরের দু-টি ছেলের কাছে ধরা পড়েছে।

আমি সাহেব আলিকে বললাম, 'যখন সবই বললেন, তখন দয়া করে বলুন কখন ঘটিতে গাছ দেন এবং কিভাবে দেন ?'

সাহেব আলির কথাতে জানতে পারলাম যে, আমাদের মৌলবী সাহেব যেভাবে দেন ঐ একই পদ্ধতিতে ইনিও দেন। সাহেব আলি আরও বললেন যে, তিনি

মাঝে মাঝে ঐ গাছ গালের ভিতর রাখেন এবং পেট থেকে ঘটি তুলে জল ফেলার কোন এক সময় ঘটিতে দিয়ে দেন।

আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তরে সাহেব আলি জানালেন যে, পাউরুটির সঙ্গে এক রকম জিনিস মিশিয়ে ঐ লেই জাতীয় বস্তু তৈরি এবং ঐ লেই-এর মধ্যে বনমূলো, রসুন বা পেঁয়াজের শিকড় গেঁথে ঐ 'গাছ' তৈরি।

'আপনি সব কথা ফাঁস করলেন, এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না?'

'বললাম তো, এই গাছ তোলার ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেলে ওদের কাছে কেউ আসবে না। কিন্তু আমি পাঁচ-ছ-বছর ওস্তাদ ধরে কবিরাজি শিখেছি। চলবে ভাল।'—সাহেব আলি বেশ জোর দিয়েই বললেন।

গাছ তোলার রহস্যের খোঁজে এসে একটা সত্য উদ্ধার করতে পারলাম আমরা। সেইসঙ্গে আরেকটা চিন্তাও মাথায় এলো—গ্রামে-গঞ্জে এরকম ছোট-খাটো ভেল্কি বা টোট্‌কার চমক দিয়ে যারা পেশা চালাচ্ছে তারা অধিকাংশই অতি নিম্নবিত্ত, দরিদ্র মানুষ। স্রেফ টাকা পাওয়ার জন্যই এরা ঠকায়। সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানমুখী ও সমাজসচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর গুনিনদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করলে এ-ধরনের প্রতারণার দিকটা অনেক কমে যাবে মনে হয়।

সোহারাব হোসেন

অগাস্ট ১৯৮৪

নখদর্পণ

'নখদর্পণ' মানে হলো অলৌকিক শক্তিবলে নখকে এমন একটি দর্পণ বা আয়নায় রূপান্তরিত করা যেটিতে অতীতের কোনো ঘটনাকে বা অদৃশ্য কোনো কিছুকে সিনেমার মতো পরপর ঐ নখে দেখা যাবে। বলাবাহুল্য বাস্তবে আদৌ এ-ধরনের কিছু ঘটে না। শিক্ষাবিস্তারের সাথে সাথে সমাজের এসবের ওপর নির্ভরতা বেশ কমে এসেছে এবং নখদর্পন একটি সাধারণ শব্দে পরিণত হয়েছে (বিশেষ করে শিক্ষিতদের মধ্যে)। কিন্তু প্রাচীনকালে নিজেদের জীবনকে উন্নত করার প্রচেষ্টায় অসহায় ও অসচেতন মানুষ যে-সব পদ্ধতিগুলি ভ্রান্তভাবে অনুসরণ করেছে তার অন্যতম এই 'নখদর্পন' এখনো গ্রামাঞ্চলে, দরিদ্র-অশিক্ষিতদের মধ্যে বেশ চালু রয়েছে (আর তথাকথিত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও এসবের ওপর বিশ্বাস রাখেন)—একইভাবে নলচালান, হাতচালান, কুলোচালান, চালপোড়া, বিষঝাড়া ইত্যাদি হাজারো আগডুম-বাগডুমের রাজত্ব চলছে।

আমার মামার বাড়ি মেদিনীপুর জেলার মহকুমা শহর কাঁথির কাছাকাছি একটি গ্রামে। ছোটবেলায় ওখানে নখদর্পণের একটি ঘটনা দেখেছিলাম। মামাদের প্রতিবেশী জনৈক শ্রী গিরির বাড়িতে চুরি হয়েছিল। চোর বলে একজনকে সন্দেহ করা গেলেও প্রমাণাভাবে তাকে ধরা যাচ্ছিল না। থানার গোয়েন্দাগিরির সাফল্যের ওপর গ্রামের লোকেদের ততটা আস্থা ছিল না, যতটা ছিল ওঝা-গুনিনের ওপর। তাই বেশ কয়েকমাইল দূরের এক গুনিনকে আনানো হয়েছিল নখদর্পণের জন্য। তিনি এসে কিছু পূজা-আর্চ্চা করলেন। তারপর বাড়ির একটি সাত-আট বছরের বাচ্চার ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখে চকচকে আয়নার মতো করে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে দিয়ে নখের দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে বললেন আর নিজে বিড়বিড় করে কিছু মন্ত্রও পড়ে দিলেন। মাঝে একটু খোলা জায়গায় বাচ্চাটি আর ঐ গুনিন—চারপাশে উদ্‌গ্রীব জনতা। গুনিন ফিসফিস করে বাচ্চাটিকে কি জিজ্ঞেস করতে থাকলেন; বাচ্চাটি একসময় জানাল সে একজনকে দেখতে পাচ্ছে। গুনিন চেঁচিয়ে সবাইকে জানালেন, বাচ্চাটি বলছে—সে নখে দেখেছে কিভাবে একজন লোক ঘরের

স্যুটকেশ খুলে চুরি যাওয়া গয়না নিয়ে আবার স্যুটকেশ বন্ধ করে দরজা ভেজিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে চলে গেল এবং ঐ লোকটি আর কেউ নয়, সন্দেহভাজন সেই ব্যক্তিটিই। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটল তাকে ধরার জন্য। দু-এক ঘা মারধোর পড়তেই সে সব স্বীকার করল, গয়না বের করে দিল সুড়সুড় করে। দারোগা চোরকে ধরে নিয়ে গেল। গুনিন পেলেন বেশ কিছু চাল, আলু ইত্যাদি এবং নগদ দশটি টাকা। মেয়েরা তার পায়ের ধুলো নিল। তিনি স্মিতহাস্যে তাদের আশীর্বাদ করলেন। একজন ব্যঙ্গের সুরে আফশোস করে বলল, 'ইস্, আর বছর আমার হালিয়া হারিই যাওয়ার পর একে যদি ডাকতি।' এক বৃদ্ধ তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'আজকালকার ছোকরা! তোর মনে তো বেশ চালাকি। এ সবর আর বিশ্বাস করু নি। দেখলু, কি রকম কঁ্যাক্‌কি চোর ধরি দিলা মন্ত্র পড়িকি।'

না, শুধু চোর নয়, ভূতকেও ধরা যায় নখদর্পণের সাহায্যে। এই গত বছরেরই ঘটনা। ১৯৮১ সালের জুন মাস নাগাদ মেদিনীপুরেরই কালিন্দী গ্রামে বেণীবাবু নামে এক বিজ্ঞান-শিক্ষকের বাড়িতে ভূতের উৎপাত শুরু হয়েছিল। বাড়ির টালির ছাদে যখন তখন ঢিল পড়তো, জিনিসপত্র হারাতো ও রহস্যজনকভাবে ভাঙচুর হোত। বেণীবাবুর ভাইপো, ১২-১৩ বছর বয়সের সন্তোষ নামে ছেলেটি আরো দেখেছে একটি কবন্ধমূর্তি জল গড়িয়ে খাচ্ছে; প্রেতাত্মাটি নাকি তাকে মারধোরও করতো এবং হারানো জিনিসের সন্ধান স্বপ্নেও তাকে জানাতো, আর সন্তোষ সেগুলি খুঁজে বের করতো। এই প্রেতাত্মার কাজ-কর্ম বন্ধ করার জন্য বহু ওঝা-গুনিন একের পর এক এসেছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। এক সময় একজন গুনিনকে ডাকা হলো নখদর্পণ করে ভূতের পরিচয় জানার জন্য। তিনি এসে বেণীবাবুর স্ত্রীর নখে নখদর্পণ করলেন। তেল-সিঁদুরে চকচকে করা মন্ত্রপূত নিজের 'অলৌকিক' নখটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উদ্‌গ্রীব জনতাকে ভদ্রমহিলা জানালেন, তিনি নখে বেণীবাবুর মৃতা বৌদিকে এবং আরো দু-একজন মৃত আত্মীয়-স্বজনকে দেখতে পাচ্ছেন। সন্তুষ্ট গুনিন প্রেতাত্মাকে চিনতে পারার পর তাদের 'বন্ধন' করলেন। অবশ্য শেষ অবধি রহস্যজনক ভূতের উৎপাত এতে বন্ধ হয় নি, রহস্য ফাঁস হয়েছিল অন্যভাবে, কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নখদর্পণের এরকম ঘটনা এখনো ঘটে চলেছে। এতে সাধারণত নারকেল তেলের সাথে সিঁদুর মিশিয়ে মলমের মতো করা হয়—সেটিকে নখে চকচকে করে মাখিয়ে দেওয়া হয়। আয়নার মতো হয়। তারপর মন্ত্র পড়ে,

পূজা-আর্চ্চা করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সেই দর্পণে দৃষ্ট দৃশ্য বর্ণনা করতে বলা হয়। কিন্তু সত্যিই কি কিছু দেখা যায়? যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই ব্যাপারটিকে তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন ব্যাপারটি নিছকই ধাপ্পা অথবা মিথ্যা ও অন্ধবিশ্বাসের ফলশ্রুতি।

যেমন ধরুন প্রথম ঘটনায়। বাচ্চাটি বাড়িতে ঐ সন্দেহভাজন চোরটির কথা শুনেছে; নখদর্পণ করার আগে বাড়ির লোকেদের যোগসাজশে গুনিন হয়তো তাকে এটি আরেকবার মনেও করিয়ে দিয়েছে। নখদর্পণে অন্ধবিশ্বাস গ্রামের এই বাচ্চাটিরও ছিল; এই ভ্রান্তবিশ্বাস (delusion)-এর সাথে গুনিনের সম্মোহনী কথাবার্তা, ঘাড় নিচু করে একদৃষ্টিতে নখের দিকে তাকিয়ে থাকা, চারিপাশে নিশ্চুপ, উদ্‌গ্রীব জনতার দৃষ্টি—সবমিলিয়ে বাচ্চাটির মধ্যে একটি সম্মোহিত অবস্থা আরোপিত হয়ে মতিভ্রম (illusion ও hallucination) সৃষ্টি হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি সম্পর্কে পূর্ব-আরোপিত ধারণার ফলে সে সম্মোহিত অবস্থায় দেখেছে যেন ঐ লোকটি এইভাবে চুরি করলো, পালালো ইত্যাদি। যদি সত্যিই বাচ্চাটির সম্মোহন হয়ে থাকে এবং লোকটিকে নখের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হয়ে থাকে, তবে এটি তার তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামাত্র (subjective experience)—একে যাচাই করা যাবে না এবং ভ্রান্ত হলেও ছেলেটি কিন্তু সরলভাবেই বর্ণনা দিচ্ছে, নিজের 'মনশ্চক্ষের দর্শন' অনুযায়ী সে কিন্তু মিথ্যে কথা বলছে না। যেমন, কেউ কালীঠাকুরের কথা তন্ময় হয়ে বহুক্ষণ ভাবলে অর্থাৎ ধ্যান করলে যদি একসময়ে আত্মসম্মোহিত অবস্থায় দেখে (hallucination) যে আকাশ থেকে কালীঠাকুর নেমে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, খাইয়ে দিল বা বেড়া বেঁধে দিল, তবে এটিও তার নিজস্ব ভ্রান্ত অভিজ্ঞতা এবং এই অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সে সজ্ঞানে মিথ্যে কথা বলছে না। শত রহস্যময় হলেও, তার 'মনশ্চক্ষের এই দর্শন'কে বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এছাড়া এসব ক্ষেত্রে, বাচ্চাটিকে শিখিয়ে দেওয়া থাকতে পারে ঐভাবে সন্দেহভাজন লোকটির কথা বলার জন্য। সন্দেহভাজন সেই গ্রামবাসীটিও নখদর্পণে অন্ধবিশ্বাসী। নখদর্পণের কথ শুনেই তার বুক ধুক ধুক করতে শুরু করেছে, তারপর যখন সে শোনে নখদর্পণে তাকেই দেখা গেছে—তার ওপর দু-এক ঘা মারধোরও খায়—তখন সে সব স্বীকার করে। এইভাবে কেবল সন্দেহের বশে একজনকে চোর সাব্যস্ত করার ঝামেলা থেকে বাড়ির লোকেরা বাঁচে, যেন বড় প্রমাণ মিলে (?) গেল! মাহাত্ম্য বাড়ে নখদর্পণের এবং অবশ্যই গুনিনের অলৌকিক ক্ষমতার।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। বেণীবাবুর স্ত্রী-র মনের মধ্যে আগের থেকেই প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা এবং তার বাড়িতে প্রেতাত্মার উৎপাতের সম্পর্কে ভীতি গেড়ে বসেছিল। এরই ফলে একদৃষ্টিতে নখের দিকে তাকিয়ে সমাগত উৎকণ্ঠিত জনতা ও গুনিনের সামনে তারও সম্মোহন ঘটেছে। আবার তিনি সবাইকে নিরাশ না করার জন্য ইচ্ছে করে সচেতনভাবেও বলে থাকতে পারেন। বেণীবাবুর মৃতা বৌদি ও অন্যান্য দু-একজন মৃত আত্মীয়ের কথা তার জানা ছিল ; যেন এদেরই অর্থাৎ এদের প্রেতাত্মাদেরই দেখা যাচ্ছে বলে তিনি জানালেন। আত্মা-প্রেতাত্মার অস্তিত্ব যখন নেই, তাদের দেখা পাওয়া, তাদের উৎপাত বা ভূতের ভয় ইত্যাদিও অসম্ভব। এবং সত্যি কথা বলতে কি, পরে পুরো ঘটনার বিশ্লেষণ করে স্থির নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, অস্তিত্ব-হীন কোন প্রেতাত্মা নয়, বেণীবাবুর ভাইপো সন্তোষই ঐ সব 'উৎপাত' করেছে। কেবলমাত্র সন্তোষই কবন্ধমূর্তি দেখেছে, স্বপ্নে হারান জিনিস খুঁজে পেয়েছে, সেই প্রেতাত্মা নাকি শুধু তাকেই মারধোর করেছে ইত্যাদি ব্যাপার লক্ষণীয়। আর শেষ অব্দি সন্তোষকে বহুদূরে উড়িষ্যায় পাঠিয়ে দেওয়ার পরই সব 'উৎপাত' বন্ধ হয়ে গেছিল। ওখানে ওদের চাষের জমি আছে, পড়াশুনারও খুব একটা বালাই নেই। হয় মানসিক কোন অস্বাভাবিকত্বের জন্য অথবা বেণীবাবুর বাড়িতে শাসন, পড়াশুনা ইত্যাদি থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে সে এসব করেছে। এই ধরনের ছেলেমেয়েদের বলা হয় পোল্টারজিষ্ট।

যাই হোক, চোর বা ভূত যার জন্যই হোক না কেন, নখদর্পণের সাহায্যে কাউকে সর্বদর্শী করে দেওয়া যায়—এটি একেবারেই অসম্ভব। যদি কিছু ঘটে তা হয় সম্মোহনের ফলে। সাধারণত বাচ্চা ও মহিলাদের ওপর এটি করা হয়ে থাকে, কারণ সাধারণভাবে এরা কল্পনাপ্রবণ বেশি, সহজে এদের প্রভাবিত ও সম্মোহিত করা যায়, অনেক ক্ষেত্রে আবার সম্মোহনের ব্যাপারই থাকে না, থাকে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাজানো কৌশল। যেমন কোন লোকের ওপর হয়তো ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে, রাগ আছে ; একজনকে দিয়ে নখদর্পণ করিয়ে সেই ব্যক্তিকে চোর অপবাদ দেওয়া কঠিন কিছু নয়। এভাবে নখদর্পণে বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নির্দোষ লোককে দোষী প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র গ্রামাঞ্চলে এখনো চলে।

যে কোন পাঠকই নারকেল তেল ও সিঁদুর (কোন কোন অঞ্চলে কিছুটা পরিবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়) মলমের মতো করে নিজের নখে চকচকে আয়নার মতো করে মাখিয়ে দেখতে পারেন, এতে নিজেরই মুখ ও আশপাশের

জিনিসপত্র, গাছপালার বিকৃত ছায়া পড়ে (কারণ নখ সাধারণত উত্তল [convex] আয়নার মতো কাজ করে)। দীর্ঘক্ষণ এটির দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিবিভ্রমও (visual illusion) ঘটতে পারে। বেণীবাবুর স্ত্রী এ-কারণেও নিজের ঘোমটাপরা মুখের ছায়াকে বেণীবাবুর মৃতা বৌদি বলে ভেবে থাকতে পারেন।

নখদর্পণের বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি নেই। তাই এ-ধরনের আরো কিছু ভ্রান্ত সংস্কারের মতো মিছিমিছি এর পিছনে ছুটে অর্থব্যয়, হয়রানি ইত্যাদি করা উচিত নয়; আরও উচিত নয় এরকম অন্ধবিশ্বাসের বশে নিজেকে দুর্বল বিভ্রান্ত করা। দু-একটি ক্ষেত্রে চোর ধরা পড়ে—সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি চাপে পড়ে এবং নখদর্পণের দৈব ক্ষমতার ভয়ে দোষ স্বীকার করে নেওয়ার জন্যই এটা ঘটে। কিন্তু এরকম একটি-দুটি সাফল্যের ঘটনাই অজস্র অসাফল্যকে ছাপিয়ে প্রচার লাভ করে; ব্যর্থতাকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা আমাদের সকলেরই রয়েছে।

* * *

লেখাটিতে illusion, hallucination ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ-সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু তথ্য দেওয়া হলো। কোন বস্তুকে দেখে ভিন্নতর ও ভ্রান্ত ধারণা হলে তাকে illusion বলা হয়। যেমন দড়িকে দেখে সাপ, নখদর্পণে নিজের বা গাছের ছায়াকে দেখে ভূত বা চোর মনে হওয়া, কোন বাচ্চাকে দেখে কৃষ্ণঠাকুর ভাবা ইত্যাদি। আর কোন কিছু না দেখেই অস্তিত্বহীন কোন কিছুর ব্যাপারে ধারণা করে নিলে তাকে বলা হয় hallucination। যেমন কিছুই নেই কিন্তু মেঝেতে যেন সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে, আকাশ থেকে কালীঠাকুর নেমে এল বা ভূতে তাড়া করেছে; নখদর্পণে কিছুই হয়তো দেখা যাচ্ছে না তবু যেন কেউ নড়ছে বা কোন ভূত দেখা যাচ্ছে ইত্যাদি। সবই মনের ভুল। মনস্তাত্ত্বিক বিক্ষেপ। এছাড়া বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণাকে বলা হয় delusion। যেমন নখদর্পণের অলৌকিক ক্ষমতায় সবকিছু দেখা যায়, মন্ত্রবলে দড়িকে সাপ করে দেওয়া যায়, ঠাকুর-দেবতা-ভূতপ্রেত আছেই—ইত্যাকার ধারণা।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপর ভিত্তি করে illusion ও hallucination আবার পাঁচ ধরনের হতে পারে:

এক, দৃষ্টি সংক্রান্ত (visual): নখের মধ্যে নিজের ছায়াকে ভূত ভাবা বা কিছু না দেখেই চোর দেখা; চাঁদনী রাতে গাছে ঝুলন্ত ছেঁড়া ন্যাকড়া দেখে পেত্নি ভাবা বা কিছুই নেই তবু ভূত দেখা ইত্যাদি;

দুই, শ্রবণসংক্রান্ত (auditory) : গাছের ফাঁকে বাতাসের শব্দকে ভূতের আওয়াজ, বা কোন আওয়াজ নেই তবু দৈববাণী শোনা ইত্যাদি ;
তিন, ঘ্রাণসংক্রান্ত (olfactory) : জঙ্গলে ফুলের গন্ধকে পারিজাত বা ধূপধুনোর গন্ধ মনে করা, অথবা কিছুই নেই তবু ভূতের আঁশটে গন্ধ পাওয়া ইত্যাদি ;
চার, স্পর্শসংক্রান্ত (tactile) : গায়ে বাতাস বা গাছপালার ছোঁয়াকে ভূতের স্পর্শ, অথবা কিছুই হয় নি, তবু মনে হলো ঠাকুরে ছুঁয়ে দিল ইত্যাদি ;
পাঁচ, স্বাদসংক্রান্ত (lingual) : সাধারণ চালকলার প্রসাদকে অমৃত মনে করা অথবা ঘুমের মধ্যে ঠাকুর প্রসাদ খাইয়ে দিল মনে হওয়া ইত্যাদি।

এগুলি সবই মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক ক্রিয়ার ফল। বিদ্যুতের সাহায্যে মস্তিষ্কের বিশেষ কোন অংশকে উত্তেজিত করে (physical stimulus) ; এল-এস-ডি, গাঁজা, চরস ইত্যাদির প্রভাবে (chemical stimulus) ; ক্রমান্বয়ে মন্ত্রোচ্চারণ, গভীরভাবে কোনকিছু ভাবা বা ধ্যান, সম্মোহন ও আত্ম-সম্মোহনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ইত্যাদির সাহায্যে (psychological stimulus) ; জন্মগত কিছু রোগে মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না, থায়ামিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড ইত্যাদি, ভিটামিনের অভাব, প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের রোগ, স্কিজোফ্রেনিয়া জাতীয় মানসিক রোগ ইত্যাদি নানা জৈব (biological) কারণে নানা ধরনের illusion ও hallucination-এর সৃষ্টি হয়। ভূত-প্রেত-দেব-দেবী পুনর্জন্ম ইত্যাদি সম্পর্কিত হাজারো মিথ্যে বিশ্বাসের (delusion) সাথে মিলে এগুলিকে বিশেষ বিশেষ রূপ দেয়। বাস্তবে এসবের কোন ভিত্তি না থাকলেও ব্যক্তিগত অস্বাভাবিক ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা (abnormal subjective experience) থেকে কেউ কেউ বিশ্বাস যোগ্যভাবে এ-সবের বর্ণনা করে। আর এইসব আপাত-আকর্ষণীয় বর্ণনার ওপর ভিত্তি করেই সাধারণ মানুষের মনে অলৌকিক অতিপ্রাকৃত-অতীন্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্বের ধারণাগুলি গড়ে ওঠে।

ভবানীপ্রসাদ সাহু

সেপ্টেম্বর ১৯৮২

অলৌকিক পদ্ধতিতে চোর ধরা

গ্রামে-গঞ্জে তো বটেই এমনকি শহরেও অলৌকিক বা দৈবশক্তি যা-ই বলি না কেন, এর ওপর নির্ভর করে বেশ কিছু লোক এখনও তাদের জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক মন কিছুতেই এই ধরনের বুজরুকি বা ভাঁওতাবাজিতে সায় দিতে চায় না। এই ধরনের একটি মন নিয়ে আমি এমনই একটি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি যার উল্লেখ না করে পারছি না। গ্রামের দিকে 'বাটিচালা' 'নলচালা' বা 'থালাবসানো' ইত্যাদি বহু অলৌকিক পদ্ধতিতে চোর ধরা হয়। আমার দেখা ঘটনাটি এই 'বাটিচালা' নামক একটি পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেই।

গত ২৩ অক্টোবর '৮৩-তে আমি সন্ধ্যে ৮টার সময় ক্লাব থেকে বাড়ি ফেরার পথে থানার মাঠে দেখলাম প্রচুর লোকজন জমা হয়েছে। শুনলাম থানার ও সি-র কাছ থেকে কিছু জিনিসপত্র কয়েকদিন আগে চুরি হয়েছে। এবং সেই চোর ধরার জন্য তিনি 'বাটিচালা' নিয়ে এসেছেন। এগিয়ে গেলাম ও সি-র বাড়ির ভেতরে যেখানে আসল কাজকর্মটি চলছে। ৩০-৩২ জন লোকের মাঝখানে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। তিনি মাঝে মাঝেই মন্ত্র আওড়াচ্ছেন ও ফুঁ দিচ্ছেন। তার সামনে একজন একটি ছোটো কাঁসার বাটি মাটিতে উপুড় করে হাতের তালু দিয়ে চেপে আছে। পাশে একজন বসেছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন যে, ঐ বাটিটা মন্ত্রের দ্বারা এগিয়ে চলবে এবং যে কেউ একজন শুধু ওটা আলতোভাবে ধরে থাকবে। বাটি প্রথমে যাবে যেখানে চুরি যাওয়া মালপত্র-গুলো আছে সেখানে এবং পরে যে চোর তার পায়ের ওপরে বা বুকের ওপরে গিয়ে চেপে বসবে। শোনামাত্রই, এর শেষ দেখে যাব বলে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ওস্তাদ সমানে মন্ত্র দিয়ে চলেছেন। অবশেষে বাটি নড়ে উঠল এবং লোকটির হাত কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে একটা 'নড়েছে, নড়েছে' বলে ছোট কলরব শোনা গেল। কিন্তু বাটি আর চলছে না, শুধু মাঝে মাঝে নড়ছে। আধ ঘন্টা এভাবে কেটে গেল। ওস্তাদ বললেন 'সবার হাতে বাটি চলে না। যে প্রথমে বাটি ধরেছিল তাকেই বাটিটা ধরতে হবে।' এই 'যে প্রথমে বাটি ধরেছিল'

ব্যাপারটা আমি প্রথমে জানতাম না। ঘটনাটা শুরু হয়েছিল সন্ধ্যে ৬ টায়। তখন একজন নাকি বাটি ধরেছিল এবং বাটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় ২০০ গজ মতো গিয়ে একটা পাকা রাস্তায় উঠে পুনরায় একই পথে একই জায়গায় ফিরে এসে আর নড়ছিল না। প্রথম ছেলেটি কিন্তু রাজি হল না। সে নাকি ভয় পেয়ে গেছে এই কারণে যে, চোর ধরা পড়ে গেলে তারই ওপর প্রতিশোধ নেবে। অনেকে তাকে সাহস ও ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও সে রাজি হলো না। তখন এ ওকে, সে তাকে বাটি ধরার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। কেউই ঠিক সাহসভরে এগিয়ে যেতে চাইল না। এই অবস্থায় পাশাপাশি কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমিই ওস্তাদজীকে বললাম যে, আমি বাটি ধরতে রাজি আছি। তিনি আবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, 'সবার হাতে বাটি চলে না।' স্বভাবতই প্রশ্ন করলাম, 'কার হাতে চলবে?' 'যাদের হাল্কা রাশি?' আমি বললাম, 'আমার তুলা রাশি—এটা ভারি না হাল্কা?' 'এটা হাল্কা।' (জানি না হাল্কা রাশির সংজ্ঞা কি, তবে যেহেতু রাশির নাম 'তুলা' এবং 'তুলা' হাল্কা সেহেতু এ রাশি 'হাল্কা' হতেই পারে।) সুতরাং আমার চলতেই পারে। কিন্তু না—আমি প্যান্ট পরে ছিলাম। প্যান্ট পরে থাকলে দৈবশক্তি নাকি তার ওপরে কাজ করতে পারে না। যদিও মনে মনে রেগে উঠলাম তবুও সেটা চাপা রেখেই 'বাড়ি থেকে লুঙ্গি পরে আসব' এই প্রস্তাব দিলাম। জানি না ওস্তাদ আমার শরীরে কি দেখলেন। তিনি আর আমাকে নির্বাচনই করলেন না। ওস্তাদ বললেন, 'ঠিক আছে অন্য কারোর দরকার নেই, আমিই বাটি ধরব।' চারিদিক থেকে 'বাহবা' ধ্বনি উঠল। থানার পুলিশেরা ওস্তাদকে এই বলে উৎসাহ দিলেন, 'আপনি বাটি চালান। চোরকে খালি আমাদের হাতে তুলে দিন। আপনাকে ফুলের মালা দিয়ে পুজো করব, বকশিস দেব' ইত্যাদি। যাই হোক, ওস্তাদ একটু নড়েচড়ে বসলেন ও শুরু করলেন তার মন্ত্রজপ এবং বাটিচালনা। বাটি চলতে শুরু করেছে, সকলের মনে প্রচণ্ড আনন্দ ও উৎসাহ। এই সময় আমি যে লোকটি প্রথমে বাটি ধরেছিল তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

আপনার বাড়ি কোথায়?

কদমডিহায়।

আপনি ওস্তাদকে চেনেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের একই পাড়ায় বাড়ি।

এর আগে কখনো বাটি ধরেছেন?

হ্যাঁ, মাঝে মাঝেই ওস্তাদের সাথে যাই।

বাটি যখন চলে তখন আপনি কি করেন ?

আমি শুধু আলগা করে ধরে থাকি আর বাটির সঙ্গে সঙ্গে চলি।

আচ্ছা বাটি কখনো ঝোপঝাড়, নালা-নর্দমার মধ্যে গেছে ?

আমি ওসব জানি না। সব ওস্তাদ জানে।

তার সাথে আর বেশি কথা বলার সুযোগ পাই নি। ফিরে এলাম আসল জায়গায়। বাটি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। ওস্তাদ বললেন বাটি নাকি তার হাত টেনে চালিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু তিনি বাটির সঙ্গে পেরে উঠছেন না। আস্তে আস্তে বাটি তুলসীমঞ্চ ছেড়ে বাড়ির বারান্দায় উঠেছে। সেখান থেকে দরজার গায়ের দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠতে চাইছে। ওস্তাদ বললেন, 'দেখুন তো ছাদের ওপরে জিনিসপত্রগুলো আছে কি-না ?' একজন পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের সিঁড়ি খাটিয়ে ওপরে উঠলেন এবং মুহূর্তমধ্যেই হতাশ হয়ে নেমে এসে জানালেন যে, ওপরে কোনো জিনিসপত্র নেই। বাটি এদিকে সেখান থেকে নেমে বাড়ির একটা ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। সেখানে অনেকেই বসে রয়েছেন। বাটি অনেকের পায়ের কাছে গিয়ে কাঁপছে। দু-একজন তো ভয়ই পেয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুই হলো না। বাটি একই গতিতে ঘর ছেড়ে নেমে এল মাঠে। ওস্তাদ কখনো হাঁটুমুড়ে কখনো হাঁটু গেড়ে বসে এগিয়ে চলেছেন বাটি ধরে। পিছনে জনা চল্লিশেক লোক। বাটির চলার গতি ৫ মিনিটে ১ ফুট। আমি এই ফাঁকে বাড়ি গিয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে লুঙ্গি পরে এসেছি। এসে দেখি, বাটি আস্তে আস্তে একটা দু-দিকে ঘাসে ঢাকা সরু রাস্তা ছেড়ে নর্দমার পাশে পাশে চলেছে। একজন পুলিশ বাটির আগে হ্যারিকেন নিয়ে চলেছেন একই গতিতে। ওস্তাদ বললেন, 'চোর এই রাস্তা দিয়েই গেছে।' বাটি মাঝে মাঝে এমনভাবে কেঁপে উঠছে যে, তাতে বেশ কিছু লোক দৈবশক্তি ও ওস্তাদ উভয়ের প্রতি ধন্য ধন্য করে উঠছে, সমানে ওস্তাদকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে। বাটি এদিকে নর্দমা ছেড়ে ঘাসের মধ্য দিয়ে একটা পায়খানাকে বেড় দিয়ে একটা নোংরা গর্তে এসে পড়েছে। তার নির্দেশমতো গর্তটি খোঁড়া হলো। চুরি যাওয়া জিনিসপত্র নাকি সেখানেও কেউ পুঁতে রাখতে পারে। কিন্তু পাওয়া গেল না। আবার বাটি একটা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে চায়। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে মিনিট কয়েকের মধ্যেই রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। বাটি কিন্তু যেপথে এসেছিল সেই নর্দমার পাশ দিয়ে 'ব্যাক' করে চলেছে। ভদ্রলোক মাঝে মাঝেই কিছু কথা বলে চলেছেন, যেমন 'এটা তিনদিনও লাগতে পারে—কারণ, চোর যতদূর পর্যন্ত গেছে বাটি সেই রাস্তা ধরে ততদূর পর্যন্ত যেতে পারে। চুরি হওয়ার দু-এক-দিনের

মধ্যে বললে ভালো হতো', ইত্যাদি সব। এতে কিছু লোক আশাহত হয়ে সরে পড়লেও বেশ কিছু লোক তখনও উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। আমি কিন্তু অধৈর্য্য হয়ে পড়ছিলাম। মাঝে মাঝে আমার মনেও কিন্তু সংশয়ের উদয় হচ্ছিল, ব্যাপারটা কি করে হচ্ছে। বাটি এইভাবে চলতে চলতে অবশেষে একটা বড় রাস্তায় এসে পড়েছে। রাস্তার সামনেই ডানদিকে দু-খানা বাড়ি। ওস্তাদ পুলিশ-দের বললেন, 'কাল সকালে এই দুটো বাড়িতে একটু সার্চ করবেন।' ব্যাপারটা আমার খুব একটা ভালো লাগল না। এদিকে বাটি সমানে নড়ে চলেছে ও ওস্তাদের হাতও কেঁপে চলেছে। লোক-জনের ভিড় আগের থেকে আরও বেড়েছে। ওস্তাদ এই অল্প শীতের রাত্রিতেও ঘেমে একেবারে চান করে ফেলেছেন। চোখমুখ লাল, চুলগুলো অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনেকে বললেন, ঠাকুর ওস্তাদের ওপর ভর করেছে। এই অবস্থায় তিনি বাটি ছেড়ে দিলেন এবং অন্য কাউকে বাটি ধরার জন্য চাইলেন। আমি এবার সাহসভরে এগিয়ে গেলাম, অনেকের উৎসাহও পেলাম। আমার হাতের ঘড়ি, চোখের চশমা ও পায়ের চটি তার নির্দেশ মতো খুলতে হলো। বাটির ওপরে আলতোভাবে হাত রাখলাম। ওস্তাদ কানের কাছে মন্ত্র আওড়ানো শুরু করলেন। এত কাছাকাছি এর আগে আসতে পারি নি। এতক্ষণে বুঝলাম মন্ত্রটা কি। আশ্চর্য্য? 'সরস্বতী-স্তোত্রম্!' ওদিকে আমার হাতের নিচে বাটি স্থির, কোনো নড়াচড়া নেই। তখন ওস্তাদের মুখ থেকে শোনা গেল, তার নাকি কোনো শত্রু এখানে উপস্থিত আছেন, যিনি মন্ত্রের বলে বাটিকে চালাতে দিচ্ছেন না। সকলে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তাহলে উপায়? উপায় বলে দিলেন ওস্তাদ নিজেই, 'আজ থাক, অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, কাল সকাল থেকে আবার শুরু করব।' আমি চেপে ধরলাম, 'না, যা করবার আজকেই করুন, তাতে যত রাত হয় হবে!' সকলেই আমার কথায় সায় দিয়ে উঠলেন। ঠিক আছে, উপায় আরও আছে। মনসামন্দিরে সকলের হাত রাখতে হবে। ওস্তাদ হাত দেখে ঠিক করবেন কার হাত চলবে। অবশ্যই আমি হাত রাখার সুযোগ পেলাম না। অনেকে হাত রাখলেন। ওস্তাদ এমন একজনের হাত নির্বাচন করলেন যিনি অনেকক্ষণ ধরে ওস্তাদকে আন্তরিক উৎসাহ জানাচ্ছিলেন। ঐ ভদ্রলোকই বাটি ধরলেন। শুরু হলো আবার মন্ত্রপড়া। বাটি আর নড়ে না। মন্ত্রের পর মন্ত্র চলছে। ওস্তাদ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন মন্ত্র বলতে বলতে। মন্ত্র শেষ হয়ে গেল। তখনি হঠাৎ করে আবার বাটি চলতে শুরু করল, একই কাঁপানো ভঙ্গিতে। সকলে হাততালি দিয়ে উঠল। ওস্তাদও আনন্দে নড়েচড়ে বসলেন ও আশ্বাসবাণী দিলেন

যে, চোর তিনি ধরবেনই। কিন্তু একি? হঠাৎ দেখি ভদ্রলোক বাটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। প্রচণ্ড রাগে তিনি গালাগালি দিয়ে বলতে লাগলেন, 'সমস্ত লোকঠকানো ফাঁকিবাজি। বাটি চলে না হাতি। আমি নিজেই বাটিটা ঠেলে চালিয়েছি, তাতেই সবাই বাহবা দিচ্ছে।'...আমি এরকমই একটা কিছুর আশঙ্কা করেছিলাম। ভদ্রলোক কিন্তু কিছুতেই শান্ত হতে পারছিলেন না। ওস্তাদকে চড়চাপড় মারতে উদ্যত হলেন। হৈ-হৈ ব্যাপার। পরের ঘটনাটা আর না বলাই বোধহয় ভালো। তবে ওস্তাদের কাছ থেকে এটুকু স্বীকৃতি সকলের সামনে আদায় করা গেছে যে, এগুলো সব মিথ্যে। এধরনের ভাঁওতাবাজি তিনি আর কখনো করবেন না।

সুকমল বিষয়ী

জানুয়ারি ১৯৮৪

প্ল্যানচেট

কয়েকবছর আগেকার কথা। পার্ট-টু পরীক্ষার আগে লম্বা ছুটি। হস্টেলের বেশিরভাগ মেয়েরাই বাড়ি চলে গেছে। আমরা কয়েকজন পড়াশুনা করব বলে থেকে গেছি। একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম প্ল্যানচেট করব। ঘরের মেঝেতে খড়ি দিয়ে একটা বৃত্ত এঁকে বৃত্তের ভেতরের দিকে A থেকে Z পর্যন্ত এবং YES, NO, GOOD, BAD এই চারটি শব্দ লেখা হলো। বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে আর একটা ছোটো বৃত্ত এঁকে তার মধ্যে একটা ছোট তিনপায়া ধূপদানি বসানো হলো। প্রথমে ভাবা হয়েছিল প্ল্যানচেটে বসতে সবাই খুব আগ্রহী হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যে-দু-জনের পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল, তারা বাদে আনকোরাদের মধ্যে থেকে একমাত্র আমিই নিমরাজি হলাম।

ঘরের আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে শুধুমাত্র একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে, আমরা তিনজনে হাত টানটান করে বৃত্তের বাইরে বসে শুধু তর্জনী দিয়ে ধূপদানি ছুঁয়ে আত্মার আরাধনা শুরু করলাম। তিন সাহসীকে ঘিরে আমাদের বাকি বন্ধুর দল।

পূর্ব-সিদ্ধান্ত মতো আমরা কলেজের হরি বেয়ারাকে বেছে নিয়েছিলাম, যে দু-মাস আগে মারা গিয়েছিল। একমনে হরির নীল সার্ট, সাদা ধুতি এবং ব্রাউন রঙের বুট পরা মূর্তির ধ্যান করছি, এমন সময় আমার ডানপাশের বান্ধবী আমাকে একটু ঠেলা দিয়ে জানিয়ে দিল 'তিনি' এসেছেন। আমার বাঁ-পাশের বান্ধবী বেশ শ্রদ্ধাসহকারে অশরীরীর উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল 'আপনি কি এসেছেন ?' আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম ধূপদানিটা একটু নড়েচড়ে উঠে ধীরে ধীরে YES লেখার দিকে এগিয়ে গেল এবং তারপর মধ্যের গোলটায় ফিরে এল। আমাদের তিনজনের আঙুলই কিন্তু ধূপদানিটার ওপর ছোঁয়ানো আছে। এর পরের প্রশ্ন হলো, 'আপনার নাম কি ?' ধূপদানিটা ধীরে ধীরে এক একটা অক্ষর-এর কাছে গিয়ে হরিপদ দাস নামটা বলে দিল। আমাদেরও আর কোন সন্দেহ রইল না যে, আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। এরপর শুরু হলো প্রশ্নের পালা। প্রশ্ন করার বেলায় কিন্তু কারো কোনো উৎসাহের অভাব দেখা গেল না। প্রথম দিকের প্রশ্নগুলো আমাদের সকলের জানা ঘটনা সম্বন্ধে হলো। যে ঘটনাগুলো হরিপদ দাসের জানার কথা নয়। সঠিক উত্তর পাওয়া গেল। এতে হরিপদ দাসের আত্মার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও দৃঢ় হলো। এরপর শুরু হলো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন। পরীক্ষা সামনে থাকায় স্বভাবতই প্রশ্নগুলো পরীক্ষার ফল নিয়ে হতে থাকল। উত্তরগুলোও মোটামুটি মনঃপূত হলো। যাদের পার্ট ওয়ানে রেজাল্ট ভালো ছিল তাদের ক্ষেত্রে তো ধূপদানিটা তরতর করে 1ST CLASS-এর দিকে এগিয়ে গেল। বর্ডারলাইন কেসগুলোর জন্যে প্রথম শ্রেণীর ভবিষ্যদ্বাণী হলো। এরপর দু-একটা উল্টোপাল্টা প্রশ্নের পর, মেয়েদের হস্টেলের প্রিয় বিষয়—কার কবে বিয়ে হবে এবং কিরকম বর জুটবে—নিয়ে প্রশ্ন আরম্ভ হলো। যারা B.A./B. Sc. পাশ করেই বিয়ে করতে চায় তাদের একবছরের মধ্যেই বিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করছে হরিপদ দাসের আত্মা। আর যারা বিয়ের আগে নিজের কেরিয়ার ঠিক করে নিতে চায় তাদের দেরিতে বিয়ে দিচ্ছে। বরও মনে হলো মোটামুটি সবারই মনোমতো জুটছে, এক-আধজন বাদ দিলে। মনোমতো বললাম এই কারণে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কার কিরকম বর পছন্দ তা আমরা মোটামুটি জানি। মোটের ওপর হরিপদ দাসের আত্মা সেদিন আমাদের সবাইকে উত্তেজিত এবং খুশি করে দিল। যাবার সময় বলা হলো আপনি ধূপদানিটা উল্টে দিয়ে যান। তেপায়া ধূপদানিটা একপাশে একটু কাত হয়ে উল্টে গেল। অতক্ষণ হাত টানটান করে আঙুল দিয়ে ধূপদানি ছুঁয়ে বসে থাকতে থাকতে হাতে ব্যথা করছিল। এরপর দু-তিন দিন প্ল্যানচেট চলল। অন্য আত্মাদেরও ডাকা হয়েছে।

এক আত্মার সঙ্গে অন্য আত্মার উত্তরে ছোটখাট দু-চারটে অমিল থাকলেও মোটের ওপর সবাই একই ধরনের উত্তর দিচ্ছিলেন। যার ফলে প্ল্যানচেট জিনিসটার ওপর আমাদের শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল এবং পড়ার বইয়ের ওপর ভালোবাসা কমছিল।

চতুর্থ দিনে একটা ছোট ঘটনা ঘটল যা প্ল্যানচেট সম্পর্কে খটকা লাগায়। যাদুকর **P. C. Sorcar (Senior)** মারা গিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। তাকে ডাকার প্রস্তাব হলো। আমরা একসঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। যথারীতি ধূপদানি নড়ে উঠল এবং আপনি কে এসেছেন এই প্রশ্নের উত্তর এলো **P C SARKAR**। একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল আপনি কি যাদুসম্রাট পি সি সরকার? উত্তর এলো, **YES**। মেয়েটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আপনার পদবীর বানান তো আপনি **SORCAR** লিখতেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমরা যারা বোর্ডে বসেছিলাম তারা কেউই খেয়াল করি নি যে যাদুসম্রাট **SORCAR** লিখতেন। কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর উত্তর এলো **FUN**। ধীরে ধীরে প্ল্যানচেট সম্পর্কে আমাদের একঘেয়েমি আসে এবং আসর বন্ধ হয়ে যায়।

দিনকয়েক পরে বাড়ি থেকে হস্টেলে ফিরল কয়েকটি মেয়ে। তাদের পীড়াপীড়িতে আমাদের আবার প্ল্যানচেটের আসর বসাতে হয়। আমাকেও বোর্ডে বসতে হয়। সেদিন একদমই বসার ইচ্ছে ছিল না। অনেক কাজ ছিল। প্রথম দিকে কিছুতেই আত্মা আর আসে না। আমি ভাবছিলাম হয়ত আমার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, সেইজন্যই বুঝি 'তিনি' আসছেন না। আমি মনে মনে চাইছিলাম যাতে তাড়াতাড়ি উত্তরগুলো এসে যায়, তাহলে তাড়াতাড়ি আসর ভেঙে যাবে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম সেদিন ধূপদানিটা অত্যধিক তৎপরতার সঙ্গে অক্ষরগুলোর দিকে যাতায়াত করছে। ব্যাপারটা কি হলো? আমি যা ভাবছি তাই হচ্ছে। পরীক্ষা করার জন্যে একটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর—যা সবদিনই এক পেয়েছি—আমি উল্টো ভাবতে শুরু করলাম। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম ধূপদানিটা আমি যে উত্তরটা জোর দিয়ে ভাবছি সেদিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। অন্য সবাই উল্টো উত্তরে হাঁ হয়ে গেল। আমার তখন খট্‌কাটা ভালো পরিমাণ লেগেছে। দু-তিনজন বন্ধুর কাছে মনের সন্দেহটা খুলে বললাম। আমরা কয়েকজনে মিলে ঠিক করলাম ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্ল্যানচেটে বসে আমরা আবিষ্কার করলাম, আমরা যা উত্তর পেতে চাইছি ধূপদানিটা শুধু যে সেইদিকেই যাচ্ছে তা-ই নয়, আমরা তিনজনে যদি তিনরকম চাইছি তো ধূপদানিটা কোনদিকেই যাচ্ছে না। আমরা যদি মনে করছি আত্মা আসে নি, তাহলে আধঘণ্টা বসে থাকলেও ধূপদানি নড়ছে না।

এবার আসল ব্যাপারটা বোঝা গেল। আমরা একাগ্র মনে তন্ময় হয়ে যা চাই তা-ই লেখা হয়ে যায় আমাদেরই আঙুল দিয়ে। প্ল্যানচেটে আত্মা নামানো আর তার সঙ্গে আলাপের ব্যাপারটাতে যদি আমার কোন সংশয় বা প্রশ্ন না থাকে, তবে নিবিষ্ট মনে তে-পায়ায় আঙুল ঠেকিয়ে ধ্যান করতে থাকবো, তখন পারিপার্শ্বিকতা, কি, কেন জাতীয় জিজ্ঞাসা আর মনের মধ্যে কাজ করবে না ; কখন যে আঙুলে চাপ দিচ্ছি ভালো খেয়াল থাকবে না ; নিজের আচ্ছন্ন মনের মধ্যে যে উত্তর আসবে সেটাই আত্মার নামে নিজেই লিখে ফেলব (কার্যত নিজেরই অগোচরে)। তিন বন্ধু একই উত্তর ভাবলে লেখা স্বাভাবিকভাবেই এক হবে, আর তিনজনের ভাবনা পৃথক হলে তিন রকমের চাপ পড়বে ; তাতে ধূপদানি বা প্ল্যানচেট যন্ত্র নড়াচড়া বন্ধ করবে। এটাই হওয়ার কথা, তাই হয়। ওই তেপায়া যন্ত্রগুলো সব সময় নড়বড়ে হয়, অথবা এমন সব ব্যবস্থাই প্ল্যানচেট টেবিলে নেওয়া হয়, যেগুলো সামান্য চাপে নড়ে যায়। আমরা এমনিতে দেখি ভয় পেলে, মনের চাপ বাড়লে, উত্তেজিত হলে, নিবিষ্ট হয়ে কিছু ভাবলে কখন যে হাত বা পা কেঁপে যায় টের পাওয়া যায় না। এমন কি অনেক সময় টের পেলেও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। বিশেষ পরিবেশে এই বিশেষ মানসিক অবস্থাটা অনেক সময় অদ্ভুত-অবাস্তব লাগে। অথচ এটা খুবই বাস্তব—একটু যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে ভাবলেই বোঝা যায়। প্ল্যানচেটে হাত চলা বা লেখা হওয়ার রহস্যটা এখানেই লুকিয়ে থাকে। এরও পরে জেনেছিলাম প্ল্যানচেট টেবিলে অনেকে আবার মিথ্যে তন্ময়তার ভান করে খুশিমতো লিখে দেয়, মুখে বলে আত্মা এসে লিখেছে।

এসব ঘটনার পর থেকেই প্ল্যানচেটের ভূত আমাদের ঘাড় থেকে নেমে যায় এবং প্ল্যানচেট ব্যাপারটা আমাদের হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়ায়।

শম্পা মুখার্জি

জুলাই ১৯৮৪

হাত চালানের রহস্য

কোনো মূল্যবান বস্তু হারালে তাকে খোঁজার জন্য গ্রামে-গঞ্জে হাত-চালানের প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু এই হাত-চালানের রহস্যটি কি? সত্যিই কি হাত-চালানের দ্বারা হারানো-জিনিস অলৌকিকভাবে পাওয়া সম্ভব?

আগে দেখা যাক হাত-চালানের পদ্ধতিটি কি? হাত-চালান দিতে হলে একজন লোককে মাটির ওপর বসিয়ে ডান হাতটা জমির ওপর রাখতে দেওয়া হয়। হাতটা এমনভাবে রাখা হয় যে, সেটি মাটিকে ভিত্তি করে প্রায় ষাট ডিগ্রী একটা কোণ সৃষ্টি করে, আর এমনভাবে লোকটিকে বসতে দেওয়া হয়, যাতে তার ওই হাতের ওপর শরীরের সমস্ত ভার গিয়ে পড়ে। লোকটিকে এই ভঙ্গীতে বসানোর পর হাত-চালানের ওঝা মন্ত্র পড়ে যাবে, আর মন্ত্র পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটির হাত চলতে শুরু করবে। সেই সঙ্গে লোকটিও চলবে। এই চলন্ত হাতটাই নাকি জিনিস খুঁজে বার করে। কখনো কখনো কাকতালীয় পদ্ধতিতে হারানো বস্তু পাওয়াও যায়। কিন্তু যখনই পাওয়া যায় না (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটাই ঘটে) তখন বলা হয় যে, জিনিসটা নাগালের বাইরে চলে গেছে। এমনভাবে নাগালের বাইরে চলে যাওয়া জিনিসের ক্ষেত্রে হাত-চালিত হওয়া লোকটার হাত কোনোখানেই থামবে না, যেতেই থাকবে। কিন্তু হাত ঘষে ঘষে সব জায়গা দিয়ে দীর্ঘকাল চলা তো সম্ভব নয়। তখন বলা হয়ে থাকে যে, হাত দুটো যে-দিক নির্দেশিত করেছে সেই দিকেই জিনিসটি আছে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, সবার নাকি হাত চলে না। 'হাত ওঠা' লোকটির রাশিফল, নক্ষত্র, গোত্র, ইত্যাদির ভিন্নতার জন্যই নাকি সবার হাত চলে না। হাত-চালান পদ্ধতির মস্ত বড় একটা ফাঁক রয়ে গেছে এখানেই।

আমার বাড়ি আসামের বড়পেটায়। একবার আমাদের বাড়িতে কাকীমার সোনার হার খুঁজে পাওয়া গেল না। কাজেই হাত-চালানের ওঝা ডাকা হলো। এবার দরকার হলো হাত ওঠে এমন একজন লোক। আমি হাত-চালানের ব্যাপারটার রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য অনেকদিন থেকেই সুযোগ খুঁজছিলাম।

সুযোগ পেয়ে আমি ওঝাটিকে বললাম যে আমার 'হাত ওঠে।' তিনি আমাকে বসিয়ে মন্ত্র পড়লেন। আমার হাতের ওপর কয়েকটি থাপ্পড় দিলেন। কিন্তু আমার হাত আর চলল না। অবশেষে তিনি হতাশ হয়ে বললেন যে, আমাকে দিয়ে হবে না, আমার নাকি হাত ওঠে না। এরপর অন্য একজন লোকের দ্বারা তিনি পরীক্ষা চালালেন এবং সফলও হলেন। কিন্তু শেষে সচরাচর যা ঘটে তাই ঘটলো। জিনিসটা পাওয়া গেল না। হাত শুধু একটি দিকেরই নির্দেশ করল আর কিছু না। এই ঘটনার পর আমি একাই হাত মাটিতে রেখে মাটির ওপর হাতটা চালিয়ে দেখলাম—যেভাবে ওঝা লোকটিকে বসায় তাতে হাতের ওপর সমস্ত শরীরের চাপ পড়ায় হাতটি চলা বা সামনে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে অনুকূল হয়ে থাকে। ওঝার থাপ্পড় খেয়ে যদি হাতটা একটু নড়ে যায় তাহলে হাতের তলায় এমন এক সুড়সুড়ির মতো লাগে যে মাটির ওপর হাতটা নিজেই ঠেলে দিতে লোকটা বাধ্য হয়। এর সঙ্গে ওই ব্যক্তির মানসিক দুর্বলতা যোগ হয়। ফলে আপনা হতেই সে নিজের হাতটা ঠেলে নিয়ে যায়, আর হাতটাও চলতে থাকে, যেন নিজে থেকেই যাচ্ছে।

এ ঘটনার পর আমি এটিকে আরো জ্বলন্তভাবে প্রমাণ করার জন্য অপেক্ষা করে থাকলাম। সুযোগ একদিন এলো। এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম বেড়াতে। গিয়ে দেখলাম তারা সবাই ব্যস্ত হয়ে কি যেন খুঁজছে। আমি জিজ্ঞেস করলে, তারা বলল যে, তাদের নাকি দুশো টাকা হারিয়েছে। হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি খেলল। আমি বললাম, আমি হাত-চালানের মন্ত্র জানি, যদি কোনো লোক সেখানে থাকে যার আগে কোনদিন 'হাত উঠেছে' সে আসতে পারে। একজন লোক এগিয়ে এলো। আগের ঘটনায় ওঝা আমাকে যেভাবে বসিয়েছিল সেইভাবে আমি লোকটিকে বসিয়ে মন্ত্র পড়ার ভান করে হাতটা একটু ঠেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত চলতে শুরু করল। হাতটা অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন লোকটি আমাকে হাতটা থামিয়ে দিতে অনুরোধ করলো। আবার আমি মন্ত্র পড়ার ভান করলাম আর ওর হাতটা ধরে থামিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার হাত চলা বন্ধ হলো। হারানো টাকাটা যদিও আর পাওয়া গেল না কিন্তু এই পরীক্ষা থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে হাত-চালান ব্যাপারটাই এক ধাপ্পাবাজি, আর এই ধাপ্পাবাজি হাত-ওঠা ব্যক্তির বসার ভঙ্গী ও তার দুর্বল অন্ধবিশ্বাসী মনের ওপর ভিত্তি করে চলে এসেছে।

এ ধরনের অনেক ধাপ্পাবাজি গ্রামে-গ্রামান্তরে আজও প্রচলিত। 'চাল পোড়া' —যে পদ্ধতিতে নাকি চাল পোড়ানোর ধোঁয়াকে অনুসরণ করে চোর ধরা যায়—

ইত্যাদি অনেক অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস আজও ব্যাপক মানুষকে বিভ্রান্ত করে আসছে।

গীতার্থ পাঠক

মার্চ ১৯৮২

বাণ মারা

অজ্ঞতা-অভিসন্ধি-কুসংস্কারের ফসল

'বাণ' কথাটি সংস্কৃত। এর অন্যতম আভিধানিক অর্থ হলো—'তান্ত্রিক মারণমন্ত্র বিশেষ; মন্ত্রপূত শর; অভিচার মন্ত্র' এবং অভিচার কথাটির অর্থ 'অন্যের হিংসাভিপ্রায়ে মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন ও বশীকরণ নামক তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া'। বাণ মারার মধ্যে অন্যের ক্ষতি করার দিকটিই প্রধান এবং এর উৎস হলো তন্ত্রশাস্ত্র। ভারতবর্ষে বৈদিক সভ্যতার পাশাপাশি এই শাস্ত্র বিকশিত হয়েছে।

বাণ মারার মধ্যে যাদুবিদ্যার (magic) প্রভাব স্পষ্ট। অতি আদিমকাল থেকেই প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষ তার সীমিত জ্ঞান নিয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে কিছু কিছু বৈচিত্র্যময় পদ্ধতির আশ্রয় নেয় যার সাহায্যে সে সহজে নিজের নানা সমস্যা, বিপদ-আপদ, বন্য জীবজন্তু ও শত্রু-স্থানীয় মানুষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করত। এই পদ্ধতি-গুলির একটি হলো যাদুবিদ্যা। এর উৎপত্তি ও ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। তবে যাদুবিদ্যার বিভিন্ন ধারার একটি হলো এই বাণ মারা। কিছু মন্ত্র উচ্চারণ বাণ মারার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সাথে কিছু আনুষঙ্গিক আচার অনুষ্ঠান করা হয়। উদ্দেশ্য অন্যদের ভীতি ও সম্ভ্রম আদায় করা অথবা বিরাগভাজন, শত্রুস্থানীয় ব্যক্তির ক্ষতি করা। এটি হলো ধ্বংসাত্মক যাদুবিদ্যা (black magic)।

আদিবাসীদের মধ্যে, গ্রামে অসচেতন ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এর প্রভাব এখনো বিদ্যমান। এই কয়েক বছর আগেও আমাদের (লেখকের) গ্রামে

বাণ মারার অনেক ঘটনা শুনতাম, এখন কমে এসেছে। খুব চালু একটা ছিল বাণ মেরে পিঠে সেদ্ধ হতে না দেওয়া। যার বাড়ির পিঠেকে এইভাবে নষ্ট করা হবে, তার নাম নিয়ে চালের গুঁড়ো দিয়ে (অভাবে আটা বা মাটি) পিঠের মতো একটা তৈরি করা হয়। তার ওপর মন্ত্র পড়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত এর একটা মন্ত্র হলো এইরকম :

আলো ধানের কালো পিঠা,
তিন গাইনে বাণে আটা।
একটা ধানে দুইটা তুষ,
পিঠা তলায় ভুষাভুষ।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, পিঠে কাঁচা থেকে গেলে বাণ মারার কথা বিশ্বাস করেও কিছু টোটকা করে একে কাটান হয়। উনুনের পোড়া মাটি হাঁড়ির ওপর লেপে দিয়ে ও সাথে টুকিটাকি কিছু ব্যবস্থা নিয়ে দেখা যেত পিঠে ঠিক সেদ্ধ হচ্ছে। অর্থাৎ আসলে উনুনের তাপ হাঁড়ির ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে হাঁড়ির ভেতরকার পিঠেতে ঠিকমতো যেত না, তাই পিঠে সেদ্ধ হতো না। মাটি লেপে হাঁড়ির ফাঁক বন্ধ করে পিঠের গায়ে ঠিকমতো তাপ লাগানর পর পিঠে সেদ্ধ, হতো —বাণ মারার গুণ কাটিয়ে নয়।

বাণ মেরে দুগ্ধবতী গাভীর দুধও নাকি শুকিয়ে দেওয়া যায় বা বাঁট থেকে রক্ত ঝরিয়ে দেওয়া যায়। আসলে দুগ্ধবতী গাইটি যদি লালচিতির পাতা খায় বা কেউ শত্রুতা করে তাকে এই পাতা খাইয়ে দেয় তবে এ-ধরনের ব্যাপার ঘটে। আর অপ্রত্যাশিতভাবে দুধ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বা বাঁট থেকে রক্তবর্ণ দুধ বেরুনর মতো অদ্ভুত ঘটনা দেখে বাণ মারার কথাই ভাবা হয়। বাণ মেরে নাকি ফলন্ত গাছের ফলও ঝরিয়ে দেওয়া বা শুকিয়ে দেওয়া যায়। আসলে ব্যাপারটি ঘটে গাছের কোন রোগ হলে, অথবা গাছের গোড়ায় ক্ষার (alkali) জাতীয় কিছু রাসায়নিক পদার্থ শত্রুতা করে ঢেলে দিলে, কিংবা কাকতালীয়ভাবে। গর্ভবতী নারী যাতে আদৌ সন্তান প্রসব না করতে পারে তারজন্যও নাকি বাণ মারা হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারণা রয়েছে যে, কোরাণের কোন একটি সুরাকে (শ্লোক বা ছত্র) উল্টো করে পড়ে এটি করা যায়। খেজুর কাঁটায় মন্ত্র পড়েও এটি নাকি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে আপাত-অদ্ভুত ঘটনার পেছনে থাকে বাস্তব কারণ। অশিক্ষিত দরিদ্রদের মধ্যে এই ধরনের কুসংস্কারের প্রভাব বেশি। আর এইসব সন্তানবতী মহিলাদের অধিকাংশই অপুষ্টিতে ভোগেন। এর ফলে রিকেট জাতীয় রোগ হয়ে যদি কোমরের হাড়ের গঠন ঠিকমতো না হয় তবে বাচ্চাপ্রসবে

অসুবিধে হয়। এছাড়া বাচ্চার বড় মাথা বা বড় চেহারা বা অন্যান্য বাস্তব কারণও থাকতে পারে।

অশিক্ষা, দারিদ্র, অসহায়তার দিকটিই ফুটে ওঠে বারবার যখন নানাবিধ রোগের জন্য অন্ধভাবে বাণ মারাকে দায়ী করে ভয়াবহ ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যায় আমাদের সমাজে। বিশেষত বিভিন্ন আদিবাসীগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক মর্মান্তিক ঘটনা এখনো ঘটে চলেছে। যারা এসব কাজ করে মানুষের ক্ষতি করে বলে ধারণা করা হয় তাদের গুনিন, ডান বা ডাইনী, ভানমতী ইত্যাদি নানা নামে (Sorcerer, Witch, Folksin etc) অভিহিত করা হয় এবং গ্রামের লোকেরা এদের গ্রামছাড়া করে, এমন কি হত্যাও করে। যেহেতু দূর থেকে মন্ত্র পড়ে কারোর ক্ষতি করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির থাকা সম্ভব নয়, তাই এদের ওপর ওই ধরনের অত্যাচারও সম্পূর্ণই মিথ্যা ধারণা-প্রসূত।

১৯৭৮ সালে মালদহ জেলার মোড়গ্রাম অঞ্চলের নাওপাড়া গ্রামে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটে। সাপ্তাহিক 'সানডে' পত্রিকার সহায়তায় জুনিয়র পি সি সরকার এই ঘটনার বিস্তারিত অনুসন্ধান করেন। প্রধান কিস্কু নামে গ্রামের এক শিক্ষকের বাবা মারা যান বছর দুই আগে। তারপরে যেন তাদের 'দুর্ভাগ্য' শুরু হয়। শহরের ডাক্তারের মতে তার বাবার রোগ ছিল যক্ষা। কিন্তু প্রধান ও তার বন্ধুরা এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন। তাদের মতে এটি ছিল রহস্যময় একটি রোগ। কয়েক মাস পরে মারা যায় প্রধানের ভাই। তারপর এক মা ও ছেলে দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগতে থাকে। শিশুটি শুকিয়ে যায়, মায়ের পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রধান ভাবলেন এর পেছনে কোন রহস্যময় শক্তি কাজ করছে, কোন গুনিন বা ডাইনী বাণ মারছে। গ্রামে ছিল ৯০ বছরের এক বৃদ্ধা। তিনি রাত্রে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতেন, দিনের বেলা ঘুমোতেন। হাতে থাকত একটি লাঠি। মাঝে মাঝে নাকি আবার অদৃশ্য হয়ে যেতেন। প্রধান একেই সন্দেহ করলেন। ৪০ বছর বয়স্কা আরেকজন মহিলা নানা ধরনের ম্যাজিক দেখাতেন। একেও সন্দেহ করা হলো। গ্রামে ছিল খেমকা নামে এক জ্যোতিষ-কাম-গুনিন। ৬০ টাকা 'ফি' নিয়ে সব শুনে সে রায় দিল এই দুই মহিলাই বাণ মারছে। তারপর একদিন রাত্রে ঐ দুই মহিলাকে প্রধান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ডেকে পাঠালেন। সরল বিশ্বাসে মহিলারা এসে শুনলেন, তারা নাকি বাণ মেরে মানুষ মারছেন, বাচ্চাকে শুকিয়ে দিচ্ছেন। তাদের কাছে ১২০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ চাওয়া হলো। কিন্তু এতো টাকা তারা দেবেন কোত্থেকে! আর সবচেয়ে বড় কথা ঐ ধরনের বাণ মারার মতো কাজ তারা করেনও নি।

কিন্তু ক্রুদ্ধ প্রধান ও তার সঙ্গীরা এসবে কান দিলো না। কুড়ুল দিয়ে দুই 'ক্ষতিকর' মহিলাকে কেটে ধানক্ষেতে পুঁতে ফেলা হলো। অবশেষে ঐ ঘটনার ১৩ দিন পরে পুলিশ মাটি খুঁড়ে গলে যাওয়া মৃতদেহ দু-টি বের করে।

এ-ঘটনাতেও বাণ মারার কোন ব্যাপারই ছিল না। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু অস্বাভাবিক ঘটনা আদৌ নয়। যে শিশুটিকে বাণ মেরে শুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো বলে প্রধানেরা ভেবেছিলেন, আসলে সে ভুগছিল ভয়াবহ অপুষ্টিতে। হাত-পা কাঠির মতো সরু, মাথাটা বড়ো। এই রুগ্ন অপুষ্টিতে-ভোগা বাচ্চার ছবিও ছাপা হয়েছিলো 'সানডে' পত্রিকায়। যে দুই মহিলাকে সন্দেহ করে হত্যা করা হয়েছে তাদের খাপছাড়া আচরণও অতিপ্রাকৃত কিছু নয়। অনেক বৃদ্ধাই রাত্রে ঘুমোতে পারেন না অথবা স্বপ্নচারিতা (Somnambulism)-এও ভুগতে পারেন। মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও আদৌ কেউ স্বচক্ষে দেখে নি। কুসংস্কার যে কি ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, এদের হত্যার ঘটনাটি তারই একটি দৃষ্টান্ত।

ঐ মালদা জেলাতেই বিনয় রাই নামে এক তরুণের পায়ে মরচে-ধরা একটা লোহার টুকরো বিঁধে যায় মাঠে কাজ করতে করতে। মাঠে-ঘাটে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে তাই প্রথম দিকে পা-টি ফুলে ব্যথা হলেও খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। এছাড়া হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ, প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও মানসিকতা—কোনটিই তার ছিল না। তাই কিছুদিন পরেও যন্ত্রণা যখন উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে তখন এক ওঝা ডাকা হয়। গাছপাতা বেটে চিকিৎসা চলে। কিন্তু এতেও কিছু হয় না। ওঝা পাল্টানো হয়। কিন্তু কোনটিতেই কিছু না হওয়ায় অবশেষে যখন শহরে ডাক্তার দেখানো হলো তখন তিনি বললেন—পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে। পায়ের কিছু অংশ কাটতে হবে। অতএব কিছু টাকারও দরকার। কিন্তু কোথায় টাকা? তারপর আবার পা কাটা, ওরে বাবা! সুতরাং আধুনিক চিকিৎসাকে 'পেন্নাম' জানিয়ে আবার আশ্রয় নেওয়া হলো এক বিখ্যাত ওঝা নাটু চৌধুরীর। উত্তরমুখী নদীর জল, উল্টে যাওয়া নৌকার ভিতরকার জল, আধ কিলো সর্ষে ইত্যাদির সাথে সিঁদুর, মাটি, বিশেষ একটি প্রাণীর মাংস ইত্যাদি মিশিয়ে একটি অত্যদ্ভুত ওষুধ তৈরি করে ঝানু ওঝা নাটু চৌধুরী চিকিৎসা করতে লাগলো। এহেন 'দুর্লভ' ওষুধের সাহায্যে বিখ্যাত সেই ওঝার চিকিৎসাতেও যখন ফল হলো না তখন ধারণা হলো নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন অশুভ শক্তির হাত আছে—হয়তো কেউ বাণ মেরেছে, তাই রোগ সারছে না। এখন ঐ গ্রামেও ছিল এক মহিলা, যার কিছু খাপছাড়া

আচার ব্যবহার ছিল। অতএব সন্দেহ করা হলো একেই। ব্যাপারটা জানতে পেরে সে কৌশলে পালিয়ে যায়, কারণ মোড়গ্রামে দুই মহিলাকে কেটে ফেলার খবরটা সে শুনেছিল। সে পালিয়ে যাওয়াতে বিনয় রাই-এর এই ধারণাই বদ্ধমূল হলো যে, সে-ই দোষী, সে বেটিই বাণ মেরে পালিয়েছে। ঘটনাচক্রে ঐ সময় জুনিয়র পি সি সরকার মহাশয় বিনয় রাই-দের সাথে দেখা করেন। ওঝা নাটু চৌধুরীর সাথে কথা বললে সে শেষপর্যন্ত রোগটিকে বলে কুষ্ঠ কিন্তু তার চিকিৎসার কোন ব্যাখ্যাই সে দিতে পারে না। সব মিলিয়ে বিনয়রা ওঝার ওপরে আস্থা হারায়। শ্রী সরকার বিনয়ের পা পরীক্ষা করে তাকে বোঝান যে, ব্যাপারটি গ্যাংগ্রিনই; এখনো সময় আছে, উপযুক্ত চিকিৎসা করালে প্রাণটি অন্তত বাঁচবে। শ্রী সরকারের এই চেষ্টা ফলবতী হলো। বিনয় রাই ও তার বাবা শ্রী সরকারকে দেবতাজ্ঞানে প্রণাম করে এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী শেষপর্যন্ত আধুনিক চিকিৎসারই আশ্রয় নেয়।

১৯৮০ সালে কর্ণাটকের গুলবর্গা ও বিদার জেলায় বাণ মারার কিছু ঘটনা ঐ 'সানডে' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। গ্রামের কেউ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে, কোন বাচ্চার হঠাৎ অকালমৃত্যু ঘটলে বা তার খিঁচুনি হতে থাকলে, কেউ হঠাৎ পাগল হয়ে গেলে বা গরুর গায়ে কোন ক্ষতের সৃষ্টি হলে—সব কিছুকেই বাণ মারার ঘটনা বলে ভাবা হয়। আর, একবার গ্রামে এ-ধরনের একটি ধারণা সংক্রামিত হলে তা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকে। ফলে সৃষ্টি হয় **mass hysteria**-র। এবং এ থেকে আরো নতুন ও জটিল রোগ এবং মানসিক অস্বাভাবিকত্বের সৃষ্টি হয়। যেমন ধরুন, কোন গ্রামে বাণ মারার ঘটনা ঘটছে রটে যাবার পরই হয়তো-বা কোন মহিলার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পেলো। আসলে এটি **hysteria**, কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীরা এটিকে বাণ মারার নতুন ঘটনা বলেই ধরে নেয়।

কর্ণাটকের ঐ অঞ্চলের যারা বাণ মারতে ওস্তাদ বলে ধারণা রয়েছে তাদের পুঁথিতে তথাকথিত বাণ মারার নানান পদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া গেছে। যেমন, গ্রামের কোন কবরখানায় সাধারণত রাত ১১টা থেকে ১টার মধ্যে অনুষ্ঠান করা হয়। গুরু বসে একটি মাটির মণ্ডপে, শিষ্যরা তাকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে নিচে বসে; সবাইকে উলঙ্গ থাকতে হয়। কুমকুম ও হলুদ দিয়ে গুরু মণ্ডপের ওপরে একটি আয়তক্ষেত্র আঁকে। তার চার কোণে আঁকা হয় চারটি বৃত্ত। কেন্দ্রের চারপাশে থাকে আরো ৪টি বৃত্ত। আয়তক্ষেত্রের দুই কর্ণও আঁকা হয়। প্রতিটি রেখার ওপরেই ছড়ানো হয় কুমকুম ও হলুদের গুঁড়ো। আয়তক্ষেত্রটির কেন্দ্রস্থলে

রাখা হয় একটি চন্দন কাঠ বা কাপড়ের তৈরি একটি পুতুল। ঐ পুতুলের পা দুটো গুরুর দিকে উঁচিয়ে রেখে তার চোখ, কান, নাভি ও নাকে দেওয়া হয় কুমকুম-হলুদের গুঁড়ো। এবার সর্ষের মতো আকারের এক ধরনের তৈলবীজকে একটি লম্বা ছুঁচ দিয়ে গেঁথে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির যে স্থানে আঘাত করার (বাণ মারা) কথা ভাবা হচ্ছে, পুতুলেরও ঠিক সেইস্থানে চেপে ধরা হয়। (যেমন, উদ্দিষ্ট লোকটিকে স্রেফ অন্ধ করে দেবার কথা ভাবলে, পুতুলটির চোখে ছুঁচ দিয়ে ঐ বীজটিকে চেপে ধরা হয়।) সবশেষে গুরু ও শিষ্যরা মন্ত্র পড়তে থাকে। এই ধরনের একটি মন্ত্র হলো [মন্ত্রোচ্চারণের বিকৃতি হলে সেটি অনিচ্ছাকৃত ও উর্দু ভাষায় লেখকের অজ্ঞতাপ্রসূত—লেখক] :

হরি নারায়ণ নাবদ বন্ধ
ইস ভিকাশ বন্ধ।
জায়গা মৈ হরি নারায়ণ।
গলি আউর গাঁও ঘুমকে আউংগা।
আইয়েঙ্গি গ্রামন
স্থঁত মামা গুরু 'মাসেন্তিগৈ'
হরি নারায়ণ নাবদ বন্ধ
নারায়ণ নারায়ণ ॥

['মাসেন্তিগৈ'-এর অর্থ বাণ মারার ক্ষমতা যার আছে ও যে মন্ত্র পড়ছে।]

এই ধরনের বহু মন্ত্র আছে এবং ৬৪ ধরনের বাণ মারার জন্যে ৬৪ ধরনের পুতুল বা এরকম পদ্ধতি আছে।

কর্ণাটকে পান্তাপুরা অঞ্চলের নিঙ্গাপ্পা নামে এক তরুণের প্রস্রাবের সাথে রক্ত পড়তে থাকে। একেও একটি বাণ মারার ঘটনা বলে মনে করা হয়। বাণ মারার গুণ কাটানোর চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর অবশেষে যখন তাকে ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়, তখন দেখা গেল তার লিঙ্গাবরণীর নিচে একটি বৃত্তাকার ঘা রয়েছে—যা থেকেই ঐ রক্তপাত। তথাকথিত বাণ মারার অন্য সব ধরনের ঘটনাকে এইভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করলেই প্রকৃত সত্য ধরা পড়বে।

বাণ মারার পুতুল বা অনুরূপ বস্তুর (যেমন পিঠের মতো কিছু তৈরি করে তাতে মন্ত্র পড়া) ব্যবহার ছাড়া যার ওপর বাণ মারা হবে তার শরীরের কোন অংশ সংগ্রহ করেও সেটির ওপর মন্ত্র পড়া হয়। যেমন, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নখ, একগাছা চুল, একফোঁটা রক্ত, খানিকটা থুথু ইত্যাদি গোপনে সংগ্রহ করা

হয়। এমনকি তার ছায়ার দিকে তাকিয়েও মন্ত্র পড়ার রীতি চালু আছে। বাণ মেরে বহু বিচিত্রভাবেও অসুস্থ করার প্রচেষ্টাই বহু গোষ্ঠীর মধ্যে চালু আছে। যেমন, আফ্রিকার ডালি রিভার (Daly River) আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ম্যামাকপিক (Mamakpik) নামক বাণ মারার পদ্ধতিতে নাকি কিডনীর চর্বি চুরি করে কোন লোককে অসুস্থ করে মেরে ফেলা যায়।

বলা বাহুল্য, পুতুলের ওপরেই হোক অথবা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নখ-চুল-রক্তই হোক, ঐ সবের ওপর মন্ত্র পড়ে কারোর ক্ষতি করার ঘটনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য কিছুই নেই। কর্ণাটকে নিঙ্গাপ্পার লিঙ্গে ঘা বা মালদাতে বিনয়ের পায়ের গ্যাংগ্রিন—এই জাতীয় নানা রোগকেই অন্ধভাবে বাণ মারার ব্যাপার বলে ভাবা হয়। বাণ মারার অন্যতম যে পদ্ধতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা যে কোন পাঠকই ঐভাবে অনুষ্ঠানাদি করে দেখতে পারেন—অন্য কারোর কোন ক্ষতি করা যাচ্ছে কিনা। তবে পদ্ধতিগুলো এমনই খাপছাড়া ও হাস্যকর যে সাধারণ মানুষ ওসব করতে চাইবেন না। মাঝরাতে শ্মশানে বা কবরখানায় উলঙ্গ হয়ে বসে থাকা কি সুস্থ মানসিকতার কারোর পক্ষে সম্ভব? তাছাড়া যারা বাণ মারতে পারে বলে লোকের ধারণা, তাদের সম্পর্কে এমনই একটি ভীতি গড়ে ওঠে যে, তাদের কোনভাবে ঘাঁটাতে বা রাগিয়ে দিতে কেউ চায় না। ফলে তাদের চ্যালেঞ্জ করার কেউই থাকে না। প্রাচীনকালে পুরোহিত শ্রেণী নিজেদের ঐ ধরনের ক্ষমতার কথা প্রচার করে সাধারণ মানুষের সমীহ ও আনুগত্য আদায় করতো। এখনো কেউ কেউ নিজেদের এই ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করে জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করে—জ্যোতিষী, সাধুবাবা, অবতার ইত্যাদিদের মতো। সর্বোপরি জ্যোতিষী, বাবা, অবতার বা ঈশ্বরে অন্ধবিশ্বাসীর মতো বাণ মারার ঘটনাকেও যাচাই করার মানসিকতাটা সাধারণ মানুষের থাকে না। ফলে শুধুমাত্র ধারণা করে বা প্রচার শুনে ধারাবাহিকভাবে ভীতি চেপে বসে। অথচ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে পূর্বোল্লিখিত লিঙ্গে ঘা, গ্যাংগ্রিন, অপুষ্টি ইত্যাদিকেই দেখতে পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে পিঠে না সেদ্ধ হবার, গরুর দুধ বন্ধ হবার, গাছের ফল শুকিয়ে যাবার এবং বাচ্চা প্রসবে দেরি হবার বাস্তব কারণ।

কর্ণাটকের পাস্তাপুরায় বাণ মারার ক্ষমতা রয়েছে বলে যারা দাবি করে তাদের মধ্যে ভিসান্না, ফকরুদ্দিন, মালাপ্পা (সবাই পুরুষ) ইত্যাদিরা অন্যতম। এদের কেউ প্রকাশ্যে বাণ মারে, কাউকে বা গ্রামবাসীরা সন্দেহের চোখে দেখে। কিন্তু একবার সাংবাদিকরা যখন এদের দু-একজনের সাথে কথা বলেছিলেন, তখন

তারা স্রেফ অস্বীকার করে এবং সবিনয়ে জানায় যে, বাণ মারার বিদ্যে তাদের জানা নেই। এটি ভীতি বা নিজেদের অস্তিত্বহীন ক্ষমতা ধরা পড়ার সম্ভাবনা— উভয়ের জন্যই হতে পারে। স্থানীয় জনৈক পদস্থ তরুণ সরকারি অফিসারের মতে, ঐসব গুনিন ইত্যাদিরা 'আসলে কিছু কিছু ম্যাজিক জানে।' যেমন ধরুন, আপনার চোখের সামনে থেকে হঠাৎ কিছু উধাও করে দিল। সাধারণ ম্যাজিসিয়ানরাও এ-ধরনের কাজ করতে পারে।

অন্যান্য কুসংস্কারের মতো বাণ মারার ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণার মধ্যেও অজ্ঞতাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। অসহায় মানুষ একদিকে যেমন মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে নিজেদের নানান সমস্যার সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা করে, অন্যদিকে শত্রুস্থানীয় ব্যক্তিকে নাকানি-চোবানি খাওয়ানো, শাস্তি দেওয়া বা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অথবা অন্যদের ভীতি ও সম্ভ্রম আদায়ের জন্য ভ্রান্তভাবে এগুলিকে প্রয়োগ করে। অস্তিত্বহীন এই অপশক্তির প্রতি ভীতি থাকার ফলে অনেকে অহেতুক গণরোষের শিকার হয়। ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে জোয়ান অব্ আর্ককে এই ধরনের মন্ত্রে-সিদ্ধা ডাকিনী সন্দেহে ধর্মযাজকেরা পুড়িয়ে মারে। আদিবাসীদের মধ্যে এখনো এইভাবে ডাকিনীদের মেরে ফেলার ঘটনা ঘটে চলেছে। অনেক পুরুষ নিজেদের গুনিন বা মন্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ বাণ মারার ক্ষমতাসম্পন্ন বলে প্রচার করলেও পুরুষপ্রধান সমাজে সাধারণত মহিলাদের ওপরেই আক্রমণ নেমে আসে। অনেক সময় এর সাথে থাকে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার হাতানো বা অন্য কোন হীন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা।

সত্যি কথা বলতে কি, দারিদ্র্যই এইসব কুসংস্কারকে বাঁচিয়ে রাখার রসদ জোগায়। ডাক্তারের ফি জোগাড় করা বা আধুনিক চিকিৎসার ব্যয় বহন করা দরিদ্র মানুষ বা আদিবাসীদের স্বপ্নেরও অতীত। অনেকসময় আবার চিকিৎসারও সুযোগ থাকে না, ফলে সেক্ষেত্রে বাণ মারার মতো অশুভ শক্তিকে দায়ী করে মন্ত্র-তন্ত্র বা ঝাড়ফুঁকের সাহায্যে রোগারোগ্যের চেষ্টা চলে। অন্যদিকে তথাকথিত ডিগ্রীধারী শিক্ষিতরাও যেখানে কোষ্ঠী বিচার, জ্যোতিষবিদ্যা, ঠাকুরের চরণে মানত করা, প্রার্থনা, কীর্তন বা সাধনভজনের সাহায্যে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি বিধান করা (!) ইত্যাদির মতো হাজারো কুসংস্কার ও নানান মিথ্যে বিশ্বাসকে সযত্নে ব্যাঙের আধুলির মতো আঁকড়ে রাখেন তথা প্রশ্রয় দেন, সেখানে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাণ মারার মতো ভিত্তিহীন ঘটনা টিকে থাকাটাও অস্বাভাবিক আদৌ নয়।

এইসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রচার একটি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কিন্তু দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত না হতে পারলে শুধুমাত্র কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারমূলক কাজটা বাণ মারার মতো ঘটনাকে কোনমতেই স্থায়ীভাবে নির্মূল করতে পারবে না। কারণ সেক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে কুসংস্কারের বিস্তার কিছুটা যদি কমেও তো তাকে জিইয়ে রাখার ও পুনরুজ্জীবিত করার সামাজিক শর্ত বহাল তবিয়তে টিকে থাকবে।

সাহায্যকারী বইপত্র :

১. *Sunday* : 17.9.78 এবং 17.8.80

২. *Science & Society in Ancient India* : Debiprasad Chattopadhyay

৩. লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ : আবদুল হাফিজ ; বাংলাদেশ

ভবানীপ্রসাদ সাহু

এপ্রিল ১৯৮৩

বাণ মারার গল্প

সুন্দরবন অঞ্চলের সিংহদুয়ার হচ্ছে ক্যানিং টাউন। এই ক্যানিং-এর পাশের গ্রামে অন্যান্য বছরের মতো গত বছরেও (১৩৮৯) চৈত্র সংক্রান্তির দিন মেলা বসেছিল। মেলার কাছাকাছি ছিল আমার বাড়ি। আমরা তিন বন্ধু মিলে রওনা দিলাম মেলার দিকে। চারটে নাগাদ মেলায় পৌঁছে দেখি চারিদিকে লোকে-লোকারণ্য, মেলার একদিকে চলছে নাচ-গান হৈ-হুল্লোড় আর অন্যদিকে গ্রামের মানুষদের প্রিয় প্রতিযোগিতা কাছি টানাটানি (Tug of war)। আমরা খানিকক্ষণ সেই উপভোগ্য প্রতিযোগিতা দেখে জরুরি কাজ থাকায় শহরের দিকে চলে যাই। রাত আটটার সময় আমরা যখন মেলা প্রাঙ্গণের পাশ কাটিয়ে বাড়ির দিকে চলেছি তখন দেখি বেশ কিছু মানুষ একটি বাড়িতে ঢুকছে, আবার বেশ কিছু মানুষ সেই বাড়ি থেকে বেরিয়েও আসছে। ব্যাপারটা কি ? মেলাতো অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে তবে এত রাত্রে এই মানুষেরা কি সব বলাবলি করতে করতে এগিয়ে চলেছে। ব্যাপারটা জানার জন্য একজন লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম এত রাত্রে এত লোকের আনাগোনা করার কারণটা কি ? সে বলল, 'বাণ মেরেছে' একটি ছেলেকে। আমাদের তৎক্ষণাৎ

জিজ্ঞাসা—কোথায়? কিভাবে? সে তখন পুরো ঘটনাটা বলল :
'কাছি টানাটানির প্রতিযোগিতায় আমাদের দল ফাইনালে উঠেছেল, অনেক দূরের গ্রামের আর একটি দলও ফাইনালে উঠেছেল। যখন দু-টি দল ফাইনাল খেলায় খুব লড়াই করতেছেল—কেউ কাউকেই এক টিপও সরাতে পারতেছেল না। সেইসময় একজন গুনিন আমাদের দলের একজন খেলোয়াড়কে বাণ মারে। বাণ মারার সঙ্গে সঙ্গেই তার শরীর জ্বালা করতে থাকে এবং সে দড়ি ছেড়ে দেয়, যার জন্যি বিপক্ষ দল জিতে যায়। তা নইলি ওই দল আমাদের কাছ থেকে কোন দিনই জিততে পারত না। তবে হ্যাঁ আমরা হাতে নাতে সেই গুনিনটাকে ধরে ফেলেছি। তাকে মোড়লের বাড়ি নিয়ে গিয়ে প্রথমে ভালোভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করে না। তারপর উত্তম-মধ্যম দেওয়া হলো তবুও সে স্বীকার করে না। এরপর আমরা অন্য গ্রাম থেকে গুনিন আনালাম, সে অনেকক্ষণ ধরেই ঝাড়-ফুঁক করল কিন্তু গায়ের জ্বালা বা ফোস্কা কিছুই কমাতে পারল না। তখন সে মন্ত্র চালনা করে জানল যে, প্রথম গুনিনই ওকে "জ্বালা বাণ" মেরেছে এবং মন্ত্র ওর শরীরে আবদ্ধ করে রেখেছে বলে তার মন্ত্রে কোন কাজ হচ্ছে না। কিন্তু ওই গুনিন কিছুই স্বীকার না করায় তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং গুনিনের গ্রামের পঞ্চায়েত মেম্বর এবং আমাদের গ্রামের পঞ্চায়েত মেম্বরকে খবর দেওয়া হয়েছে। তানারা এলি সালিশ্যি-বিচার হওয়ার পর এর একটা হেস্তনেস্ত করা হবে।' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, গায়ের ফোস্কা পড়ার ব্যাপারটা সে নিজের চোখেই দেখেছে, তবে চার-পাঁচটা ফোস্কা সে পিঠের দিকেই দেখেছে শরীরের অন্য কোথাও সে দেখতে পায় নি।

ওই লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আরও দু-জন অল্প বয়সী ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলাম, ঘটনাটার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য। তারা আগের ব্যক্তির মতন একই কথা বলল কিন্তু গায়ে ফোস্কা পড়ার ব্যাপারটা তারা শুনেছে, গায়ে গামছা চাপা থাকার জন্য তারা ফোস্কা দেখতে পায় নি। তবে তারা একটা নতুন খবর দিল— ওই লোকটির মুখ থেকে গ্যাঁজা বার হচ্ছে। এর পর আমরা ভিড় ঠেলে বাড়ির উঠানে পৌছালাম। গিয়ে দেখি বিরাট উঠানের মাঝখানে একটা হারিকেন জ্বলছে। উঠানের দুই দিকে দুই ব্যক্তিকে ঘিরে বিরাট ভিড়। আমরা ভিড় ঠেলে প্রথমে গেলাম ওই 'বাণ-মারা' ছেলেটাকে দেখতে। তখনও পর্যন্ত সে বলে চলেছে—'আমার পেট জ্বলে গেল, আমার গা জ্বলে গেল।' আর অত্যধিক বকবক করার জন্য মুখের দু-পাশ থেকে গ্যাঁজা বার হয়ে শুকিয়ে উঠেছে। গামছা একটা গায়ে দেওয়া। গামছা সরিয়ে গায়ের ওপর টর্চের আলো

ফেললাম। কোথায় 'ফোস্কা'? পিঠের মধ্যে ছোট বড় মিলিয়ে ৪-৫টা গোটা আমরা দেখতে পেলাম। তার খুব কাছ থেকেই তাকে অল্প কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। এরপর আমরা গেলাম ওই গুনিনের কাছে। তার বয়স আনুমানিক বছর ৩৫, দোহারা-চেহারা। সে তো আমাদের দেখেই কেঁদে ফেলল। তাকে সান্তনা দিয়ে তার কাছেই জানতে চাইলাম পুরো ঘটনাটা। তার বক্তব্য অনুযায়ী সে মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানে না, সে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিল এবং নিজের দলের খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করবার জন্য সে মাঝে মাঝে গামছা নাড়ছিল। প্রতিযোগিতা যখন খুব তুঙ্গে সেই সময় বিপক্ষ দলের একজন হঠাৎই বলে উঠল, 'এই মর্দ্দরা (গ্রামের দিকে ভাল চেহারার ব্যক্তিদের বলা হয় মর্দ্দ) আমি আর দড়ি ধরে রাখতে পারছি না, আমার পেট ও সারা শরীর জ্বালা-জ্বালা করছে, তাছাড়া গায়েও আর কোন ক্ষমতা পাচ্ছি না।' এই কথা বলতে বলতেই সে দড়ি ছেড়ে দিল। ফলে তাদের দল বিজয়ী হয়ে গেল। ওই ছেলেটার পাশে দাঁড়িয়েই সে গামছা নাড়ছিল বলে সকলেই তাকে সন্দেহ করল এবং পেছন থেকে ৪-৫ জন এসে তাকে জড়িয়ে ধরল এবং চেঁচাতে লাগল, 'ব্যাটা গুনিনকে হাতে-নাতে ধরেছি, মার শালাকে।' সে কিছু বোঝার আগেই কিল-চড় এসে পড়তে লাগল। তারপর তার এই অবস্থা। তার দলের অন্য খেলোয়াড়দের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে জানাল যে, তারা অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিল এনাদের, কথা কাটাকাটি হতে হতে একসময় মারামারি হওয়ার উপক্রম। কিন্তু তারা সংখ্যায় অল্প থাকায় মারামারি করে নি তবে তারা শাসিয়ে গেছে, গ্রামের থেকে 'মেম্বর' এবং আরও লোকজন এনে এই রাত্রের মধ্যেই একটা বিহিত করবে। তারা এই এসে পড়ল বলে...। এরপর বাড়ির দর্শকদের দিকে তাকিয়ে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম। কারণ সেখানে যেমন অশিক্ষিত গ্রামের লোক ছিল ঠিক তেমনই শহর থেকে আসা লেখাপড়া জানা লোকও ছিল, স্কুলের মাষ্টারমশাই ছিল, আবার 'বামপন্থী' পঞ্চায়েত মেম্বারকেও দেখা গেল। আমরা একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে, একজন যুবককে এবং পঞ্চায়েত মেম্বারকে ডেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে 'গুনিন' সত্যিই কোন মন্ত্র-তন্ত্র জানে না, কাজেই ওকে এক্ষুণি যেন ছেড়ে দেওয়া হয়; আর ওই মদ্যপ অসুস্থ ছেলেটাকে কয়েকটা ডাব এবং কিছু পথ্যের ব্যবস্থা করলেই ওই ছেলেটা ভাল হয়ে যাবে। ওই ছেলেটার ওপর মদের প্রতিক্রিয়া অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে, কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওদের সকলেরই একই বক্তব্য যে ওই লোকটা মিথ্যা কথা বলছে, তারা স্পষ্টতই দেখেছে ওই গুনিনটা তার নিজের দলকে জেতাবার জন্য ওই ছেলেটার গায়ের ওপর দিয়ে

গামছা বুলিয়ে নিয়ে বাণের মন্ত্র চালনা করেছে, আর ঠিক তার পরে পরেই ছেলেটার ওই রকম কাহিল অবস্থা। আমরা জনে জনে তাদের বোঝালাম যে মন্ত্র-তন্ত্রের কোন ক্ষমতাই নেই মানুষের শরীরে প্রভাব ফেলবার মতন। ডাঃ কভুর বহু বৎসর আগেই এইসব গুনিন বা অবতারদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন যে কোন অলৌকিক ক্ষমতার প্রদর্শনকারীকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই এই পুরস্কার জিততে পারে নি। কাজেই আপনারা যে ভ্রান্ত ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং মন্ত্রের যে কোন ক্ষমতাই নেই সেইটা প্রমাণ করবার জন্যই আমরা তিনজন গুনিনকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, 'যে বা যারা "মন্ত্রের-সাহায্যে আমাদের শরীরে কোনরকম প্রভাব ফেলতে পারবে, আমাদের তিন-জনের হাতের তিনটে ঘড়ি তৎক্ষণাৎ তাকে দিয়ে দেব আর যদি কোন প্রভাব ফেলতে না পারে তবে এক্ষুণি ওই "গুনিনটিকে মুক্তি দিতে হবে।" যখন এইসব কথাবার্তা চলছিল তখনও দেখি একজন গুনিন অনবরত ঝাড়ফুঁক করেই চলেছে। যাই হোক তিনজন গুনিনকেই ডেকে তাদের কাছে আমাদের বক্তব্য রাখা হলো। কিন্তু কোন গুনিনই মন্ত্র চালনা করবার জন্য এগিয়ে আসল না, সকলেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ইত্যবসরে অসুস্থ ছেলেটার ক্ষিদে পাওয়াতে খানিকটা ডাবের জল এবং কিছু পথ্যের ব্যবস্থা হয়েছিল। উঠানের চারিদিকেই শুধু গুজগুজ ফুসফুসের আওয়াজ। অনেকেই আবার গুনিনদের উদ্দেশ্যে বিদ্রুপ ছুড়ে দিতে লাগল (খানিকক্ষণ আগেও যারা মন্ত্রে এবং গুনিনে বিশ্বাসী ছিল তারাই)। এইবার বেশিরভাগ মানুষই মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠল। তাদের চিরাচরিত আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগার জন্য মরীয়া হয়ে সেই 'সন্দেহভাজন গুনিন'কে ডেকে আনল আমাদের শরীরের ওপর মন্ত্রের প্রভাব ফেলার জন্য। কিন্তু সে বারবারই বলতে লাগল যে সে এসবের কিছুই জানে না। তবে সে নিজে মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করে। সেই বাড়িতে যে তিনজন গুনিন ছিল তারা আসলে কোন গুনিনই নয় সব ভণ্ড। যাইহোক এই ডামাডোলে সেই 'বাণ মারা' ছেলেটির প্রতি কারোরই বিশেষ একটা নজর ছিল না কিন্তু যখন নজর পড়ল তখন দেখা গেল যে, সে সেই জায়গাতেই মাটির ওপর শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সকলকে আশ্চর্যান্বিত হতে দেখে সমস্ত ব্যাপারটাই তাদের বুঝিয়ে বললাম। সেই ঘটনায় পরে আসছি। এরপর তারা সত্যিই নিজেদের ভুল বুঝতে পারল এবং সেই 'গুনিন' ভদ্রলোকটির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল এবং সেই রাত্রিতে সেই ভদ্রলোক এবং তার দলের খেলোয়াড়দের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করে তার পরের দিন তাদের বীরের সম্মান দিয়ে গ্রামবাসীরা বিদায় জানাল।

চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের মেলা গ্রামের মানুষদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসব। এই বিশেষ দিনে তারা নেশা করে সারাদিনই নাচ-গান-হৈ-হুল্লোড় করে থাকে। দড়ি টানাটানির এই প্রতিযোগিতাটা গ্রামের মানুষদের কাছে একটা সম্মানের লড়াই। তারা প্রায় সকলেই কমবেশি নেশা করে উক্ত প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। দিঘিরপাড় গ্রামের একজন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওই গ্রামেরই একজন নতুন ছেলেকে নেওয়া হয়। উক্ত ছেলেটি বেশি পরিমাণে মদ খেয়েই প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। রৌদ্রের মধ্যে এবং খুব টেনশন-এর জন্যই তার শরীরে আস্তে আস্তে মদের প্রভাবগুলি দেখা যেতে থাকে। খালি পেটে মদ খেলে পেট জ্বালা করে এবং কখনও কখনও সারা শরীরও জ্বালা করে। ঐ ছেলেটির ক্ষেত্রে পেট এবং শরীর অল্প অল্প জ্বালা করছিল এবং শরীর আস্তে আস্তে অবশ হয়ে আসছিল যার জন্য সে দড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। আর মুখে গ্যাঁজা ওঠার ব্যাপার হলো, 'আমার গা জ্বলে গেল, আমার গা জ্বলে গেল' এই কথাগুলি অনবরত বলার জন্য মুখের থুথুগুলি বাইরে বেরিয়ে আসছিল এবং এটাকে গ্রামের লোকেরা বাণ মারার কুফল হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইছিল। গায়ে পিঠে ফোস্কা পড়ার ব্যাপারটা হলো আসলে ছেলেটির পিঠে আগেই ৪/৫টি গোটা ছিল এবং একটি ছোট ফোঁড়াও ছিল, যেটি তখনও পর্যন্ত পুরোপুরি চামড়া ভেদ করে ওঠে নি কিন্তু ফোঁড়ার ওপরের দিকটি বেশ লাল হয়েছিল। যেহেতু উক্ত ছেলেটি এবং গ্রামের লোকেদের ধারণাই হয়ে গিয়েছিল যে বাণ মারার ফলেই গা জ্বালা করছে, অতএব ওই মন্ত্রের বলেই ওর গায়ে ওই রকম গোটা বা ফোস্কা পড়েছে।

বিজন ভট্টাচার্য

জুন ১৯৮৩

ডাইনি-বিশ্বাস : রাঢ়ের আদিবাসী

[সংবাদপত্রে মাঝেমাঝেই এরকম খবর পাওয়া যায় যে, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা মালদা জেলার অমুক গ্রামে ডাইনি সন্দেহে একজনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, কিংবা অন্তঃসত্ত্বা নারীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এ এক বীভৎস নির্মম বাস্তব। ডাইনীবিদ্যা ট্রাইবাল সমাজের এক অতি সুপ্রাচীন বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাস যত প্রাচীনই হোক না কেন, কোন সভ্য মানুষ তা মেনে নিতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যাদের সমাজের লোকেরা আক্রান্ত হন, তাদেরই কেউ কেউ আবার এটিকে তাদের সুপ্রাচীন প্রথা বলে চট করে বিরোধিতা করতে চান না; এই ঘৃণ্য কু-প্রথাটিকেই তারা অনেক সময় নিজেদের বলে আঁকড়ে রাখতে চান। এই মনোভাব যত তাড়াতাড়ি বদলায়, ততই মঙ্গল। বর্তমান রচনাটিতে দেখা যাবে আদিবাসী মানুষের দারিদ্র আর অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে গ্রামের একদল ক্ষমতাশালী লোক কিভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। —স. ম.]

রাঢ়-বাঙলার আদিবাসী আর অন্ত্যজ সমাজের লোকাচারে হিন্দু আর বৌদ্ধ-জৈনের প্রভাব নানাভাবে মিশে আছে। ডাইনিবিদ্যায় এই অঞ্চলের মানুষের যে সুদৃঢ় বিশ্বাস, তা সম্ভবত এই ধারারই ফল। হিন্দু দেবদেবীর পাশাপাশি প্রচলিত ছিল বৌদ্ধ 'আসিনী' আর জৈন 'যক্ষিণী'র পূজা। আসিনী-ডাকিনীরা ছিল দেবতার চরণে নিবেদিত প্রাণ, পূজারিণী বা গুরুর কৃপাসিদ্ধা নারী। সুতরাং ডান-ডাইন-ডাকিনীদের যে রূপের সঙ্গে আজ আমরা পরিচিত, চিরকাল তাদের এ-দশা ছিল না। গোষ্ঠীদেবতার পাশাপাশি 'ডানে'র অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিল, বিশেষত অশুভ শক্তির প্রতিভূ হিসাবে। সে ছিল মন্ত্রশক্তিতে বলীয়ান, করালদর্শনা ভয়ঙ্করী। এই ভীষণ শক্তির কাছে নত হয়েছিল মানুষ। ভীতি থেকে জন্ম নিয়েছিল ভক্তি। আর আজ সেই ভীতি পরিণত হয়েছে ঘৃণায়। ডান আজ ঘৃণার পাত্র। যাবতীয় অকল্যাণ-অমঙ্গলের মূলে আছে সে।

ছোট ছেলে চিকিৎসার অভাবে টিটেনাসে ভুগে মারা গেল, অপুষ্টিতে কেউ ধুঁকছে, কেউ রক্তাল্পতার শিকার, রানীক্ষেত রোগের মড়ক লেগেছে মুরগীর খাঁচায়, খুরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে জরে ঢুলছে গোয়ালের গরু, গর্ভপাত হলো

অল্পবয়সী পোয়াতির—নির্বিচারে দোষ চাপানো হবে গাঁয়ের ব্যক্তি-বিশেষের ওপর। কোন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। দায়িত্ব নেওয়ার কথা না ভাবলেও চলবে। কেবল গাঁয়ের একজনকে 'ডান' বলে সন্দেহ করতে পারলেই, ব্যস। সব সমস্যার সমাধান। শুধু ঘৃণা নয়, চিহ্নিত করা নয়, ডানের কল্পিত রোষ থেকে মুক্তি পেতে তার প্রাণ নিতেও দ্বিধা করে না আদিবাসী অন্ত্যজ সমাজের মানুষ। রাঢ় বাঙলার দূর গ্রাম-গঞ্জ থেকে এরকম খবর মাঝেমাঝেই পাওয়া যায়। কিন্তু এসব ঘটনার পেছনে থাকে আরো গূঢ় কাহিনী। নিচে তিনটি ঘটনার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

বাঁকুড়া জেলায় কদমবেড়ের সিকিম টুডুর বাপ হারাধন টুডু 'ডান'। কোন শিশুর দিকে সে নজর দিলে বাচ্চাটা শুকিয়ে যায়। কারোর দুধেল গাইয়ের দিকে তাকালে বাঁটে রক্ত পড়ে। প্রথম প্রথম এসব ঘটনা ঘটতে থাকলেও লোকে ধরতে পারে না কে আসল লোক। কোলের ছেলে মারা যেতে এক বাড়িতে ওঝা আসে। ব্যবস্থা হয় তেল-পড়ার। কাঁঠাল পাতায় তেল কালি মাখিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে মন্ত্র পড়তেই ওঝা বুঝতে পারে এবারকার "ডান' একজন পুরুষ। সন্তানহারা মায়ের মনস্তুতির জন্য ওঝার পরামর্শে বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা হয় তিন রাস্তার মোড়ে। তার ঝোলা থেকে বেরোয় শেকড়-বাকড়, জড়ি-বুটি। মঙ্গলের জন্যে দেওয়া হয় মুরগী বলি। মাঝখান থেকে বিস্তর টাকা ব্যয় হয় দুঃস্থ পরিবারটির। যাওয়ার সময় ওঝা ঠারেঠোরে যা বলে যায় তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে 'ডান'টা হারাধন।

ওঝা কিন্তু শেষ এবং অব্যর্থ সনাক্তকারী নয়। শেষ কথা বলে দেবে ঝাড়-গ্রামের টংরামোহনপুরের জানগুরু। এলাকার সেরা জানগুরু। গাঁয়ের সব ঘর থেকে এক একজন করে জড় হয়ে ছুটল সাপধরা পেরিয়ে টংরামোহনপুরে। যে যা পারে বিক্রি করে হাতে বেশ কিছু করে টাকা নিতে হয়েছে। জানগুরুর ফি, রাস্তার খরচ, একটু ফুর্তি-টুর্তির খরচ, কম কি! তাছাড়া টাকা পেতেও অসুবিধা হয় নি। ক্রেতা খাতরার গড়াইবাবুরা। তাদের লোকজন কিভাবে যেন এসব ঘটনার খবর পেয়ে যায়। গরু, ছাগল, জমি, গাছ, থালা-বাটি অনেক কিছুই বিক্রি হয়ে যায় নিমেষে। 'ডান' কে তা বুঝতে গোটা গাঁয়ের লোককে এটুকু মাশুল দিতে হবে বৈকি!

জানগুরু মন্ত্র পড়ে বিচার করে বলে দিতে দ্বিধা করে না যে হারাধনই 'ডান'। কথাটা তার মুখ থেকে শুনে উল্লাসে ফেটে পড়ে কদমবেড়ের মানুষ। সাপধরার সাউদের হাঁড়িয়ার দোকান সাফ হয়ে যায় তাদের আনন্দের যোগান দিতে।

ফেরার পথে চুপচাপ আসছিল হারাধন। বুঝতে পারছিল না কিভাবে সে 'ডান' হলো। ছেলে সিকিমকে নিয়ে কাঁসাইয়ের পাড়ে একখণ্ড বন্ধ্যা জমির পাথর-কাঁকর সরিয়ে চাষ করছিল। তিন-চার বছরের চেষ্টায় ফসল ফলতে শুরু করে-ছিল বেশ। গড়াইবাবুরা প্রস্তাব দিয়েছিল জমিটা কিনে নেবার। ছেলে সিকিম আর বাপ হারাধন জমি হাতছাড়া করে নি। এখন আর জমিটা রাখতে পারবে না। জরিমানার টাকা যোগাড় করতে ওইটুকুই সম্বল। সে মন্ত্রতন্ত্র না জেনেও 'ডান' হয়ে গেছে। জরিমানা দিয়ে গাঁয়ের সবার কাছে যদি মুক্তি পায়।

হারাধনকে বেশিক্ষণ ভাবতে হয় নি। গাঁয়ের বাঁধের কাছে আসতেই সকলে একযোগে আক্রমণ করেছিল আধবুড়ো মানুষটাকে। লাথি, চড়, বুকের ওপর চেপে বসা, গলা টিপে শ্বাস বন্ধ করে দেওয়া কোনটাই বাদ থাকে নি। পরদিন সকালে পুলিশ এসে হারাধনের লাশ খুঁজে পেয়েছিল বাঁধের বালিতে পোঁতা অবস্থায়।

রহড়ার উলগা মাঝির যুবতী বিধবা 'ডান'। তালডাংরার কাছেই কুসুমডুংরির জানগুরুর বিচারে সে 'ডান'। বধ্যভূমিতে গাছের সাথে বেঁধে সবাই পাথর ছুঁড়ে শেষ করছিল বৌটাকে। তার সাথে শেষ হচ্ছিল যৌবনে ভরপুর তার সুঠাম দেহখানি। মরতে বসেও সে বুঝতে পারে নি কেন সে 'ডান' হয়েছে! মন্ত্রের 'ম'-ও তার জানা নেই। আর, মনে মনেও কোনদিন কারো অকল্যাণ সে কামনা করে নি।

সে যাত্রা এক অসমসাহসী গ্রামবাসীর প্রচেষ্টায় প্রাণে বাঁচলেও দিন কতক বাদেই ছাড়তে হয়েছিল স্বামীর ভিটে। একমাত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই। আর উলগার একচিলতে জমি—পেটে দুমুঠো অন্নের যোগানদার। ভিটে ছাড়ার মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল মোড়লের কথাই ঠিক হলো। মোড়ল বলেছিল ভেডুয়াশোলের মহাজন-চাষী সাগর আঠার খামারবাড়িতে রাত না কাটালে সে গ্রামে থাকতে পারবে না।

দহলার পোস্টমাস্টার তিনু বাস্কে আর ট্রাইব্যাল অফিসের কর্মী সুচাঁদ কিসকুর মা দু-জনে 'ডান'। সরকারি অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মারাত্মক আঘাত আসে নি কিন্তু তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পুলিশ ইনেসপেকটর ও ট্রাইব্যাল অফিসারকে ছোটাছুটি করতে হয়েছে বেশ।

তবে বেলাসিকে বাঁচানো যায় নি। বেলাসি সুন্দরী। তার কালো রঙের আঁটোসাঁটো শরীরের চেকনাই পুরুষের চোখ টানে। ধীরেন ধুয়াদের তো বেশি করে টানে। বেলাসির ঝাঁকড়া কোকড়ানো চুলের নিচে সুশ্রী মুখের পবিত্র

হাসিতে জড়িয়ে থাকত মায়া। মনে ছিল সন্তানের বাসনা।

পায় নি। বেলাসি সন্তান-সংসার কিছুই পেলো না। হয়ে গেল 'ডান'। প্রাণে মরে নি, তবে হারিয়ে গেল ঢালশিমুল থেকে। কেউ কেউ নাকি তাকে দেখেছে স্বপুরে ধীরেন ধুয়ার মাঠের বাড়িতে একলা, বিষণ্ণ। তার চেয়ে বুঝি মৃত্যুও ভালো ছিল। প্রতিদিন লালসার আগুনে জলে জলে এক ব্যর্থ জীবনের বোঝা বইতে হতো না।

বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে পাশ করা জনাকয় ছেলে ছুটে বেড়াচ্ছে জানগুরু, ডান, ওঝা, পুলিশ ও আর সহানুভূতিশীল মানুষের কাছে। যাচ্ছে বীরভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে। গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে জেলাভিত্তিক কো-অর্ডিনেশন কমিটি। যার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে থাকবে সুদূর পল্লীতে।

ওরা 'দে আসিনী', 'ডাকিনী'র উন্নতস্তরের তান্ত্রিকতার ছাপ খুঁজে পায় না কোথাও। তাছাড়া বুঝতে পারে না 'ডান' কেবলমাত্র মানুষের অমঙ্গলের প্রতীক হয়ে আছে কেন ? তাদের সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করতে পারে না প্রায়শ 'ডান' বলে চিহ্নিত মানব-মানবীর বিষয়-আশয় বা দৈহিক সৌন্দর্যহানির ঘটনা জড়িত থাকে কেন ?

যুবকদল বাঁকুড়া-পুরুলিয়া জেলার সব আদিবাসী সমিতি ও পাঠাগারের শতখানেক সম্পাদককে নিয়ে সভা করে বোঝাতে শুরু করেছে, এই মধ্যযুগীয় প্রথা কিভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে সমাজদেহ। থানার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছে যাতে অহেতুক প্রাণহানি রোধ করা যায়। সরকারি অফিসের কর্মী, পঞ্চায়েতের লোক, বুদ্ধিজীবী ও আদিবাসীদের নিয়ে সভা করে সরাসরি আহ্বান জানাচ্ছে মতামত প্রকাশের। উদ্দেশ্য জনমত গড়ে তোলা। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছাড়া তারা যাদুবিদ্যার প্রভাব অস্বীকার করতে বদ্ধ-পরিকর।

☐ ঘটনাগুলির বিবরণ সরাসরি গ্রামের আক্রান্ত মানুষজনের মুখ থেকে শোনা। সংগত কারণে নাম বদল করে নেওয়া হয়েছে। সব কটি ঘটনাই এ প্রতিবেদন লেখার সমসাময়িক।

কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল

সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

ডাইনিতন্ত্র : অতীতে ও বর্তমানে

১৯৮৪ সালের এপ্রিলে প্রথম ভারতীয় হিসেবে রাকেশ শর্মা মহাকাশে ঘুরে এলেন। এক ভারতীয়ের এই সাফল্যে অনেক ভারতীয়ই গর্ব অনুভব করেছেন এবং ব্যাপারটি মানুষের কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অতি উৎকর্ষের অন্যতম পরিচয়ও বটে। রাকেশের মহাকাশ ঘুরে আসার মাসখানেক পরে একটি বাংলা দৈনিকে ছোট্ট খবর বেরুল : ভারতের চাইবাসার কাছে নারসান্তা গ্রামে এক মা ও মেয়েকে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি ডাইনি সন্দেহে হত্যা করেছে। এ ধরনের ব্যাপার আমাদের দেশে নতুন নয়। মাঝে মাঝেই এভাবে কাউকে ডাইনি সন্দেহ করা হয়, মনে করা হয় গ্রামের অসুস্থতা ও নানাবিধ দুর্দশার জন্য তার অলৌকিক ক্ষতিকর প্রভাব দায়ী, আর এ থেকে মুক্তি পেতে তাকে মেরে ফেলা হয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যাপারটি ঘটে অতি দরিদ্র, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকহীন গোষ্ঠীর মধ্যে, আর অভিযুক্তরা প্রায়শই হন কোন মহিলা।

যেমন, বছর দুয়েক আগে মালদহ জেলার সাঁওতাল অধ্যুষিত মুশিতাপ গ্রামে তিন মহিলাকে ডাইনি সন্দেহে গ্রামবাসীরা খুন করে পুঁতে ফেলে। গ্রামের মণ্ডল হাঁসদার বৌ দিন দশেক ধরে বুকের সাংঘাতিক রোগে ভুগছিল। প্রচলিত গাছ-গাছড়ার ওষুধেও যখন কাজ হলো না তখন মণ্ডল গেল ১৫ কিলোমিটার দূরের গাজোল হাসপাতালে। মণ্ডলদের ২৫ বিঘে জমি রয়েছে, গ্রামের বেশ গণ্যমান্য লোক। চিরাচরিতভাবেই ওর বাবার হাসপাতালের ডাক্তারদের ওপর কোন আস্থা ছিল না। তিনি গেলেন পাশের গ্রামের জানগুরু (ওঝা বা গুনিন)-এর কাছে। সাঁওতালদের মধ্যে এরা বেশ প্রভাবশালী, রহস্যময় সমস্যার সমাধান করায় এদের নাকি অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। ২২৫ টাকার প্রণামী নিয়ে আর সারারাত ধ্যান করে জানগুরু তার রায় দিল। রায় দেওয়ার আগে মণ্ডলের বাবার সাথে আসা ১০-১২ জন সাঁওতালকে সে ১০টি টাকা দিয়েছিল তাড়ি খাওয়ার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই জানগুরুর ওপর তাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা বাড়ল। জানগুরু তার রায়-এ তিন মহিলার নাম বলল—যারা পুস্‌কিন অর্থাৎ ডাইনি। এদের অপপ্রভাবেই মণ্ডলের বৌয়ের দুরারোগ্য রোগ। গ্রামে পৌঁছল এ-খবর। মিটিঙ-এ ঠিক হলো

ঐ তিন ডাইনির মৃত্যুই হলো বাঁচার একমাত্র পথ। '৮২-র ৭ এপ্রিল ভোরবেলা গ্রামের এক কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে ৫০ বছরের মহিলা সাধন কিস্কুকে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে বের করা হলো। মণ্ডলের বাবা চতুর হাঁসদা ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা মহিলাকে পিটিয়ে মেরে নিশ্চিন্ত হলো। আরেকজন ছিল বাঙ্গি হেমব্রম। তাকেও টেনে বের করা হলো ঘর থেকে। তার কাতর আর্তনাদে কান না দিয়ে ডাইনি-ভয়ে সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা তাকে পিটোতে থাকল। এক সময় বাঙ্গিরই ছেলে ধনয়, একটা লোহার রড আগুনে লাল টকটকে করে নিয়ে ডাইনি বলে চিহ্নিত তার অর্ধোলঙ্গ মায়ের বুকে ঢুকিয়ে দিল। তৃতীয় ডাইনি মাজাই সোরেন, ৫৫ বছর বয়সের আরেক মহিলা। তাকেও মারা হলো একইভাবে। জানগুরুর বলা তিন ডাইনিকে খতম করে মুশিতাপের সাঁওতালেরা নিশ্চিন্ত হলেও মণ্ডল হাঁসদার বৌ কিন্তু বাঁচে নি—কয়েকদিন পরেই মারা গেল। তার হয়েছিল নিউমোনিয়া। কিন্তু বড় দেরি করে শুরু হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা।

১৯৭৮-এ ঐ মালদহেরই মোড়গ্রামের নাওপাড়াতে দু-জন মহিলাকে ডাইনি সন্দেহে মারা হয়েছিল। গ্রামের প্রাক্তন মোড়ল মঙ্গল কিস্কু যক্ষা রোগে মারা গেল। কিন্তু সাঁওতাল গ্রামবাসীদের কাছে সে রোগ ছিল ভয়াবহ রহস্যে ভরা কিছু। এর কয়েকদিন পরেই মঙ্গল কিস্কুর এক ছেলে মারা গেল। গ্রামের একটি বাচ্চা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে থাকল—তার মা পাগল হয়ে গেল। এই ধরনের ব্যাপার-স্যাপার দেখে মঙ্গল কিস্কুর স্কুল শিক্ষক ছেলে প্রধান কিস্কু গেল গ্রামের জানগুরু অর্থাৎ গুনিনের কাছে। ৬০ টাকা প্রণামী নিয়ে গুনিন গণনা করে গ্রামের দুই মহিলাকে ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত করল—তারাই এত সব কাণ্ড ঘটাচ্ছে। প্রধান কিস্কু আরো কয়েকজন গ্রামবাসীকে নিয়ে গেল ঐ দু-জনের কাছে। প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ১২০ টাকা করে চাইল। গরীব গ্রামের অতি গরীব ঐ দুই মহিলা কোথায় পাবে টাকা? বিচারে ঠিক হলো দু-জনকে সরাতেই হবে। পেটে লাথি মেরে মাটিতে ফেলা হলো ওদের, তারপর কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলা হলো।

এই ধরনের বহু ঘটনা এখনো ঘটে চলেছে। এসবের কিছু কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় আর সামান্য দু'চারটিকে নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান চালান সম্ভব হয়। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই ডাইনি ও ডাইনিতন্ত্রের ওপর বিশ্বাস ও তার প্রয়োগ এখনো রয়েছে। মধ্যযুগের ইয়োরোপে তো ডাইনিতন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব ছিল। ফ্রান্সের জোয়ান অব্ আর্ককে ডাইনি হিসেবে অভিযুক্ত করে ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে, তখন জোয়ানের

বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর। গ্রামের মেয়ে জোয়ান পরাধীন দেশকে মুক্ত করার ব্রতে ঝাঁপিয়ে পড়ে—পুরুষের পোশাক পরে প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সে যুদ্ধ করত। মেয়ে হয়েও এই ধরনের 'অস্বাভাবিক' পুরুষালি আচরণের কারণে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের প্রভাবে ইংরেজরা তাকে সাব্যস্ত করে ডাইনি হিসেবে ; ব্যাপারটি জোয়ানের মতো ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে দেওয়ার একটা হীন চক্রান্তও বটে। একইভাবে দেখা যায়, গ্রামের অথর্ব বৃদ্ধাদেরই সাধারণত ডাইনি সন্দেহে মারা হয়। সংসারের এই সব বোঝাকে যে কোন উপায়ে সরানোর সচেতন প্রচেষ্টা। দু-চারটি ক্ষেত্রে জমির বিরোধ, পারিবারিক কলহ ও গুনিনকে ঘুষ দিয়ে শত্রু বিশেষকে ডাইনি হিসাবে ঘোষণা করার ব্যাপারও জড়িত থাকে।

আফ্রিকার কিছু কিছু দেশে, অস্ট্রেলিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এখনো ডাইনিতন্ত্রে সুগভীর আস্থা রাখে ও সক্রিয়ভাবে তার চর্চা করে। ১৯৬৪ সালে ১৮ মে তারিখের 'লাইফ' পত্রিকায় ডাইনিদের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের ওপর সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডের ফোকলোর সোসাইটি এ-বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করেন। সোসাইটির সভাপতি ডগলাস কেনেডি সহাস্যে স্বীকার করেছিলেন যে, আগে তিনিও ডাইনিতন্ত্রের চর্চা করতেন।

ডাইনি ও ডাইনিতন্ত্রের ব্যাপারটি আদিম মানুষের অজ্ঞতা ও অসহায়তা থেকে সৃষ্টি হওয়া নানা মিথ্যে বিশ্বাস ও ধারণার ধারাবাহিকতায় জন্ম নিয়েছে। সংস্কৃতে 'ডাকিনী'দের অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী মহিলা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর থেকেই এসেছে ডাইনি কথাটি। ইংরেজিতে বলা হয় Witch—এক্ষেত্রেও মূলত মহিলাদেরই বোঝান হয়। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে আদ্যাশক্তির সাথে শাকিনী ও ডাকিনীদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আরো বহু কুসংস্কারের মতো ডাইনিদের সম্পর্কেও ধারণা যে তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। ঝড়বৃষ্টি, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অকালমৃত্যু, দুরারোগ্য রোগ ইত্যাদির মতো শারীরিক দুর্ঘটনার সবকটির পেছনেই বাস্তব কারণ থাকলেও, আদিম মানুষের কাছে তার প্রায় সবটাই ছিল অজানা। এদের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার জন্য এ-সবকিছুর বদলে এক অলৌকিক শক্তি বা আত্মাকে তারা দায়ী করেছে। পাশাপাশি এই প্রতিকূল শক্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য অলৌকিক শক্তিকে করায়ত্ত করার চেষ্টা ও চর্চা করেছে। এক্ষেত্রে তথাকথিত যাদুবিদ্যা একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ কিছু লোক দাবি করত যে তারা এই ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যার

সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, শত্রুর উচ্ছেদ করতে পারে ইত্যাদি। এবং এইভাবে তারা সমাজে প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম লাভ করত। এই-ভাবেই ডাইনিতন্ত্র আর মারণ, উচাটন, বশীকরণ, বাণ মারা, তুকতাক, তন্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি যাদুবিদ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাল্পনিক নানা পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। ডাইনিরা এইসব ক্ষতিকর যাদুবিদ্যায় (black magic) দক্ষ হয় বলে বিশ্বাস। অন্যদিকে জীবন ও মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক রহস্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকায়, প্রাচীন মানুষ প্রাণের পেছনে এক আত্মার কল্পনা করেছে এবং বিশ্বাস করেছে যে নানা দুর্দশার পেছনে রয়েছে কিছু ক্ষতিকর বদ্ আত্মার কারসাজি। ডাইনিরা এই ধরনের বদ্ আত্মাকে বশীভূত করে ও তাদের দিয়ে নানাবিধ কাজ করাতে পারে বলেও বিশ্বাস (ভূত-প্রেত-জিন ইত্যাদিকে দিয়ে কাজ করানোর মতো)। ডাইনিরা যেন এই বদ্ আত্মারই প্রতিভূ। জ্ঞানের বিকাশের বৈষম্য, প্রকৃতির কাছে অসহায়তা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশা ইত্যাদির ফলে ব্যাপক মানুষের মধ্যেই এখনো এ-ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস টিকে রয়েছে।

দূর থেকে কারোর অজ্ঞাতে মন্ত্র পড়ে তার শরীর বা মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায় না। কিন্তু কাউকে শুনিয়ে মন্ত্র পড়লে ভীতির কারণেই সে মানসিকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়তে পারে এবং এসব থেকে নানা শারীরিক মানসিক রোগের সৃষ্টি হতে পারে। আর, একবার ডাইনি সম্পর্কিত কোন ঘটনার কথা প্রচার হলে ডাইনিতে পরিপূর্ণ আস্থাশীল গ্রামবাসীরা ধারাবাহিক-ভাবে পরবর্তী কোন দুর্ঘটনা রোগ বা মৃত্যুকেও ডাইনির কাজ বলে মনে করতে শুরু করে। ভীতির কারণে চক্রবৃদ্ধিহারে অসুস্থতারও সৃষ্টি হয়, গণ-হিস্টিরিয়ার মতো। মালদহের মুশিতাপে মণ্ডল হাঁসদার বৌ-এর আসলে হয়েছিল নিউমোনিয়া। ঠিক সময়ে চিকিৎসা হলো না। মোড়গ্রামে নাওপাড়ার মঙ্গল কিস্কু মারা গেছে টি বি-তে—কিন্তু তার ছেলে সেটিকে ডাইনির কাজ বলে বিশ্বাস ও প্রচার করেছে। পরবর্তীকালে কোন বাচ্চার রোগে শরীর শুকিয়ে যাওয়া কিংবা কারোর পাগল হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপারকেও ডাইনির কাজ বলেই ভাবা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শুধু নয়, ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলেই 'ডাইনির প্রকোপ' মাঝে মাঝে দেখা যায়—যেমন কর্ণাটকের পান্ডাপুরায় এক মহিলার মাথার পেছনের দুরারোগ্য যন্ত্রণাকে ডাইনির কাজ বলে ভাবা হয়েছে। উচ্চ-রক্তচাপ, ব্রেন টিউমার ইত্যাদি বহু কারণই এর পেছনে থাকতে পারে কিন্তু এসবের জন্য উপযুক্ত পরীক্ষাদি করার সুযোগ যেমন নেই তেমনি উপযুক্ত সচেতনতারও অভাব রয়েছে। ডাইনিরা বাণ মারা বা ওই ধরনের নানা পদ্ধতির সাহায্যে নাকি এইসব

ক্ষতিকর কাজকর্ম করে থাকে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কল্পনা করে পুতুল বানিয়ে সেটির চোখে হয়তো ছুঁচ ফোটান হলো আর মন্ত্র পড়া হলো। বিশ্বাস, এতেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিও অন্ধ হয়ে যাবে।

কোন দুই বন্ধুকে পরস্পরের শত্রু করে দেওয়ার মতো বহু বিচিত্র ক্ষমতার অধিকারী বলেও ডাইনীদের মনে করা হয়। 'মহিষ ও ঘোটকের বিষ্ঠার সহিত গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা যে দুই ব্যক্তির নাম লিখিবে, সেই দুইজনের পরস্পরের বৈরভাব উপস্থিত হইয়া থাকে'—বৃহৎতন্ত্রসার-এ উল্লেখিত এ ধরনের হাস্যকর কাল্পনিক নানা পদ্ধতিও ডাইনিরা অবলম্বন করতে পারে। কোন গ্রামের লোকেরা পরস্পরের সাথে ঝগড়াঝাঁটি, মারপিট-এ লিপ্ত হলে গ্রামের ওপর ডাইনির নজর পড়েছে বলে বলা হয়। কিন্তু পারস্পরিক বিদ্বেষের পেছনে যে সংকীর্ণ স্বার্থ, অসহিষ্ণুতা, অর্থনৈতিক কারণ ইত্যাদিই কাজ করে সে ব্যাপারে সচেতনতার অভাব থেকে যায়।

ডাইনিতন্ত্রের আরেকটা দিক হলো নানা জড়িবটি, ওষুধবিষুধের ব্যবহার। ডাইনিরা এসবের সাহায্যে নানা রোগের চিকিৎসা যেমন করতে পারে তেমনি এইসব ওষুধ খাইয়ে কাউকে পাগল করে দেওয়া, ভেড়া বা ছাগলে পরিণত করা, অসুস্থ করা ইত্যাদিও করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়। বিভিন্ন গাছগাছড়া, মাটি ও রাসায়নিক নানা পদার্থ শরীরের ওপর বাস্তব প্রতিক্রিয়া ফেলতেই পারে, যেমন ধুতুরা খাইয়ে নানা মানসিক বৈকল্য সৃষ্টি করা যায়; এর মধ্যে যে থাওসায়ামিন নামক পদার্থ থাকে তার প্রভাবেই এটি সম্ভব। সর্পসন্ধা গাছ থেকে ওষুধ বানিয়ে খাওয়ালেও ঝিমুনি ও রক্তচাপ কমে যাওয়ার নানা লক্ষণ সৃষ্টি করা যায়। ডাইনি-চিকিৎসকদের (witch doctor) আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার পূর্বসূরী হিসেবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রদান করা গেলেও বাস্তবত কোনো উপকার প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই হয় না এসব চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে। ডাইনি-চিকিৎসকেরা চালপোড়া, গরম লোহার শিক ছেঁকা দেওয়া, চামড়া ভেজান জল খাওয়ান, লংকার গুঁড়ো ঘষা ইত্যাদি বহু বিচিত্র ও প্রায়শ-ক্ষতিকর প্রেস্ক্রিপশান করে। মালদহের দক্ষিণ ভাতরা গ্রামে বিনয় রাই-এর পায়ে মাঠে কাজ করার সময় কিছু ফুটে যায় ও এর থেকে বিষিয়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে যায়। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত গ্রামের লোকেরা যখন দেখে সাধারণ লতাপাতার ওষুধেও ঘা-টা সারে নি, তারা তখন ব্যাপারটিকে কোনো ডাইনির নজর বলেই ধরে নেয়। গুনিন তথা ডাইনি-চিকিৎসক নাটু চৌধুরীর শরণাপন্ন হলে সে বিষয়কে একটি প্রেসক্রিপশান করে দেয়—১৬টি

কালোমানিক পাখি, ১৬টি ছুঁচ, ১৬ হাত লাল সুতো, ডুবে যাওয়া নৌকোর জল, উত্তরমুখী নদীর জল, আধা কিলো সর্ষে, এক প্যাকেট সিঁদুর, চাল ও কাঁচা মাছ, অষ্টধাতুর মাদুলি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এত সবেও ওর গ্যাংগ্রিন সারে নি, শেষ অব্দি তাকে ডাক্তারের কাছেই যেতে হয়েছিল।

আমাদের দেশে সাঁওতাল, ওরাঁও ইত্যাদি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ডাইনি সম্পর্কিত বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল ও ব্যাপক। খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, রোগকষ্ট ইত্যাদি সবকিছুকেই ওরা মনে করে 'বোংগা' নামে এক ক্ষতিকর অপদেবতার কাজ— ডাইনিরা হচ্ছে এই বোংগার স্ত্রী। গুনিনরা গ্রামের কোনো বৃদ্ধাকে (কখনো কোনো কুমারী মেয়েকেও) ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই এর পেছনে থাকে ব্যক্তিগত শত্রুতা। যেমন, মালদহের বোস্থ সোরাং-এর সাথে টুডুদের গণ্ডগোল হয়, ঐ সময় মহেশ টুডু ও তার বিধবা বোন বিলকু টুডু 'তোরা নির্বংশ হবি' বলে বোস্থ সোরাংকে গালাগালি করে। এর কিছুদিন পরে ঘটনাচক্রে বোস্থ সোরাং-এর দুই ছেলে অসুস্থ হয়। বোস্থ প্রচার করে বিলকু ডাইনি—ও-ই এই কাজ করেছে। গুনিনও ফি নিয়ে এই কথাই বলল। ফলত এক রাত্রে গ্রামবাসীরা মিলে চিহ্নিত ডাইনিকে খতম করে 'নিশ্চিন্ত' হলো।

কিন্তু শুধু আদিবাসীদের মধ্যেই নয়—ডাইনিদের সম্পর্কে সাধারণ বিশ্বাস প্রায় সব স্তরের মানুষের মধ্যেই রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই নানা গালগল্প বাচ্চাদের মনে ঢোকান হয়। সে এক বৃদ্ধা, শনের মতো তার চুল, হাতে আঁকাবাঁকা লাঠি, বড় বড় নখ, হি-হি করে হাসে, ক্রুর তার দৃষ্টি, বাচ্চার রক্ত চুষে খায় আর অন্যের সর্বনাশ করার জন্য সদাই প্রস্তুত। ইয়োরোপের ডাইনিরা আবার নাকি ঝাঁটা চড়ে আকাশে উড়ে যায়; কিংবা একটি 'কুরূপা বৃদ্ধা নির্জন কুটিরে বসে নানারকম ওষুধপত্র তৈরি করছে, তার পাশেই ঘুরঘুর করছে একটা কালো বিড়াল।'

যাই হোক, মূলগতভাবে এখনো টিকে থাকা ডাইনি সম্পর্কিত বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি করে রেখেছে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য। সাঁওতালদের মতো আদিবাসীদের বেশিরভাগের জীবনই মূলত প্রকৃতি নির্ভর। রোগের ক্ষেত্রে যেমন আধুনিক চিকিৎসা, চিকিৎসক ও হাসপাতাল তাদের সাধ্যের বাইরে, সুযোগসুবিধাও অত্যন্ত সীমিত, তেমনি বহু শত বছরের ভ্রান্ত সংস্কারের বেড়ার বাইরে বেরিয়ে আসার মানসিকতাও সৃষ্টি হয় নি। যেমন, পরিসংখ্যান বলছে মুর্শিদাবাদের সাঁওতালদের মধ্যে ভালভাবে লিখতে পড়তে পারে এমন মানুষের সংখ্যা অতি

নগণ্য। অধিকাংশকেই বছরে চারমাসেরও বেশি শুধু তাড়ি খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। তারা জানে অসুখ করলে ওঝা-গুনিন ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য আর কেউ তাদের সামনে নেই। দুর্দশা ও রোগকষ্টের জন্য বোংগা-ডাইনিরা ছাড়া অন্য কিছুকে দায়ী করার মতো প্রাথমিক চেতনা তাদের দেওয়াই হয় নি। সচেতন-ভাবে এই অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, অসহায়তা ও কুসংস্কারের সুযোগ নেয় স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ—গুনিন মোড়ল থেকে শুরু করে ভোটবাবু নেতারা পর্যন্ত। সারা দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অজ্ঞ ভীরু বঞ্চিত মানুষরা যদি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়, আধুনিক জ্ঞানে শিক্ষিত হয়, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পরিপূর্ণ সুযোগ পায়, তবেই আরো বহু কুসংস্কারের মতো ডাইনিরাও দূর হবে, এভাবে মরবে না কোন বৃদ্ধা বা যুবতী। ৫০০ বছরেরও আগে জোয়ান অব্ আর্ক-এর ডাইনি অপরাধে মৃত্যুর এতদিন পরেও ডাইনি হত্যা চলছে—একই সাথে মানুষের মহাকাশ অভিযানও চলছে। জ্ঞান ও সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে তীব্র বৈষম্য এ থেকে স্পষ্ট হয়। বোঝা যায় চরম দরিদ্র মানুষ জীবনের অসহায়তা ও অনিশ্চয়তার অন্ধকারের মধ্যে বেঁচে থাকার লড়াই চালাতে গিয়ে ডাইনিতন্ত্রের মতো ভয়ঙ্কর কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ছে আজও; দেশের 'অগ্রগতি' ব্যাপক মানুষের বঞ্চনার কুদৃশ্যকে আড়াল করে রাখছে।

সূত্র:

১. যুগান্তর; ১৬.৫.৮৪
২. অমৃতবাজার পত্রিকা; ২১-২২, ৪.৮২
৩. সানডে; ১৭.৯.৭৮; ১৭.৮.৮০; ৯.৩ ৮০
৪. লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ: আবদুল হাফিজ
৫. বিচিত্র বিশ্বাস: অমিতা কুমারী বসু
৬. *Science & Society in Ancient India*: Debiprasad Chattopadhyay

ভবানীপ্রসাদ সাহু

সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

মানুষ—ডাইনি—পুরুলিয়া

এক যে আছে নাম-না-জানা জেলা···

পুরুলিয়া।

না—নামটা জানা।

ও হ্যাঁ, নামটা জানা!

পাহাড়-ডুংরি, পথ-হারানো অরণ্য, বুনো হাতির পাল, চড়াই-উৎরাই রাস্তা, সাঁওতাল-শবর-ভূমিজ, মারাংবুরু-জাহের এরা-সিং বোঙ্গা, জান-সখা-সখাইন, ভূত-ডাইনি-তেলখড়ি।

আজ ডাইনির গল্প শোনানো যাক্। এই গল্পে জড়িয়ে আছে কয়েকজন কাল্‌চে মানুষও, যারা 'ডাইনি'কে ভয় করে না। যারা লড়ে যায় 'ডাইনি'র বিরুদ্ধে।

গল্পটা ১৯৮৪ সালের। বিশ্লেষণ নয়, তত্ত্বকথার মারপ্যাঁচ নয়, এ লেখায় রাখছি শুধু ঘটনাটা।

ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে-পিটিয়ে মারার খবর মাঝে-মাঝে ভিন্‌ দেশ থেকে আসে, আসে এই ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে, পশ্চিমবাংলার নানান জেলা থেকে। আমাদের কাহিনীটা পুরুলিয়ার।

কলকাতা শহরে বসে 'মারিতং রাষ্ট্র' করাটা যতো সহজ, পুরুলিয়ার গ্রামে বসে ভূত-ডাইনি মানি না, বা জান-সখা মানি না বলাটা ঠিক ততো সহজ নয়। নিকষ অন্ধকার ওখানে আজও। প্রতিবাদীকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে সরল গ্রামবাসীরাই।

গ্রামের কারুর মৃত্যু, অসুখ, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটলে সাঁওতালরা ছোটে সখা বা সখাইনের কাছে। সে তেল-খড়ি করে একজন নারীকে ডাইনি সাব্যস্ত করে—সেই নাকি এর মূলে আছে। এবার ডাইনির জরিমানার পালা—৫০০ থেকে ১০০০ টাকা। এরপরেও থাকে বীভৎস শারীরিক অত্যাচার, গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, কখনো পুড়িয়ে-পিটিয়ে হত্যা।

নির্দিষ্ট ঘটনার বিবরণ নিজের ভাষায় দিচ্ছি না। ঘটনার পর বন্ধু মহাদেব হাঁসদা

চিঠি পাঠায় একটা। তুলে দিচ্ছি সেই চিঠিটাই। শুধু বন্ধনীর মধ্যেকার কথাগুলো আমার :

'পুরুলিয়া জেলার মানবাজার থানার বড়দহি গ্রাম। গ্রামের মোড়ল লড়িরাম টুডু দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। সম্ভবত টি বি রোগ। ওঝা-কবিরাজের পিছনে খরচ করেছে অনেক কিন্তু ডাক্তারের পিছনে এক টাকাও করে নি। ওর সন্দেহ হলো তাকে ভূতে খাচ্ছে।

গ্রামের লোকেরা ঝোরবাদ গ্রামের লিলু সখার কাছে গেল—যে ডাইনি ধরে দেয়। সখা ললিন টুডুর বউকে ডাইনি বললো (৬ মার্চ '৮৪)। ওই বউ চার মাস ধরে বর্ধমানে 'নামাল' খাটতে গেছে। এখনও ফেরে নি। তবু ললিনকে জরিমানা এবং প্রায়শ্চিত্ত বাবদ টাকা খাসি মদ ইত্যাদি দিতে হলো। এর পর ললিন বাঁকুড়া জেলার সুলুকপাহাড়ির সখার কাছে আপীল করলো। অনেক খরচ হলো। ওই সখা তখন অন্য আর একজনকে ডাইনি করলো। গ্রামের লোকেদের সেটা পছন্দ হলো না। এবার পুরুলিয়ার রয়না গ্রামের সূর্য সখার কাছে সবাই গেলো। এই সখা সুধীর টুডুর বাড়ির মেয়েকে ডাইনি করলো।

সুধীর মোটামুটি একজন সচেতন যুবক। প্রাক্তন এম এল এ শীতল হেমব্রমের ভাগ্নী-জামাই। এসব সে কিছুই জানতো না। গ্রামের লোকেরা যখন তাকে ধরলো জরিমানার জন্য, তখন সে জবাব দিলো জান-সখা, ভূত-ডাইনিকে বিশ্বাস করি না। তখন শুরু হলো বিচার (১৬ মার্চ '৮৪)। বিচারকরা চক্রধর টুডু ও শীতল হেমব্রমকে বিচারস্থলে ধরে এনে ভীষণ মার দিল (চক্রধর স্পষ্ট বলেছিল যে তারা ভূত-ডাইনি মানে না)। কিল-চড়, লাথি-ঘুষি, জুতো আর চেন দিয়ে মার।

খবর পেয়ে পুলিস এলো রাত্রি দশটায়। ততক্ষণে সভা ভেঙে গেছে। ওরা সখা ও বড়দহির মাঝিকে গ্রেপ্তার করলো। (পুলিস আসার আগে একদল লোক কবি সারাদাপ্রসাদ কিস্কুকে টেনে আনার চেষ্টা করে। মেয়েরা বাধা দেয়। পুলিস আসার ফলে রক্ষা পান তিনি।) পরদিন এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-মিছিল সহকারে সখার লোকেরা জামতোড়িয়া ফাঁড়িতে ডেপুটেশান দিল। দাবি—ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দিতে হবে। পুলিসের লোকেরা বললো—সাত দিনের মধ্যে মিটমাট করো, তা না হলে অন্য আসামীদের ধরা হবে।

উপায় না দেখে 'মহলগিরা'র ডাক দেওয়া হলো (জমায়েতের ডাক)। 'গিরা' ছিল ২৩ মার্চ। সখার লোকেরা সারদাবাবুর বাড়িতে আগুন দেওয়ার এবং চক্রধর, সুধীর ও শীতলবাবুর বাড়ি লুঠ করার সিদ্ধান্ত নিল। সারদাবাবুর

নিরাপত্তার জন্য পুলিসবাহিনী এসেছিল বলে তার বাড়িতে আগুন দিতে কেউ পারে নি। অন্যদের বাড়িও লুঠ হয় নি।

সখার লোকেরা তখন জামতোড়িয়া ফাঁড়ি অবরোধ করলো ২৩ মার্চ সন্ধ্যায়। অবরোধ ছিল ২৪ মার্চ দু'টো পর্যন্ত। তাদের দাবি ছিলো—সরদাপ্রসাদ কিস্কু ও শীতল হেমব্রমকে ধরে এনে দিতে হবে, ওরা তাদের বিচার করবে। কারণ সারদাবাবু ভূত-ডাইনি ও সখার বিরুদ্ধে কথা বলছেন।

ডাইনি শিকার আজও অবাধে চলছে

আদিবাসীরা অনগ্রসর বিধায় সার্বিক উন্নয়নকল্পে এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্হা গ্রহণ সংবিধানেও স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু যে সমস্ত সামাজিক কুপ্রথা এদের উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে আছে, বরঞ্চ পিছনে টানছে, তন্মধ্যে ডাইনিপ্রথা পয়লা নম্বরে স্হান পাবার যোগ্য।

কবে ও কিভাবে সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনিপ্রথার জন্ম হয়েছিল, তার কোন লিখিত কিংবা অলিখিত প্রমাণ নেই। যাই হোক স্মরণাতীত কাল থেকে এই প্রথা সাঁওতাল সমাজকে অক্টোপাশের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে অবাধে রক্ত শোষণ করে চলেছে। এর কুফল হিসাবে সাঁওতাল সমাজ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। বস্তুত ডাইনিপ্রথার মতো মানবিকতাবিরোধী, সর্বনাশকারী ও নৃশংস প্রথা সাঁওতালদের মধ্যে আর দ্বিতীয় নেই। এটা অতীতের সতীদাহ প্রথার সঙ্গে তুলনীয়। প্রতি বৎসর এই প্রথার শিকার হয়ে কত নিষ্পাপ, নিরপরাধ ও নিরীহ ব্যক্তির যে জীবনহানি ঘটছে, কত অসহায় পরিবারকে যে নিঃস্ব ও উদ্বাস্তু হতে হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। ভণ্ড জানগুরুদের কথায় বিশ্বাস করে কত যে অপরাধ, অন্যায় ও অবিচার সংঘটিত হচ্ছে, তা বলে শেষ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ডাইনিপ্রথা একটা অন্ধবিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়। এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তো নাই-ই, পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে

কোন উপকার পাবার প্রশ্নও নেই। এর মূল সমাজের এত ভিতরে প্রবেশ করেছে যে, এক্ষুণি এর অবসান ঘটান সাধারণের ক্ষমতার অতীত। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দীর্ঘদিন পরেও ভারতের মতো কল্যাণ রাষ্ট্রে এধরনের কুপ্রথার অস্তিত্ব বিস্ময়জনক। এই কুপ্রথা উচ্ছেদ-কল্পে সরকার যদি আইন প্রণয়ন করে, অন্তত ভণ্ড জানগুরুদের বেআইনি বলে ঘোষণা করে, তাহলেই এই ক্ষতিকারক প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হতে পারে। আমরা এবিষয়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহানুভূতি কামনা করছি এবং আশু ডাইনিপ্রথা বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সারদাপ্রসাদ কিসকু, সভাপতি, সাঁওতালী সাহিত্য পরিষদ, পুরুলিয়া ; মহাদেব হাঁসদা, কলেন্দ্রনাথ মাণ্ডি, গুরুদাস মুর্মু, বালিশ্বর সরেন, পুরুলিয়া

□ যুগান্তর, ১১.৫.৮৪

---

২৪ মার্চ আড়াইটে নাগাদ সখার লোকেরা যখন শীতলবাবুর বাড়ি লুঠের জন্য যাচ্ছিল, তখন ছ-টি জীপ ও দু-টি ভ্যানে করে আবার পুলিসবাহিনী এলো। তাদের দেখে সখার লোকেরা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে বাড়ি পালালো।

এই ঘটনাটা ঘটেছিল বাহা উৎসবের সময় ('বাহা' বা 'সরহুল্' সাঁওতাল-দের বিশেষ উৎসব। দোলের ঠিক পরেই হয়। বাহা মানে ফুল)। আমি ও বালিশ্বর সরেন যদি কোনো বাহা উৎসবে যোগদান করি, তাহলে আমাদের খুন করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছিল এবং 'তেতরে' (মহাদেব হাঁসদা সম্পাদিত পত্রিকা) পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কারণ আমরাও সখা-বিরোধী। বালিশ্বর বাহা উৎসবগুলোতে যোগ দেয় নি। আমি সব জায়গাতেই গিয়েছিলাম। কোনো গোলমাল হয় নি (অনেক জায়গায় মহাদেব 'মারাং পেড়া' বা প্রধান অতিথিও হয়েছিল)।

ভূত-ডাইনি হলো সামাজিক কুপ্রথা। ভণ্ড জান ও সখারা হলো এর পাণ্ডা। এই কুপ্রথা বন্ধ হলে সখাদের আর্থিক ক্ষতি হবে বিস্তর। রাজনৈতিক নেতারা থাকে ভোটের আশায়। সখা-বিরোধী কথা বলতে গিয়ে সমাজে যদি অপ্রিয় হয়ে যায়, তাহলে মুশকিল। তাই যেদিকে দল বেশি, সেদিকেই ওরা সম্মতি জানায়।

আমরা অসহায়। আমাদের দল নেই, নেতা নেই। সরকার আছে কি না, জানি না। লেখার কারণে, সামান্য কথা বলার অপরাধে কতোবার যে আসামী হলাম তার হিসেব নেই।'

মহাদেব হাঁসদার চিঠি এখানেই শেষ।

চিঠিতে নেই, এমন কিছু খবর দেওয়া যাক। মহাদেব-বালিশ্বররা সভা-সমিতি করে প্রচার অভিযানে নেমেছে ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে। ঘটনার সময়-কালেই, ১০ এবং ১১ মার্চ মহাদেবের গ্রাম কায়রাতে ওদের চাপাকিয়া ক্লাবের 'ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা' ছিল। একাঙ্ক সাঁওতালী নাটক করেছে সাতটি ক্লাব। আর, বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—'সখা ভূত ধরতে পারে না'। বলা দরকার, ঘটনাগুলি ঘটার অনেক আগে থেকেই বিতর্কের বিষয়বস্তু ঠিক করা ছিল। অর্থাৎ—ভাবনাটা ওদের নতুন নয়।

ডাইনির গল্পটা মোটামুটি এরকমই।

ব্যাপারটা পুরনো। নতুন শুধু রুখে দাঁড়ানোর দিকটা। সঠিকভাবে বললে —একেবারে নতুন অবশ্য নয়। প্রতিবাদ প্রতিরোধ মাথা তুলেছে মাঝে মাঝে। বিচ্ছিন্নভাবে। নতুনত্বটা এখানে—কিছুটা সংগঠিত প্রতিরোধ, সচেতন কিছু মানুষের নেতৃত্বে কিছু সাধারণ মানুষের অগ্রগামী পদক্ষেপ। পুরুলিয়ার পাহাড়-জঙ্গলের বুক চিরে এক ঝলক সুস্থ আলো।

বাঁকুড়ার খাতড়া থানায় বৃদ্ধা আহ্লাদী টুডু আমাদের দেখে অঝোরে কেঁদে-ছিলেন। ওর তরতাজা ছেলে হপন টুডু হঠাৎ মারা গেছে। বৃদ্ধা নিঃসহায়। দেখছিলাম, দু-চোখের চারপাশে কালো কালো কি সব বেরিয়েছে। হয়তো (সেবোরিক ডারমাটাইটিস জাতীয়) খুবই সাধারণ চর্মরোগের লক্ষণ ওটা। ওখানকার পরিচিত সাঁওতাল দাদা বলেছিলেন—ঐ দাগগুলো লোকের মনে সন্দেহ জাগায়। কিছুদিন পরে হয়তো আহ্লাদী টুডুকে ডাইনি বলে পিটিয়ে মেরে ফেলবে।

এই মুহূর্তে ঠিক জানি না—আহ্লাদী টুডু বেঁচে আছে কি না।

পরবর্তী কিছু ঘটনা

ডাইনি প্রথার পক্ষের লোকেরা 'সমাজের নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিচার' করার উদ্দেশ্যে ১ মে এবং ১৩ মে '৮৪ দু-টি সভা করে বুড়িবাঁধ ও লাগটুডি গ্রামে।

মহাদেব-বালিশ্বরকে হত্যার চেষ্টা কয়েক বার ব্যর্থ হয়েছে। কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়েছিল মহাদেবের পাশে। হত্যার হুমকি চলছে অবিরত। চারপাশ থেকে।

আর—২০ মে '৮৪ দিনের বেলা খুন হয়েছেন জাগরণ চন্দ্র সরেন। বসন্তপুর জুনিয়র হাই স্কুলের সম্পাদক, পেশায় জুনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। 'সুসার গাঁওতা, পুরুলিয়া'র সভাপতি এবং মানবাজার ২নং ব্লক কংগ্রেস (ই) কমিটির সম্পাদক ছিলেন। (নানা কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া) সাঁওতালী পত্রিকা 'সুসার ডাহার' পত্রিকার দু-তিনটি সংখ্যা সম্পাদনা করেছিলেন। নিজের গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করতেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি ডাইনি-প্রথা বিরোধীদের সমর্থক ছিলেন।

এই মুহূর্তে বেশ কয়েকজনের পক্ষে এলাকায় ঘোরাফেরা করা যথেষ্ট বিপজ্জনক।

দু-একটা লেখা-পত্রের সন্ধান, যেখানে সাঁওতালদের মধ্যেকার এই ডাইনি-বিশ্বাস আলোচিত হয়েছে

১. **C H Bompas :** *Folklore of the Santal Parganas*

২. **W G Archer :** *The Santal Treatment of Witch-Craft* (*Man in India*, Vol XXVII, June 1947, No. 2)

৩. **W G Archer :** *The Cure of Witch-Craft* (*Man in India*, Vol XXVII, June 1947, No. 2)

৪. মাণিকলাল সিংহ : রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (প্রথম খণ্ড)

৫. মাণিকলাল সিংহ : রাঢ়ের মন্ত্রযান

৬. শুভাশিস মৈত্র : অযোধ্যা পাহাড়ে ডাইনী সমস্যা ; প্রতিক্ষণ, ২.৮.৮৩

৭. বিক্রম নায়ার : সুদূর সাঁওতাল পল্লীতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঢেউ ; আনন্দ-বাজার পত্রিকা, ২১.৪.৮৪

৮. নাজেস আফরোজ : সাঁওতাল সমাজে ডাইনী সংস্কার (১, ২, ৩), ; আজকাল ২৪, ২৫, ২৬ মে ১৯৮৪

অসীম চট্টোপাধ্যায়

সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

ডাইনিপ্রথা : 'সকা'র কবলে অসহায় মানুষ

বার কি তের বছরের সদ্য বিবাহিত টিপু পরামানিক। গ্রামের নাম লাগদা, পুরুলিয়া জেলা। বিয়ে কি—স্বামীর বাড়ি কি—সে-অনুভূতি তার হয় নি। বাবা হলধর পরামানিক দরিদ্র ক্ষেত-মজুর। শেষ সম্বল চাষের জমিটা গ্রামের মহাজনের কাছে বন্ধক দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। গ্রামের মেয়ে—বয়স যখন বার কি তের হলো সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লো, 'এ মেয়েকে তো আর ঘরে রাখা যায় না'। যথাসময়ে পাশের গ্রামের এক ছেলের সঙ্গে বিয়েও হয়ে গেল। এতটুকু মেয়ে, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ পরিস্ফুটন তখনও হয় নি। কিন্তু স্বামীর বাড়ি গিয়ে নরনারীর প্রথম মিলনের দিনেই টিপুর মধ্যে এক ভীতি-ভাবের উদয় হলো। দ্বিতীয় দিনেই হঠাৎ জীবনের প্রথম ঋতুস্রাব শুরু হলো। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা মেয়ে। তার ধারণা হলো হয়তো গত রাতে তার স্বামী জোর করে মিলতে চেয়েছিল, তাই তার শরীর থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। টিপু তার স্বামীকে কিছু বললো না। দ্বিতীয় রাতে, তার স্বামী যখন আবার মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো, এবং জোর করে মিলিত হতে গেল—টিপু ভয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। তার চীৎকারে আশেপাশের প্রতিবেশীরা ছুটে এলো। টিপুর শ্বশুর-শাশুড়ি ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন—কি হয়েছে জানার জন্য। অতি উৎসাহী দু-চার জন প্রতিবেশী জানতে চাইলো নতুন বৌ চীৎকার করে কাঁদছে কেন, তাকে কি তার স্বামী মেরেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্ন হতে লাগলো। কিন্তু যাকে উপলক্ষ করে এত দৌড়াদৌড়ি, তার কোনও ভাবান্তর নেই। বারে বারে জিগ্যেস করা হচ্ছে—'কাঁদছো কেন, কি হয়েছে।' টিপু নিরুত্তর। তার স্বামীও বোকার মতো তাকিয়ে আছে তার দিকে, এমন কি আচরণ সে করলো—যার জন্য তার স্ত্রী চীৎকার করে কাঁদছে।

বয়স্কদের আলোচনাসভা বসলো। সবাই একবাক্যে রায় দিল—নতুন বৌকে 'ডাইন'-এ পেয়েছে। 'ডাইন'-এ যখন পেয়েছে, তখন ডাইন ছাড়ানোর জন্য যেতে হবে 'ওঝা'র কাছে। ওঝাকে কেউ বলে 'সকা', কেউ বলে 'জান-গুরু'। নতুন বৌ টিপুকে নিয়ে যাওয়া হলো সকার কাছে ; সঙ্গে স্বামী, এবং পাড়ার

কয়েকজন। 'সকা' দূর থেকে তার খরিদ্দার আসছে দেখে, জোরে জোরে পিশাচমন্ত্র বলতে শুরু করলো। তার উচ্চৈস্বরে চীৎকার, আর মেয়েটির প্রতি 'মন্ত্রপূত' ধুলো ছোঁড়া দেখে মেয়েটি আরও বেশি ভয় পেয়ে গেল! একে তার পুরুষজাতির প্রতি একটা ভীতিভাব জন্মেছে, তার ওপর এই অঙ্গভঙ্গি সহকারে চীৎকার চেঁচামেচিতে মেয়েটি ভয়ে কেঁদে ফেললো। ওঝা তখন তার একটা পিশাচসিদ্ধ আয়না বের করলো। ঘষা কাঁচের আয়না। প্রতিবিম্ব একদম পড়ে না, এবং অন্য কেউ দেখার চেষ্টা করলে দেখতে পাবে না। ওঝা সেই আয়নাটা নিয়ে নিজে দেখতে লাগলো, আর জোরে জোরে মন্ত্র বলতে থাকলো। মন্ত্র বলা শেষ হলে, কিছুক্ষণ চুপ করলো। তারপর টিপুর শ্বশুরকে বললো, 'তোদের ঘরটার পশ্চিমদিকে, একটা গলি আছে, ঐ গলির ঈশানকোণে অন্য একটা ঘর আছে?' টিপুর শ্বশুর সরল সাধাসিধে মানুষ। পশ্চিমদিক ঈশান কোণ এতসব জানে না। পাছে সকা রেগে যায়, তাই ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।' সকা জিগ্যেস করলো, 'সেই ঘরে একটা বয়স্ক বৌ আছে।' এরও উত্তর হলো, 'হ্যাঁ'। সকা তখন সদম্ভে দিগ্বিজয়ী বীরের মতো উত্তর দিল, 'ও-ই ডাইন বটে। ঐ ডাইনই তোর নতুন বৌকে খেয়েছে, তোর বৌ যখন স্নান করতে বাঁধে গেছিল, ঐ বৌ-ই স্নানের সময় তোর বউ-এর মাথার চুল ছিঁড়ে নিয়েছে। আর ঐ চুল অমাবস্যার দিন শ্মশানে গিয়ে আগুনে পুড়িয়েছে ঐ ডাইনটা।'

ভয়ার্ত স্বরে টিপুর স্বামী জিগ্যেস করলো, 'ডাইন ছাড়াবো কিভাবে?'

—যজ্ঞি করতে হবে—পিশাচ-যজ্ঞি করতে হবে, পাঁচশো টাকা লাগবে।

—এতটাকা পাবো কোত্থেকে?

—তবে জ্বালাতে আসিস কেন?

পাশে বসে থাকা অতি উৎসাহী প্রতিবেশী বললো, 'এতে আর অসুবিধের কি আছে, সকা যখন বলছে ঈশানকোণের ঘরে যে বৌ আছে, সে-ই ডাইন, তবে তুই এখন টাকাটা দিয়ে দে, পরে ঐ ডাইনের ঘর থেকে জরিমানা সহ টাকা আদায় করা যাবে। টাকা যদি না দিতে পারে, তবে তার যত জমি আছে সব নিয়ে নেব।'

রাজি হয়ে গেল টিপুর স্বামী ও শ্বশুর। সকাকে বললো তুমি ডাইন ছাড়িয়ে দাও, যতটাকা লাগবে সব টাকা দেব। সকা তার পিশাচসিদ্ধ মন্ত্র বলতে আরম্ভ করলো, একটা মাটির পাত্রে নারকেল ছোবড়া দিয়ে প্রচুর ধুনো জ্বালিয়ে, টিপুর দিকে ছুঁড়তে লাগলো। চোখে-মুখে ধোঁয়া লাগতে মেয়েটির পক্ষে অসহ্য হয়ে গেল ঐ ধোঁয়ার জ্বালা। সে চীৎকার করে বলতে লাগলো, 'আমাকে ছেড়ে

দাও' আমাকে ছেড়ে দাও' বলে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! সকা বললো, 'এইবার যাবি কোথা, বল তুই এই মেয়েকে ছেড়ে যাবি কি-না?' ভয়ে ভয়ে টিপু প্রহারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বললো, 'হ্যাঁ'। সঙ্গে সঙ্গে চললো প্রচণ্ড প্রহার। জ্ঞান হারালো টিপু। সকা যুদ্ধবিজয়ী সেনাপতির মতো বললো, 'ডাইন ছেড়ে চলে গেছে, এবার বাড়ি নিয়ে যা।' সঙ্গে দিল নিজের তৈরি একটা মাদুলি। বললো, 'পূর্ণিমা-অমাবস্যা-একাদশী-প্রতিপদ ত্রয়োদশী তিথিতে এবং মাসিক ঋতু হওয়ার সময় এই মাদুলি ধারণ করা যাবে না, কৃষ্ণপক্ষের যে কোনও শনিবার এটা বামহাতে পরতে হবে। যেদিন পরবে সেদিন সামান্য জল ছাড়া আর কিছু খাওয়া চলবে না।' সবাইকে সাবধান করে সকা আবার বললো, 'এর চিরুনী, আয়না, অন্য কেউ যেন ব্যবহার না করে, এর ব্যবহৃত কাপড় কেউ যেন না পরে। তবে সাবধান, যে-ঘরে সদ্য কেউ মারা গেছে সেই বাড়িতে এই মেয়ে যেন না যায়, গেলে হাতের মাদুলি আপনা হতে আমার কাছে ফিরে আসবে।'

সত্যি সত্যি ফিরে আসে কি-না, তা পরীক্ষা করার সাহস কারও হয় নি। ইতিমধ্যে চাষের সময় এসে গেল, গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো ডাইন-এর বিচার করার জন্য। এলো গ্রামের বয়স্ক লোকজন, সঙ্গে বড় বড় জোত-জমির মালিকেরা। সকাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে আসতে হয়েছে। ঈশানকোণে ঘরটা যে কোথায়, কেউ খুঁজে পাচ্ছে না—কেউ বলছে ডানদিকে, কেউ বলছে বামদিকে। তবুও সবাই মিলে খুঁজে বের করলো এক বয়স্কা বউকে, যার পক্ষে বলার তেমন কেউ নেই, তবে চাষের জমি আছে দু-এক বিঘা। তাকে ডেকে আনা হলো বিচার-সভায়। এতজন পুরুষ মানুষের সামনে স্বাভাবতই বয়স্কা মহিলাটি মুখ নিচু করে রইলো। গ্রামের মোড়ল তাকে ডেকে বললো, 'পরামানিক ঘরের নতুন বৌটারে তুই কেন খেলি?' এতজন পুরুষ মানুষের সামনে কি উত্তর দেবে প্রথমে ভেবেই পেল না। 'ডাইন বিদ্যা' কি জানেই না, আর পরামানিক ঘরের নতুন বৌকে সে কোনও দিন দেখেও নি। 'কি চুপ করে আছিস কেন? উত্তর দে।'—মোড়ল গর্জে উঠলো। কোনও উত্তর আসে না। যে-লোকটা মোড়লের পাশে আছে, যে বহু জোতজমির মালিক, সে স-গর্জনে বললো, 'মোড়লের কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন? তোর পাঁচশো টাকা জরিমানা করা হলো।' তবুও কোন উত্তর নেই। তখন সবাই সিদ্ধান্ত নিল একে সকার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। সকা-ই বলবে এ ডাইন কি-না। যদি ডাইন হয়,

তবে এর পাঁচশো টাকা জরিমানা, আর পরামানিকের বৌকে খাওয়ার জন্য দু-হাজার টাকা, মোট আড়াই হাজার টাকা জরিমানা। তাছাড়া সকার কাছে সবাই যাবে, তাদের রাহা খরচ ও খাওয়ার খরচও দিতে হবে।

সতের-আঠার জন গেল সকার কাছে। সকা খুব চতুর। সে মনে মনে চিন্তা করে নিল, এই মেয়েকে ডাইন বলাও বিপদ, আবার না বললেও তার উপার্জন কমে যাবে। প্রথমেই সে বললো, 'এ ডাইন কি-না তা বিচার করার জন্য তিনশো টাকা লাগবে।' সবাই রাজি হলে.। টাকা তো আর তাদের দিতে হবে না। এই বৌটাই দেবে। সকা অনেকক্ষণ সময় ব্যয় করলো পিশাচমন্ত্র বলতে, মাটির পাত্রে ধুনো নিয়ে বৌটার চোখে-মুখে ধোঁয়া ছুড়তে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে সকা তার ঘষা কাঁচের আয়না বের করে দেখলো, আর জোরে জোরে বলতে লাগলো :

অগ্রে দেবতা বন্দি আমি
মাথা রেখে চরণে
ভূতা বন্দি, ভূতি বন্দি ভূতের প্রধান
কোথা যাবি এবার—
মা মনসার চরণে প্রণাম।

এর পর চারটে কাঁঠাল পাতা (শালপাতা বা বটপাতা পেলেও হয়) হাতে নিল—মোড়লের জন্য একটি, মোড়লের দুই সহকারীর জন্য একটি করে, এবং বাকি একটি, যাকে ডাইনে পেয়েছে অর্থাৎ টিপু পরামানিকের জন্যে। মন্ত্রপূত তেল, প্রথমে ঢাললো মোড়লের পাতার ওপর, তেল যদি গড়িয়ে না যায়, অর্থাৎ তৈল বিন্দুটি যদি অখণ্ড থাকে তবে মোড়ল ভালো। মোড়লকে খারাপ বললে তো সমূহ বিপদ, তাই তেলের বিন্দুটি এমনভাবে ফেললো—যাতে গড়িয়ে না যায়। তারপর তার দুই সহকারীর পাতাতে তেল ঢাললো এক্ষেত্রেও তেলের বিন্দুটি গড়িয়ে পড়লো না। এর অর্থ হলো মোড়ল আর তার দুই সহকারীর ধর্ম ঠিক আছে। শেষ পাতাটি অর্থাৎ টিপু পরামানিকের পাতায় তেল দিল, তেল গড়িয়ে পড়লো না। এরও অর্থ টিপু পরামানিকের ধর্মও ঠিক আছে। তখন উপস্থিত যারা সঙ্গে এসেছে, সকলের হাতে একটা করে পাতা দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ ডাইন সন্দেহ করা বৌটার জন্য। সকা, এবার প্রতিটা পাতায় তেল এমনভাবে ঢাললো, কেবল মাত্র ডাইন সন্দেহ করা ঐ বৌটার পাতা থেকে নয়, উপস্থিত অনেকের পাতা থেকে তেল গড়িয়ে পড়ে গেল। এর অর্থ হলো, ডাইন কেবলমাত্র ঐ বৌটাই নয়, যাদের পাতা থেকে তেল গড়িয়ে পড়েছে, তারা সবাই ডাইন। কিন্তু

কে নির্দিষ্ট ডাইন তা তো বোঝা গেল না। তখন মোড়ল বললো, 'সকা, ডাইন কে, ঠিক করে বলে দে।' সকা তখন 'খড়ি' পাততে বসলো। বড় সাদা খড়ি নিয়ে মাটিতে চকরা-বকরা কেটে গণনা করতে লাগলো। একটা বড় ছড়ি নিয়ে সকা প্রথমে মাটিতে মারলো, এবং রেগে গেছে এইরকম অভিনয় করতে লাগলো, আর মুখে জোরে জোরে বিড়বিড় করে কি বলতে থাকলো। এইভাবে এক ঘণ্টা তার অঙ্গভঙ্গি এবং মুখ-চোখের অভিব্যক্তি দেখে উপস্থিত গ্রামের সবাই মুগ্ধ হয়ে অথবা ভীত হয়ে অবলোকন করতে থাকলো। শেষে অতি চতুর সকা বললো, 'এ খুবই সাংঘাতিক ডাইন। এক সঙ্গে তো তোদের এত জনের তেল গড়িয়ে পড়ে গেল—তোরা সবাই ঐ ভয়ঙ্কর ডাইনের ছায়া মাড়িয়েছিস। তবে তোরা সবাই কোন্ ডাইনের ছায়া মাড়িয়েছিস তার বিচার করবে আমার গুরু। মেদিনীপুর জেলার, ঝাড়গ্রাম থানার সাপধরা গ্রামে চলে যা।' সে যদি না পারে, তবে ঝাড়গ্রামের পাশে বিহারের বহড়াগোড়ায় থানা মাউদা গ্রামের সকার কাছে যেতে নির্দেশ দিয়ে দিল। গ্রামের সবাই যে-যার বাড়িতে ফিরে এলো, সকা তার প্রাপ্য ফি ছাড়লো না। গ্রামে এসে আর কারও উৎসাহ থাকলো না এ-বিষয়ে। এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। চাষের কাজও শুরু হয়ে গেছে। ডাইন কে, বিচার করার সময়ও নেই। সব চাইতে বড় কথা—তাদের ভয়, কারণ তাদের অনেকেরই হাতের পাতা থেকে তেল পড়ে গেছে। মেদিনীপুরের বড় সকা যদি বলে দেয়, তারাও ডাইন, তবে তো সমূহ বিপদ, তাই মোড়ল থেকে শুরু করে, কেউ আর আগ্রহই দেখালো না। ব্যাপারটা এইখানেই ইতি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে টিপু পরামানিক, যাকে উপলক্ষ করে এত ঘটনা, সে বড় হয়ে গেছে। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌন মিলন সম্পর্কে সে সম্যক জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছে। তারমধ্যে আর কোন বৈলক্ষণ দেখা গেল না; তিন-চার বছর পরে তার একটি সন্তানও জন্মাল। আসল কারণ হচ্ছে, অতি-অল্প বয়সে বিয়ের জন্য, স্বামী কর্তৃক জোর করে যৌন-সম্ভোগের ফলে তার মনে ভীতির ভাব এসেছিল, এবং তার জন্য মানসিক বৈলক্ষণ দেখা গেছিল। তা-ই সবাই 'ডাইন'-এ পেয়েছে বলে ধরে নিয়েছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ-সমস্ত লক্ষণ দূর হয়ে যায় এবং আদর্শ দম্পতির মতো সংসার করতে লাগলো। মাঝখানে 'সকা' উভয়পক্ষ থেকে অনেক টাকা আদায় করে নিল এবং টিপু ও বয়স্কা বৌটি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হলো অকারণে।

* * *

১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে, মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি থানায় এক

আদিবাসী দম্পতিকে, স্থানীয় সকা 'ডাইনা', 'ডাইনি' হিসেবে ঘোষণা করে। কারণ আর কিছুই নয়, কয়েকদিন আগে ঐ দম্পতির এক আত্মীয় মারা যায় অস্বাভাবিক রোগে। পুলিশ অবশ্য বলে, মারা গেছে থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে। ইতিমধ্যে ঐ গ্রামের কয়েকটি শিশু অপুষ্টিজনিত রোগে ও আন্ত্রিক রোগে মারা যায়। স্থানীয় সকলের ধারণা হলো, এ নিশ্চয়ই ডাইনের কাজ। অনেকদূরে এক বড় সকার কাছে সবাই গেল গণনা করতে। সকা বললো, ঐ আদিবাসী দম্পতি 'ডাইনা-ডাইনী'। গ্রামে বিচার বসলো—জরিমানা হলো পাঁচ হাজার টাকা। এছাড়া যারা গণনা করার সময় গেছিল, তারা তাদের যাতায়াত ভাড়া, পারিশ্রমিক ইত্যাদি বাবদ এক হাজার টাকা খরচ হিসেবে দাবি করলো। এবং বিচারের রায় অনুযায়ী ঐ দম্পতির একবিঘে জমি ও চারটে গাছ বিক্রি করে টাকা আদায় করলো। —এইভাবে মেদিনীপুর জেলার কেসিয়াড়ি, ঝাড়গ্রাম, নায়াগ্রাম, নারায়ণ-গড়, বীনপুর প্রভৃতি এলাকাতে আদিবাসীদের ডাইনি আখ্যা দিয়ে 'সকা' প্রচুর টাকা-পয়সা উপার্জন করে থাকে।

পুরুলিয়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাতে সকাদের দৌরাত্ম এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস এখনো সাধারণ মানুষের অটুট আছে। শ্রীফটিক গোপ, এই জেলার একজন নামকরা সকা। তাকে তার বিদ্যার গুপ্তরহস্য কি জিগ্যেস করতে, প্রথমে একদমই মুখ খুলতে চায় নি। পরে বললো, 'আজকাল তাদের এই বৃত্তি সম্পর্কে অনেকে নিন্দা করে, কিন্তু কতো লোকের যে উপকার হয়েছে। বেলকুড়ি গ্রামের সুনীল রাজোয়াড়ের ছেলে-পুলে হচ্ছিল না, কত ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়েছে, আমার মন্ত্র আর মাদুলির গুণে তার ছেলে হয়েছে'—এইরকম কত উদাহরণ দিল। যেমন, বিহারের চাস থানার স্বপন বায়েন, ঝালদার রামপদ দাস এদের প্রত্যেকেরই ছেলে হয়েছে তার মাদুলির গুণে। 'এদের বৌদের ডাইন লেগেছিল তাই ছেলে হতো না, ডাইন ছাড়াতে তবে ছেলেপুলে হয়েছে'—বললো সকা ফটিক গোপ। ডাইন কি করে লাগে জিগ্যেস করতে বললো, 'সকলের ডাইন লাগে না, রাশি যোগে ডাইন লাগে। যাদের রাশি দুর্বল, তাদেরই ডাইন লাগে।' নিজের চল্লিশ বছরের 'সকা'-বিদ্যার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে, নরু গোপ বললো, 'তার গ্রামের পঁচিশ বছরের বিবাহিতা মেয়ে রাধারানী গোপ। সব সময় আজেবাজে কথা বকাবকি করতো। পাঁচ ছেলেমেয়ের মা। ছোট ছেলে যখন জন্ম নিল—হাসপাতালেই অজ্ঞান হয়ে গেল। ঘরে যখন ফিরে এলো সব সময় ঝিমুনি ভাব। কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করতো না তার, কত ডাক্তার-বদ্যি দেখানো হলো। সারলো কোথায়? হাসপাতালেই ডাইন

লাগলো। আমার কাছে এলো, আমিই তাকে সারিয়ে তুললাম। আর ডাইন তাড়ালাম।' সকা নরু গোপকে বলা হলো, 'রাধারাণী গোপ, এই অল্পবয়সে অনেক বাচ্চা প্রসবের জন্য দুর্বল হয়ে গেছিল, বাড়ি ফিরে বিশ্রাম এবং ভালো খাওয়া-দাওয়ার ফলে ভালো হয়েছে, এতে মাদুলি বা ডাইন কোথা থেকে এলো ?' সকা হাসতে হাসতে বললো, 'আপনারা যতই অবিশ্বাস করুন, এরা তো করে না। ধানবাদ-বোখারো থেকেও তো বড় বড় অফিসাররা আমার কাছে আসে গাড়ি করে।' দূরে দেখলামও, একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে এক সদ্য বিবাহিতা, সঙ্গে কয়েকজন বয়স্কা মহিলা এবং একজন সুসজ্জিত ভদ্রলোক বসে আছেন। অল্পবয়স্কা বিবাহিতা মহিলা উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আছেন।

মানুষ যে এখনও কি অন্ধকারে আছে—কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং জেনে-শুনেও সকার কাছে যায়, একটা উদাহরণ দিলে ভালোভাবে বোঝা যাবে। গত বছর এপ্রিল মাসের কথা। আমার খুব পরিচিত তিরিশ বছরের যুবক—পুরুলিয়া শহরের সরকারি কর্মচারী—সন্তোষ বাউড়ি, মানবাজার ২নং জামতড়িয়া থানায় বারি গ্রামে ঘর। তার ছোট ভাই কেমন যেন হয়ে গেছে, সব সময় উদাসভাবে থাকে, ঘরের কাজকর্ম তেমন কিছুই করছে না। আগে প্রচুর কাজ করতো—এখন কাজ করতে বললে বিরক্ত হয়। বয়স আঠার-উনিশ হবে। পাড়ার সবাই বললো একে ডাইনে পেয়েছে, নাহলে যে ছেলে মাঠে এত কাজ করতো, সারাদিন এত পরিশ্রম করতো, সে কেন চুপচাপ উদাস মনে বসে থাকবে। ডাইন যখন পেয়েছে তবে চলো 'সকা'র কাছে। প্রথমে ছেলের বাপ আর দাদা এলো সকার কাছে। ভোর হওয়ার অনেক আগেই বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে, হেঁটে আসতে হবে অনেক রাস্তা। মানবাজার এসে বাস ধরে পুরুলিয়া, পুরুলিয়া থেকে বেলকুড়ি সাধুর আশ্রম বাসে করে পৌঁছাল নরু সকার কাছে। সকলের আগে আসতে হবে—যেন সকা দিনের প্রথম পিশাচসিদ্ধ মন্ত্র তাদের প্রতি নিক্ষেপ করে। পথে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে দেখা। যেহেতু পূর্ব পরিচিত, তাই কি উদ্দেশ্যে আগমন জিগ্যেস করতে, সবিস্তারে সব ঘটনা জানতে পারা গেল। তাকে বলা হলো—তোমার ভাই কৈশোর থেকে যৌবনে সবে মাত্র পদার্পণ করেছে। তাই এই বয়সে শরীর ও মনের পরিবর্তন আসে। নর-নারীর যৌন বিষয়ের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য এই ধরনের অস্বাভাবিকতা দেখা যাচ্ছে। একে বরং কোনও মানসিক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে ভালো হতো। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। পরে শুনলাম, সকা সন্তোষ বাউরিকে বলেছে, তার ডাইনগ্রস্ত ভাইকে সে এখান থেকেই 'বাণ' নিক্ষেপ করবে, ডাইনের হাত হতে

রক্ষা করে দেবে, তাতেই তার ভাই ভালো হয়ে যাবে। এতে এক হাজার টাকা লাগবে। সন্তোষ বাউড়ি সকাকে নির্দ্ধিধায় টাকা দিয়ে দিল—হাজারবার বারণ করা সত্ত্বেও। এরও মাস পাঁচেক পরে, আবার দেখা হয়েছিল সন্তোষ বাউড়ির সঙ্গে। ভাই কেমন আছে জিগ্যেস করতে বলেছিল, ভাই-এর পাগলামি আরও বেড়ে গেছে এবং আমার পরিচিত কোনও ভালো মানসিক চিকিৎসক আছে কি-না এবং তার ঠিকানাও দিতে অনুরোধ করেছিল।

অলোকনাথ মিশ্র

মে ১৯৮৮

ডাইন

বিহারের ধানবাদ জেলার একেবারে ভেতর দিকের একটি গ্রাম চন্দনকেয়ারী। ১৯৮৮-র মার্চ-এ সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। কলকাতা শহরের বাড়ি-গাড়ি আর শব্দের ভিড় থেকে রেহাই পাওয়ার পক্ষে জায়গাটা ভালোই। জানলায় দাঁড়ালে চোখ দুটো মাঠ-ঘাট পেরিয়ে গিয়ে আটকাবে সে-ই বহুদূরে, সবুজ দিয়ে ঘেরা দিগন্তরেখায়, আকাশ আর গাছ যেখানে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে মত্ত।

কিন্তু এটুকুই সব নয়। বোখারো, ঝরিয়া আর সাঁওতালডি দিয়ে ঘেরা চন্দনকেয়ারী গ্রামটি জুড়ে আছে এক বিরাট অন্ধকার। এই গ্রামের মানুষগুলো শিক্ষার আলোকে আলোকিত নয়। অসম্ভব দরিদ্র। নানা রকমের কু-সংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই এরা দিন কাটায়। ওদের এই বিশ্বাসের শেকড় এত গভীরে যে, এর জন্য ওরা মানুষকে মেরেও ফেলতে পারে। গ্রামের মুখিয়া, সরপঞ্চ, এম এল এ-রা পর্যন্ত অনেক সময়ে জনসমর্থন হারানোর ভয়ে এদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যেতে পারে না।

এই রকমই একটি সংস্কার হলো 'ডাইন'। গ্রামের কোনও মহিলাকে যদি সন্ধ্যের পর জঙ্গলে ঢুকতে দেখা যায়, (ওখানে প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য জঙ্গলেই ঢুকতে হয়) অথবা নিজের মনে কথা বলতে দেখা যায়, তাহলেই সবাই

ধরে নেয় যে—ও 'ডাইন' হয়েছে। এই অবস্থায় যদি গ্রামে কোনও অসুখ-বিসুখ হয়, তাহলে তার দায় চাপানো হয় ওই মহিলার ওপরে। রোগী যদি মারা যায়, তাহলে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ওই ডাইনেই মেরে ফেলেছে, অতএব ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হোক। আর রোগী যদি শুধুমাত্র অসুস্থ হয়, তাহলে ডাইনকে শাস্তি দেওয়া হোক। তাকে 'সখা'র কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সখা ঝাড়-ফুঁক করে, মন্ত্র পড়ে। তারপর ডাইনকে তার নিজের মল-মূত্র খাওয়ায়। আর কখনো হাজার, কখনো দু-হাজার টাকা জরিমানা করে। এই টাকার অর্ধেকটা যায় সখার পকেটে আর বাকি অর্ধেকটা নিয়ে গ্রামের মাতব্বররা মদ-মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করে।

ডাইন সম্পর্কে এই সব তথ্য জানা গেল গ্রামের বয়স্ক মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে। বেশ কয়েকজন পুরুষও এই একই কথা বললেন। এগুলো জানার পর, ডাইন হয়েছে এমন একটি পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। আলাপ হলো পরান মাহাতোর সঙ্গে।

পরান জাতিতে মাহাতো। চামড়াবাদ টোলায় ওর ঘর। বড় হবার, ভালো-ভাবে বাঁচবার বাসনা ছিল ওর। তাই নিজের চেষ্টায় অল্প কিছু লেখা-পড়াও শিখেছে। যে কোনো ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে বোঝার, বিশ্লেষণ করার প্রবণতা ওর মধ্যে আছে। এই পরানের মা-কে দু-বার ডাইন বানানো হয়েছিল। এতে পরানের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, আর এই ঘটনার মোকাবিলা সে কেমন করে করেছে, সেটা তার জবানীতেই লিখছি—অবশ্য ভাষান্তরিত করে :

'ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি যে, গ্রামে ডাইনের উৎপাত আছে। অনেক সময় গ্রামের অনেক মেয়েলোককে ডাইন হিসাবে শাস্তিও পেতে দেখেছি। শাস্তিটা এত কঠিন আর এত জঘন্য যে, ছোট থেকেই তা খারাপ লাগত। বড় হবার পর, কেউ ডাইন হয়েছে শুনলে খারাপ লাগত। কিন্তু ব্যাপারটাকে একে-বারে উড়িয়ে দিতে পারতাম না। মনে মনে একটা ভয়ও ছিল। এইরকম বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি জায়গাতেই দীর্ঘদিন কেটেছে। কিন্তু একসময় আমার জীবনে এমন দু-টি ঘটনা ঘটল, যার ফলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এখন আমি জোরের সঙ্গেই বলতে পারি যে ডাইন বলে কিছু নেই। আমাদের ভয় আর অজ্ঞতাই ডাইন তৈরি করেছে।

'আমার বাড়িতে প্রথম ঘটনা ঘটে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে। তখন আমি বোখারোতে কারখানায় চাকরি করি। ওখানেই থাকতাম। মাসে একবার

বাড়ি আসতাম। একবার প্রায় মাস দেড়েক বাদে বাড়ি এসেছি। এসে দেখি, আমাকে দেখামাত্র আমার মা-বউ সব কাঁদতে শুরু করেছে। প্রথম একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ওদের কাছে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম যে—গ্রামসভা আমাদের একঘরে করেছে। এই টোলার কেউ আমাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করবে না, কথা বলবে না, জল নিতে দেবে না ইত্যাদি। কারণ সখা বলেছে, আমার মা নাকি ডাইন হয়েছে। স্থতরাং গ্রামসভার নির্দেশ অমান্য করে কেউ যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলে, তবে তাকে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। এই কথা শুনে প্রথমটায় আমার খুব ভয় হয়েছিল। এমন কেউ নেই, যার কাছে পরামর্শ চাইব। কি করবো ঠিক করতে না পেরে একজন মাতব্বরের কাছে গেলাম। তার মুখে শুনলাম যে, এক মাসের মধ্যে গ্রামের একজন লোকের মেয়ে এবং বউ পরপর মারা যায়। (যেহেতু গ্রামে ডাক্তার নেই তাই কেউ জানে না কেন মারা গেছে।) লোকটা তখন ভয় পেয়ে মাতব্বরদের কাছে ছুটে আসে। তারা ওকে নিয়ে যায় সখার বাড়ি। সখা গুনে-গেঁথে বলেছে যে, ওই লোকটির বাড়িতে ডাইন ঢুকেছে। তার জন্যেই ওর মেয়ে-বৌ মারা গেছে। মাতব্বরদের মধ্যে মদন মাহাতো একজন প্রভাবশালী লোক, সে সখার কথাকে অস্বীকার করে বলেছে যে, পরানের মা ডাইন হয়েছে। সে দেখেছে পরানের মাকে ডাইন হতে। কিন্তু সখার কথার বিরোধিতা করার জন্য সখা রেগে গিয়ে মদনকে চড় মেরে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে। তখন সে অন্যান্যদের নিয়ে গেছে পাশের গ্রামের অন্য এক সখার কাছে। সেই সখা গুনে-গেঁথে রায় দিয়েছে যে, পরানের মা-ই ডাইন। সে-ই ওই দু-জনকে মেরে ফেলেছে। এই কথা শোনার পর আমি তাকে জিগ্যেস করলাম, ডাইন তাড়াতে গেলে কি করতে হবে? মাতব্বর জানাল, মাকে সখার কাছে নিয়ে যেতে হবে, আর এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। আমি তাতে রাজি হয়ে গেলাম। সেই সময় আমার কাছে টাকা ছিল না। পরের দিন আমি বোখারো গিয়ে টাকা ধার করে এনে ওদের দিলাম। ওরা মাকে নিয়ে গেল সখার কাছে। সখা ফুল ছুড়ে মন্ত্র-তন্ত্র বলে ঝাড়-ফুঁক করল আর মাকে তার নিজের মল-মূত্র খাওয়াল। তারপর গুণে-গেঁথে বলল, ডাইন ছেড়ে গেছে। ওই টাকার অর্ধেকটা সখা নিল, বাকিটা দিয়ে মাতব্বররা মদ-মাংস খেয়ে ফূর্তি করল।

'সেদিনের পুরো ব্যাপারটা আমার খুবই খারাপ লেগেছিল, কিন্তু কিছু করতে পারি নি। এরপরে গ্রামে পর পর দুটো ঘটনা ঘটে। যার ফলে আমি বুঝতে পারি যে, ডাইনি-র ব্যাপারটা একদল লোকের বদমাইসি। কিন্তু আমি

তো একা, ওদের সঙ্গে পারবো কেন? তাই ঘটনা ঘটে গেলেও কিছু করতে পারি নি। মা-র ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আমি আবার বোখারোয় ফিরে গিয়েছিলাম সেখানে বসেই খবর পেলাম বিন্দুর মা ডাইন হয়েছে। এই মহিলার একা বিন্দু ছাড়া আর কেউ নেই। ওদের অল্প কিছু জমি ছিল। সেই জমি চাষ করেই ওদের খাওয়া-পরা চলতো। তখন আশ্বিন মাস, পাকা ধান কাটতে আর দু-চার দিন বাকি। এই সময় জানা গেল যে, বিন্দুর মা ডাইন হয়েছে। আমাদের মতো ওদেরও গ্রামসভা একঘরে করেছে। দু-হাজার টাকা জরিমানা দিলে সখায় ডাইন ছাড়িয়ে দেবে বলেও জানিয়েছে। গ্রামের মধ্যে একঘরে কে আর থাকতে চায়? কিন্তু বিন্দুদের কাছে অত টাকা ছিল না, তাই তারা বাধ্য হয়ে সেই পাকা ধান শুদ্ধ জমি বিক্রি করে দু-হাজার টাকা জোগাড় করে ওদের দিয়েছে।

'এই ঘটনার কিছুদিন বাদে, তখন আমি বোখারোর কাজ ছেড়ে এসেছি। হঠাৎ একদিন মাঠ থেকে ফিরে শুনলাম বংশীর মা ডাইন হয়েছে। আর গ্রামের লোকেরা বংশীর মাকে মারতে গেছে। দৌড়ে বংশীদের ঘরে গিয়ে দেখি, বংশীরা চার ভাই লাঠি সোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে, যে ওদের মা-র গায়ে হাত দেবে ওরা তাকে মেরে ফেলবে। বাধ্য হয়েই সবাই ফিরে গেল। কিন্তু পরদিন গ্রামসভা ওদের জানাল যে, দু-হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। ওরা চার ভাই জানিয়ে দিল যে ওরা নিজেরা সখার কাছে গিয়ে মা-র ডাইন ছাড়িয়ে আনবে, টাকা ওরা দেবে না। তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলাম কেউ আর ওদের বিশেষ ঘাঁটাল না। এই ঘটনায় আমার চোখ খুলে গেল। বুঝলাম যে, শক্ত হয়ে রুখে দাঁড়ালে এইরকম অন্যায়ের প্রতিকার করা যায়।

'এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন ভালোই চলছিল। ইতিমধ্যে আমি কলেজের চাকরিতে ঢুকেছি। গ্রামেই থাকি। গত বছর আশ্বিন মাসে করম পুজোর দিন গ্রামের মেয়েরা দল বেঁধে পুজো সেরে ঘরে ফিরছিল। হঠাৎ ঘরের সামনে এসে একটি মেয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম শুদ্ধ লোক দৌড়ে এলো, আর তারা এক সঙ্গে বলতে লাগল যে পরানের মা ডাইন। সেই-ই মেয়েটাকে ফেলেছে। আমি এই সময়ে ঘরে ছিলাম না। ঘরে ফিরে সব শুনে আমার হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাতব্বরের কাছে গেলাম। গিয়ে চীৎকার করে বললাম, আমার মা ডাইন হয়েছে তার প্রমাণ কি? ওরা জানাল গ্রামের সবাই দেখেছে মেয়েটাকে পড়ে যেতে। আমিও বললাম যে—ও অনেক কারণেই পড়ে যেতে পারে। ডাইনে ফেলেছে কে বলল? ওরা উত্তর

দিল সথায় বলেছে। আমি বললাম বার বার আমার মা-ডাইন হয়। তিন বছর আগে টাকা দিয়ে মন্ত্র পড়ে ডাইন তাড়ানো হয়েছে, আবার ডাইন ঢুকেছে! ঠিক আছে এবার আর আমি টাকা দেবো না। তোমরা যা-পার করো। ওরা আমাকে একঘরে করার ভয় দেখাল। আমি-ও রেগে বললাম—যা-ইচ্ছা করো, টাকা দেবো না ব্যাস। বেশি কিছু করলে আমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু বাড়ি-ঘর বেচবো না। এবারে কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে মিটল না। যেহেতু মেয়েটাকে সবাই আমাদের ঘরের সামনে পড়তে দেখেছে সুতরাং সারা গ্রামের মানুষ আমার বিরুদ্ধে চলে গেছে। এমনকি মুখিয়া, সরপঞ্চ পর্যন্ত এসে আমাকে টাকা দিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেছে। একমাত্র কলেজের এক মাস্টার-বাবু আর তার বন্ধু এরা দু-জন আমাকে সমর্থন করেছেন। তারা টাকা না দিতে বলেছেন। শুধু তাই নয়, তারা মুখিয়াজীকে ডেকে কি বুঝিয়েছিলেন জানি না, তবে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি দেখলাম যে, গ্রামের মানুষেরা আবার একজন দু-জন করে আমার সঙ্গে কথা বলছে। কুয়োর জলও নিতে দিচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে সবাই আগের মতো ব্যবহার করেছে। এখনও পর্যন্ত আর কোনও গোলমাল হয় নি। শক্তভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম বলেই ডাইন তাড়াতে পেরেছি বলে আমার ধারণা।'

এরপর আমি কলেজের মাস্টারমশাই ভদ্রলোকের সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারি যে, ওরা মুখিয়াজীকে ডেকে সরাসরি আইনের ভয় দেখিয়েছিলেন। ওরা বলেছিলেন যে, গ্রামে যদি কোন মারামারি বা খুনোখুনি হয়, পরানের ওপর যদি কোনও আক্রমণ হয়, তাহলে তারা মুখিয়ার বিরুদ্ধে পুলিশে জানাবেন, এবং সরকারি ওপর মহলে রিপোর্ট করবেন। তারা এই কথা বলার পর মুখিয়াজী গ্রামের মানুষজনকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ঠাণ্ডা করেন।

সবশেষে চলে আসার আগে গেলাম মুখিয়ার সঙ্গে কথা বলতে। ওর কাছে প্রশ্ন রাখলাম, 'আপনি বিশ্বাস করেন যে ডাইনি আছে?'

উত্তরে উনি জানালেন, 'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। গাঁয়ের মানুষ বিশ্বাস করে—এটাই বড় কথা। যখন কোনো একজনকে গাঁয়ের সবাই মিলে ডাইনি বলে চিহ্নিত করে, তখন আমাদের ক্ষমতা থাকে না তার বিরোধিতা করার। বিরোধিতা করলে অনেক রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যেমন ধরুন পরানের মা র ব্যাপারটা। আমি বুঝতে পারছিলাম, পরান টাকা দিতে রাজি না হলে বড় রকমের একটা গণ্ডগোল বাঁধবে। তাই আমি পরানকে টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু পরান টাকা দেয় নি।

গণ্ডগোল হয়তো লাগত, কিন্তু কলেজের বাবুরা আমাকে ডেকে কতকগুলো বিষয় বুঝিয়েছিলেন। তারপর আমি সখার কাছে গিয়ে তাকে বলি যে, এইভাবে উলটো বলে মানুষকে ক্ষেপিয়ে দিলে, যদি মারামারি হয়, তখন তার পুরো দায় সখা-র ওপর বর্তাবে। তারপর সখাই সকলকে ডেকে বুঝিয়ে বলে।'

তবে কথা-প্রসঙ্গে মুখিয়াজী এটা-ও জানালেন যে, যেহেতু গ্রামের মানুষের কোনও শিক্ষা নেই, তাদের জানার পরিধি খুবই ছোট, তাই তারা এই ধরনের বিশ্বাস নিয়ে চলে। এগুলো জোর করে বন্ধ করা যায় না। পুলিশের ভয়ে হয়তো সাময়িকভাবে চাপা থাকবে, কিন্তু সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দেবে। সব-চেয়ে বড় কথা গ্রামে কোনও ডাক্তার নেই। কারুর অসুখ-বিসুখ হলেই সখার ঝাড়-ফুঁকই ভরসা। তার শেকড়-বাকড়, জড়ি-বুটিতেই আমাদের রোগ সারে। তাই সহজে সখার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে না।

সত্যি, কি অসীম ধৈর্য এই মানুষগুলির। স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও বিনা প্রতিবাদে চার কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে এরা 'হাটিয়া' যাচ্ছে; কেরোসিনের ডিব্বা জ্বালিয়ে ঘরের অন্ধকার তাড়াচ্ছে; অসুখে-বিসুখে সখার ওপরেই নির্ভর করে থাকছে। আর ডাইনি-ভূত-প্রেত-সখা ইত্যাদি নিয়ে সুখে-দুঃখে জীবন কাটাচ্ছে।

পূরবী ঘোষ

মে ১৯৮৮

মহাভারতে কামান-বন্দুক

সেদিন চায়ের টেবিলে আমাদের 'ব্রজদা' বলছিলেন, কামান-বন্দুক? ও তো কবেই ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। সেই রামায়ণ-মহাভারতের সময়। বিশ্বাস না হয় তো রামায়ণ মহাভারত পড়ে দেখ্। 'শতঘ্নী' নামের অস্ত্রটা তো কামান, আর নালীক, কণপ, ভিন্দিপাল, এসব হলো বন্দুক।

শুনলে চমক লাগে। কিন্তু এধরনের দাবি কতটা যুক্তিসঙ্গত তা ভেবে দেখা দরকার। আমাদের দেশ কোন এক অতীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে অত্যগ্রসর ছিল এমন একটা ধারণা কারও কারও আছে। কালক্রমে

সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মান উন্নীত হয়নি, বরং অবনমিত হয়েছে। যা প্রচলিত ছিল তা লুপ্ত হয়ে গেছে। যা ব্যবহৃত হতো তা বিস্মৃত হয়ে গেছে। এই লেখায় আমরা শতঘ্নীনালীকাদির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ধারণার যাথার্থ্য আলোচনা করব। অর্থাৎ আলোচনা করব শতঘ্নীনালীকাদি বারুদ-ব্যবহারক আগেয়াস্ত্র ছিল কি না। আমাদের আলোচনা হবে প্রধানত মহাভারতের সাক্ষ্যকে ভিত্তি করে।

চণ্ডীদাস বিদ্যারত্ন লিখেছেন, 'রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন হিন্দুগণ যুদ্ধে যথেষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতেন···বারুদের ব্যবহার ভালরূপে জানিতেন[১]।' তার যুক্তি, শতঘ্নী মানে যা শত হনন-করে, এ কামান ছাড়া আর কি হতে পারে? অন্যত্রও শতঘ্নীর এই অর্থ উল্লিখিত হতে দেখা যায়[২]। বন্দুক পদের প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছে একাধিক অস্ত্রকে : নালীক, কণপ, ভিন্দিপাল, ক্ষেপণীয়, তুলাগুড, অয়োগুড[৩]। নালীককে বন্দুক ভাবার কারণ, নালীকের অর্থ যার-নল-আছে এবং বন্দুক বস্তুটিরও নল আছে। কণপ মানে যা-কণা-পান করে। বন্দুকে গুলি ভরার ব্যাপারটিকে বন্দুকের অগ্নিকণা পান করার রূপক পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে, বন্দুক আর কণপ-এর সমীকরণ করে দেওয়া হয়েছে। যা-ভেদ করে এমন জিনিস যে-পালন করে, তারই নাম ভিন্দিপাল। বন্দুকে গুলি থাকে আর গুলি শত্রুকে ভেদ অর্থাৎ বিদ্ধ করতে পারে। সুতরাং বন্দুক ভেদকারী কিছু বস্তুর পালক, বা ভিন্দিপাল।

যা-ক্ষেপণ-করে তাই ক্ষেপণীয়। বন্দুক গুলি ছোঁড়ে, তাই বন্দুক ক্ষেপণীয়। গুড মানে গোলক। মহাভারতের বনপর্বের ৪২ অধ্যায়ে আবার তুলাগুডকে বায়ুস্ফোট, অশ্বনির্ঘাত, মহামেঘস্বন ও চক্রযুক্ত অস্ত্র বলে বর্ণিত। তুলাগুড ও অয়োগুড (লোহার গোলক) তাই কামান-বন্দুকের গোলাগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্যর এ এম এলিয়টের মতে আরবীয়রা ভারতীদের কাছেই বারুদ বানাতে শেখে, এবং যদিও পারস্যে saltpetre প্রচুর ছিল, তবু বারুদের জন্ম ভারতেই। তুর্কী 'তোপ' এবং পারসিক 'তুপাং' বা 'তুফাং' সংস্কৃত ধূপের অপভ্রংশ। যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধিও বলেছেন যে, বারুদের উৎপত্তি ভারতে, চীনে বা পারস্যে নয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই মতটি তেমন প্রতিষ্ঠিত নয়। তাছাড়া এলিয়ট বা যোগেশচন্দ্ররও এমন দাবি নেই যে, মহাভারতের যুদ্ধের আগেই ভারতে বারুদের উদ্ভাবন হয়ে গেছে। যদি বা বারুদ ভারতেই উদ্ভাবিত হয়ে থাকে সে হয়েছে কুরুক্ষেত্রের বহু পরে।

বারুদের জন্মস্থান এবং জন্মতারিখ নিয়ে তর্কে আমরা যাব না। আমাদের

মতের ভিত্তি হবে মহাভারতের সাক্ষ্য। মহাভারতের সাক্ষ্যে এমন কিছু নেই যা থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষে বারুদের অস্তিত্ব ও ব্যবহার প্রমাণিত হয়। বারুদের সরাসরি উল্লেখ তো নেই-ই, বারুদ ব্যবহার করলে যে সশব্দ সধূম বিস্ফোরণ হবার কথা শতঘ্নীনালীকাদির ক্ষেত্রে তারও উল্লেখ নেই। উৎক্ষেপক শক্তি হিসাবে যে আয়ুধ বারুদ ব্যবহার করে তার দূরগামিতা ও দ্রুতগামিতা সাধারণ বাণ-বর্শাদির থেকে অনেক বেশি হবার কথা। দূরগামিতা ও দ্রুতগামিতা যেখানে লক্ষণীয় মহাভারতকার সেখানে তা লিপিবদ্ধ করেছেন-ও, যথা দ্রোণপর্বের ৮৮ তম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে। শতঘ্নীনালীকাদির ক্ষেত্রে ঐ দু-টি গুণের কোন বিশেষ উল্লেখ নেই। তাছাড়া মূলত যেখানে তীর বর্শা গদা খড়্গ ফাঁস ইত্যাদি অস্ত্রই প্রচলিত, সেখানে বারুদব্যবহারক আগ্নেয়াস্ত্র উচ্ছসিত ভাষায় সাড়ম্বরে উপ-স্থাপিত হবার কথা। শতঘ্নীনালীকের উপস্থাপনা কিন্তু সাদামাটা। শতঘ্নীনালীক শত্রুদের মনে কোন বিশেষ ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল এমন কথা মহাভারতে নেই। স্পেনের বন্দুক ইন্‌কাদের মধ্যে কিংবা কমোডর পেরীর গানবোট টোকুগাওয়া জাপানে, যে সবিস্ময় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, তা শতঘ্নীনালীক পারে নি। শতঘ্নীনালীক কামানবন্দুক হয়ে থাকলে তো ওরকমটা হবার কথা নয়।

সেক্ষেত্রে, শতঘ্নীনালীক কি ধরনের জিনিস হয়ে থাকতে পারে?

বারো-শ' খ্রীষ্টাব্দের আদ্যে রচিত 'বৈজয়ন্তীকোষ' শতঘ্নীকে 'অয়ঃকণ্টক-সংছন্না মহাশিলা' বলে ব্যাখ্যা করেছে। লোহার কাঁটায় ভরা বিশাল পাথর গড়িয়ে দিলে তার চাপে এবং তার কাঁটার খোঁচায় একসঙ্গে অনেক লোক মরতে পারে। যোগেশচন্দ্র রায় এই মত গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। তার বাড়তি যুক্তি হলো যে, রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে শতঘ্নী 'শাণিত' হবার কথা আছে, কিন্তু কামান তো শাণিত হয় না। বরং পাথরে বসানো লোহার কাঁটাগুলো শাণিত হবার একটা মানে আছে। তাছাড়া রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে শতঘ্নী 'মুষল' শব্দের সান্নিধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, হয়তো তারা একই ধরনের কাজ করত বলে অর্থাৎ মুষলের মতো শতঘ্নীও হয়তো পেষণকার্য করত—কামানের কাজ করত না[৪]। সুখময় ভট্টাচার্য মহাভারতের কালে কামান ছিল কি-না তা বলা 'সুকঠিন' বলেই ছেড়ে দিয়েছেন, শতঘ্নীর দু-টি অর্থই উল্লেখ করেছেন[৫]। অন্যত্রও শতঘ্নীর এই দ্বিতীয় অর্থটি উল্লিখিত[৬]। যোগেশচন্দ্র রায় তুলাগুডকে তুলা বা lever নিক্ষিপ্ত গোলক বলেছেন, এবং সঙ্গে বলেছেন, 'অয়োগুডও এই বোধ হয়'[৭]। দীক্ষিতারও এদের লোহা বা পাথরের গোলক হিসাবেই নিয়েছেন[৮]। সুখময় ভট্টাচার্য ভিন্দিপালকে হস্তক্ষেপ্য লগুড় বা হস্তপ্রমাণ শর বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

দীক্ষিতার ভিন্দিপালকে ভারী মুদ্‌গরমাত্র মনে করেছেন[১০]। বামন শিবরাম আপ্তে ভিন্দিপালকে দুটো অর্থে নিয়েছেন ; ভিন্দিপাল হাতে-ছোড়া ছোট বর্শা অথবা পাথর-ছুড়ে-মারা গুলতি[১১]। আপ্তে 'ক্ষেপণি' বা 'ক্ষেপণী'র অর্থ করেছেন এমন কোন যন্ত্র (যথা গুলতি) যা থেকে কোন অস্ত্র (পাথর, তীর) ছুঁড়ে মারা যায়।[১২] যোগেশচন্দ্র রায় বলেছেন, বন্দুক গুলি পান করে না—উদ্‌গীরণ করে, গুলি-উদগীরণকারী নাম না করে গুলি-পানকারী নাম তার কেন হবে ? তাছাড়া খাণ্ডবদাহনে কৃষ্ণার্জুন 'অয়ঃকণপচক্রাশ্মভূশুণ্ডী-উদ্যত-বাহাঃ' হয়েছিলেন। হাতে বন্দুক থাকলে তারা পাথর (অশ্ম, ভূশুণ্ডী) ছুড়তেন কি ? অমরকোষে কণপ (কোন সংস্করণে 'কুণয়') এক ধরনের শর। কেশবকোষ ও মহেশ্বরটীকায়ও যথাক্রমে 'কণয়' ও 'কুণপ' শব্দের অর্থ শর। শব্দকল্পদ্রুমে 'কুণপ' শব্দের অর্থ বর্শা। দেবনাগরী 'প' ও 'য' সদৃশাকৃতি, একটি 'উ' কারে-ও গোলমাল হওয়া খুবই সম্ভব। যোগেশচন্দ্র তাই কণপ, কুণপ ও কণয় 'একেরই তিন রূপ' বলেছেন। কণপ সেক্ষেত্রে বর্শা, 'অয়ঃকণপ' লোহার বর্শা[১৩]। দীক্ষিতারও বলেছেন কণপ হয়তো মৎস্যপুরাণের 'কুণপ' মাত্র[১৪]।

যোগেশচন্দ্র রায় জানিয়েছেন যে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে নালীক 'তীক্ষ্ণাগ্র' ও 'ধনুগু'ণচ্যুত' বলে উল্লেখিত। মহাভারতে নালীক ও নারাচ প্রায়ই একত্র উল্লিখিত। 'বাণধারা'র মধ্যে সমাবিষ্ট। বৈজয়ন্তীকোষে 'নালিক' মানে বাণ। যোগেশচন্দ্র বলেছেন যে, নারাচ ভারী বলে যে-সে ছুড়তে পারত না। তখন মানুষ নারাচের দণ্ডটা ফাঁপা করে দিয়ে নলাকার-দণ্ড-যুক্ত নালীক উদ্ভাবন করে থাকতে পারে। অর্থাৎ নালীক এমন বাণ বা বর্শা যার দণ্ডটা নিরেট নয়, ফাঁপা এবং সেই কারণে অপেক্ষাকৃত হালকা[১৫]। সুখময় ভট্টাচার্যের মতে নালীক 'অন্তশ্ছিদ্র' শর, যার অন্তে ছিদ্র আছে এমন দণ্ডবিশিষ্ট শর, অর্থাৎ ওই ফাঁপা বা নলাকার দণ্ড-বিশিষ্ট শর[১৬]। দীক্ষিতারও নলীককে বাণমাত্র বলেছেন[১৭]।

শতঘ্নী নালীক কণপ ভিন্দিপাল ক্ষেপণীয় তুলাগুড ও অয়োগুডের এই দ্বিতীয় ধরনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে, তারা বাণবর্শাগদাখড়্গভূশুণ্ডী ইত্যাদি যে অনতি-অগ্রসর সভ্যতা ইঙ্গিত করে তার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। ফায়ার-আর্ম্‌স্ বা আগ্নেয়াস্ত্র হলে শতঘ্নীনালীকাদি ওই পটভূমিকায় অত্যন্ত অসমঞ্জস হতো। কিন্তু তারা যদি বাণ, বর্শা, গুলতি, পাথরের টুকরো এমন কি লোহার কাঁটা-ওয়ালা পাথরের চাঙড়ও হয়, তাহলে কুরুক্ষেত্রে ব্যবহৃত বাণবর্শাগদাখড়্গাদির সঙ্গে তাদের একই দলে ফেলে দেওয়া যায়। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে তারা মোটামুটি একই পর্যায়ের আয়ুধ। কারিগরি বিদ্যার যে স্তর তারা নির্দেশ করে, তৎকালীন

সভ্যতার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মান সম্বন্ধে আমরা যা জানি, তার সঙ্গে সেটার বিরোধ নেই। শতঘ্নীনালীকাদি আগ্নেয়াস্ত্র হলে ওই বিরোধটা থাকত, এবং সেটাই শতঘ্নীনালীকাদিকে যারা আগ্নেয়াস্ত্র বলে প্রচার করতে চান তাদের বক্তব্যের চমক। যতই চমকপ্রদ হোক্ ঐ ধারণায় এমন কোন যুক্তি নেই যা অকাট্য।

উল্লেখপঞ্জী :

১. চণ্ডীদাস মজুমদার বিদ্যারত্ন, 'প্রাচীন হিন্দু জাতির যুদ্ধবিদ্যা', প্রবাসী, ১৩৩০ শ্রাবণ

২. শুক্রনীতিসার ; বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদ ; দীক্ষিতার, *War in Ancient India*, pp. 105-6, 115 ; সুখময় ভট্টাচার্য, মহাভারতের সমাজ, পৃ. ৫০২-৩ ; সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন, পৃ. ২৫

৩. নীলকণ্ঠের টীকা ; সুখময় ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত পৃ. ৪৯৯ ; আনন্দময় মুখোপাধ্যায়, রামায়ণযুগে ভারতসভ্যতা, পৃ. ১৩১ ; দীক্ষিতার, পূর্বোক্ত, pp. 104-5, 107; সুবলচন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গালা অভিধান, পৃ. ৭০৩, ৪০৮, ৯৫৮

৪. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ধনুর্বেদ, পৃ. ২৫, ৩০-৩১

৫. সুখময় ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০২-৩

৬ দীক্ষিতার, পূর্বোক্ত, p. 105 ; সুবলচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত পৃ. ১১২৭ ; সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত

৭. যোগেশচন্দ্র রায়, ধনুর্বেদ, পৃ. ৩৫

৮. দীক্ষিতার, পূর্বোক্ত, p. 104

৯. সুখময় ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০২

১০. দীক্ষিতার, পূর্বোক্ত, p. 106

১১. বামন শিবরাম আপ্তে, *The Student's Sanskrit-English Dictionary*, p. 406

১২. আপ্তে, ঐ, p. 173

১৩. যোগেশচন্দ্র রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

১৪. দীক্ষিতার, পূর্বোক্ত, p 104

১৫. যোগেশচন্দ্র রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪, ৩২-৩৩

১৬. সুখময় ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০১

১৭. দীক্ষিতার, পূর্বোক্ত, p. 104

দীপাবলি সেন

অগাস্ট ১৯৮৪

আজকের বিজ্ঞান প্রযুক্তির সোচ্চারিত অগ্রগতি মন আর মানবতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় না আদৌ।…এই বইটিতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসন্ধান আর বিচার বিশ্লেষণ দিয়ে ধর্মীয় জালিয়াতি, তন্ত্রমন্ত্র, অলৌকিকতা, কুসংস্কার এবং অবৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির সত্যিকারের চেহারাটা প্রকাশ করা হয়েছে সহজ-সরল ভঙ্গিতে।